সুদীপ্ত কাহালী

সুলেমানী গুপ্তধন



সুলেমানি গুপ্তধন

সুদীপ্ত কাহালী



সুলেমানী গুপ্তধন

Sulemani Guptadhan

By : Sudipta Kahali

প্রথম প্রকাশ

দোলযাত্রা ১৪২৭

প্রচ্ছদ

কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

প্রকাশক

সৃষ্টি পাবলিকেশন

২০৩/১ পশ্চিম মাসুন্দা

নববারাকপুর

কলকাতা ৭০০১৩১

বিনিময়

২৪৯

সুদীপ্ত কাহালী তরুণ লেখকদের অন্যতম। এবারের গ্রন্থটি তার দ্বিতীয় প্রয়াস। বাইরের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানের উপর এমন এক রোমহর্ষকর অভিযান তিনি রচনা করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

গ্রন্থটির নামেই চমক। 'সুলেমানী গুপ্তধন'। এই বইয়ের পাতায় পাতায় রয়েছে চমক। বাংলার জলহাওয়ায় থেকে এমন এক বিস্ময়কর কাহিনি রচনা করা সত্যিই একটা চমকপ্রদ ব্যাপার। এটি প্রকাশ করেছেন সৃষ্টি পাবলিকেশন। এই ধরনের বই প্রকাশে উৎসাহ দেওয়া বা সহযোগিতা করার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই। লেখকের পরিকল্পনা, বিষয়বস্তু নির্বাচন ও ভিন্নস্বাদের রচনাশৈলীতে আগ্রহ থাকায় ওঁর ভবিষ্যত যে খুবই উজ্জ্বল তা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। এই তরুণ কাহিনিকারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

জয় হোক



আচ্ছা বাবা, তোমার মনে আছে, ছেলেবেলায় কেমন ঘুম কাতুরে ছিলাম আমি ? রাতে তখন তুমি আমাকে গল্প বলতে বলতে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে! এখন আমি তো সেদিনের সেই ছোট্টটি নেই, আজ তাই আমি এসেছি তোমাকে গল্প শোনাতে, তবে কেন ফটো ফ্রেমের থেকে নির্বিকার চোখে আমার দিকে চেয়ে আছ! এই কি তুমি, আমার সব চাইতে কাছের বন্ধু ?

সুলেমানি গুপ্তধন

সুদীপ্ত কাহালী

।। ইন্দ্রনীলের ডাইরি।।

মেলটা এসেছিলো মোসাদের সদর দপ্তর থেকে, মোসাদের নাম নিশ্চয় শুনেছো তোমরা, ইজরায়েলের এই সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট হিসেবে বহুদিন ধরে আমি যুক্ত ছিলাম খুব গোপনীয় একটা কাজে। আমার প্রতি সিক্রেট সার্ভিসের কড়া নির্দেশ ছিল কোন ভাবেই যেন আমি বিষয়গুলো কাউকে না জানাই, তা হলে আমার বিপদ হতে পারে।

'বিপদ' শব্দটার মানে তোমরা অনেক ভাবেই জেনে থাকতে পারো, কিন্তু কোনো ভয়ংকর সিক্রেট সার্ভিসের ভাষায় 'বিপদ' শব্দটার মানে একটাই, পৃথিবী থেকে চিরতরে সরে যেতে হওয়া। কাজেই...! মোসাদের দৌলতে জীবনে আমার অর্থের অভাব কোনোদিন হয় নি, তার উপর এই এডভেঞ্চারাস জবটাকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছিলাম। আর যেহেতু আমি দেশবিরোধী কোনো কাজে যুক্ত ছিলাম না, কাজেই বিদেশী সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট হিসেবে কাজ করার জন্য বিবেকের দংশনও আমার ভিতরে কখনো আসে নি। তবুও আমি বেশ বুঝতে পারতাম, কেউ যেন আমাকে সব সময় অনুসরণ করে চলেছে। সে দেশের মাটিতেই হোক বা বিদেশে! আজ মোবাইলে মেলটা নজরে এলো। এটা ছিল একটা সাঙ্কেতিক মেল, যার ভাষা আমি তোমাদের শেখাতে পারবে না, তবে মেল এর বিষয়বস্তু বাংলায় আমি তোমাদের গুছিয়ে বলছি।

মিস্টার ইন্দ্রনীল,

বিগত বছরগুলোয় যেভাবে দায়িত্বশীলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাতে আপনার মতো একজন সহযোগী

পেয়ে আমরা বিশেষ ভাবে গর্বিত। আপনাকে জানাচ্ছি 'অপরেশন স্পাইডার-এক্স' এর আমরা আনুষ্ঠানিক ভাবে বিরতি ঘোষণা করছি। এতগুলো বছর আপনার ব্যক্তিগত পেশাকে পাশে সরিয়ে রেখে আপনার মূল্যবান সময় আমাদের জন্য ব্যয় করে গেছেন, সেই কারনে আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা আপনার পরবর্তী জীবনের আর্থিক দায়ভার এখনকার মতো করেই গ্রহণ করে যাবো, আর সেই সাথে এ ও জানাচ্ছি 'অপরেশন স্পাইডার এক্স' এর গোপনীয়তা সংক্রান্ত Alfa Z (+) নিয়মাবলী গুলো আজ থেকে আর আপনার জন্য বলবৎ থাকছে না, 'অপরাশন স্পাইডার এক্স' বিষয়ে আপনাকে আজ থেকে সকল বিষয়ে বাক স্বাধীনতা দেওয়া হলো।

ধন্যবাদ,
ভারপ্রাপ্ত
আধিকারিক, মোসাদ

এই মেলটা পাবার পর সবকিছু তোমাদের বলতে আমার আর কোনো বাঁধা রইলো না, বর্তমানে আমার বয়স বাহান্ন বছর, হার্টের অবস্থা আমার ভালো নয়। তাই মেলটা পাবার পর হোটেলের ছাদে এসে ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেলাম সেই সব ভয়ংকর দিনগুলোর কথা তোমাদের জানিয়ে যেতে। এখন ঘড়িতে সবে সন্ধ্যে সাতটা। বোধ হয় কাল পূর্ণিমা তাই আপাত নির্জন ছোট্ট এই পাহাড়ি শহরটা আজ জোছনায় ভাসছে। দূরে আবছা আলোয় গিরিশৃঙ্গগুলো উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একেকটা ছায়ামূর্তি হয়ে। তার মাঝে স্থানে স্থানে বিন্দু বিন্দু হীরক খন্ডের মতো জ্বলজ্বল করছে জনবসতির আলোগুলো, হয়তো আর কিছুক্ষন পরেই ধীরেধীরে নিভে যাবে এগুলো। জুলাই মাসের এই সময় এ শহরে পর্যটকদের আনাগোনা নেই বললেই চলে। আজ সকালে আমার পূর্বপরিচিত ম্যানেজারবাবুর সাথে কথা বলে যেটুকু জেনেছি, তা হলো আমি ছাড়া এই হোটেলে এখন শুধু তিনটে রুমে বোর্ডার আছে। একটা ঘরে পাগলাটে এক ব্রিটিশ গবেষক সপরিবারে এসে উঠেছেন, উপরের কোণের ঘরটাতে জনৈক বয়স্ক ভদ্রমহিলা। আরেকজন ভদ্রমহিলাও আছেন এখানে, যিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত হলেও সুদূর জর্ডন থেকে এখানে এসেছেন। যাক, ছাড়ো এই সব কথা, এই হোটেলের বর্ননা দিয়ে রাতটা আমি নষ্ট করতে চাই না, আচ্ছা, সিঁড়ির তলা থেকে বন্য কোনো জন্তুর একটা আওয়াজ ভেসে আসছে না ? কি হতে পারে ওটা।

।। সেই বটল মেল।।

ছোটবেলা থেকেই বেড়ানোটা আমার একটা নেশা, তা নতুন করে বলার কোনো দরকার নেই। হাতে কিছু টাকা জমলেই আমি বেরিয়ে পড়েছি সকল পিছুটান ভুলে। কখনোবা দেশের ভিতরে, কখনো বিদেশে আচমকাই সুযোগটা এসে গেছিল আমার হাতে, এক প্রকার মেঘ না চাইতেই জল বলতে পারো। আমাদের রাজ্যের কোনো এক রাজনৈতিক নেতার ছেলের আইনজীবী রূপে মামলায় দাঁড়িয়ে তার জামিন করিয়েছিলাম সেবার। খুব কঠিন ছিল মামলার গতিপ্রকৃতি। তবু পুলিশি কেস ডাইরির সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে আমরা জামিন পেয়ে গেছিলাম সেই মামলায়। সেই নেতা খুশি হয়েই আমাকে উপহার দিলেন এক মহার্ঘ বস্তু। ইতালিতে আন্তর্জাতিক এক ফুটবল টুর্নামেন্টে দুটো ম্যাচ দেখতে যাবার টিকিট, সেই সাথে এক পিঠের বিমান ভাড়া। আর 'নেতাজী'-র দয়ায় ভিসা পেতে অসুবিধার কোনো কারণ ছিল না, কাজেই আর চিন্তা কি ! এবার চলো ইতালি।

৯ জুন, ১৯৯৮ ভোর চারটে পঞ্চাশে এয়ার নেপলসগামী বিমান মুম্বাই থেকে আকাশের বুকে ডানা মেলে। আমি রাত দশটার মধ্যেই এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছিলাম। স্বাভিকভাবেই বিমানে ওঠার আগে অবধি চোখের পাতা এক করার ফুরসত ছিল না আমার। বিমানে উঠে ঘন্টা তিনেক একটা ঘুম দিয়ে ফুটবল সংক্রান্ত জার্নালগুলোয় মন দিয়ে চোখ বোলাচ্ছিলাম। আমাদের বিমান মিলানের লিনেট ইন্টারন্যাশনাল সিটি এয়ারপোর্টে পৌঁছাবে স্থানীয় সময় নয়টা বেজে কুড়ি মিনিটে, সেখান থেকে দুপুর একটায় ছেড়ে গন্তব্যস্থল নেপলস গিয়ে পৌঁছাবে দুপুর দুটো পঁচিশে, চোদ্দ ঘন্টার উপর বিমানযাত্রা। সেখান থেকে আমার গন্তব্য তখনও নির্ধারিত না। কারণ নির্দিষ্ট যেই ম্যাচ দুটোর টিকিট আমার হাতে সেগুলোর কোনোটাই আগামী পাঁচদিনের মধ্যে নয়।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলব, ইতালি যদি কখনো যেতে চাও এবং সকালের দিকে তোমাদের বিমান সেখানে টেক অফ করে, তাহলে ভোর বেলাতে ভুলেও ঘুমিয়ে কাটিও না, কারণ ভোরের আল্পস পর্বতমালাটা কে বিমানের জানালা দিয়ে দেখতে যে কি অপরূপ তা না দেখলে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না, যেই দৃশ্যের সাক্ষী আমি। আল্পস পর্বতমালা ফ্রান্স ও জার্মানির অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাথা উঁচু

করে দাঁড়িয়ে। ইতালীগামী বিমানকে পৌঁছাতে হবে আল্পসের উপর দিয়েই। ইনফরমেশন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ইতালির স্থানীয় সময় এখন সকাল ছটার কিছু বেশি। আল্পসের উপর পেজা তুলোর মতো ভাসছে মেঘরাশি। আকাশের নীল রং ও ভোরের সূর্যের রক্তিম আভা মিলেমিশে এক হালকা বেগুনি রঙের ছটা জানালার কাঁচের বাইরে। মেঘের চাদরে থেকে মাথা তুলে থাকা কোনো কোনো শৃঙ্গের গায়ে বরফে প্রতিফলিত হচ্ছে মায়াবী গোলাপি আবিরের শোভা। ধীরে ধীরে পিছনের দিকে সরে যাওয়া পর্বতমালা যেন নীরবে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে নতুন দেশে। আমাদের বিমান নির্ধারিত সময়ের ঠিক পাঁচ মিনিট পরে ল্যান্ড করে মিলানের লিনেট এয়ারপোর্টে।

"Do you come to see the the football tournament ?" লাউঞ্জে অযাচিত ভাবেই আমার সাথে আলাপ করে ছেলেটা! বিদেশ বিভুঁই, আমি একবার ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি ওকে, বয়স প্রায় আমার ই মতো, অর্থাৎ খুব বেশি হলেও ত্রিশের উপরে হবে না। পেশীবহুল চেহারা, পরনে হাফ হাতা ক্যাজুয়াল টি শার্ট। মাথার চুল প্রায় মুড়িয়ে ছাঁটা, ডান বাহুতে রংবেরঙে আঁকা সিংহের ট্যাটু। হালকা হেসে ঘাড় নাড়ি আমি। ওর নাম মাইক, আলাপ একটু গভীর হলে জানতে পারি সে ইংলন্ডের নাগরিক। ও ইতালি এসেছে তার দেশের হয়ে গলা ফাটাতে। সর্বনাশ! ইংলন্ডের ফুটবল গুন্ডাদের নিয়ে অনেক কথা আমাদের দেশের সংবাদপত্রে ইতিপূর্বে পড়েছি। যদিও মাইককে দেখে ঈষৎ 'অ-মাইক' ই মনে হয় আমার। কথায় কথায় মাইক জানায় সে ইংলন্ডের এক সংবাদপত্রে সাংবাদিক। কাজেই ইতালি আসাটা তার কাছে রথ দেখা ও কলা বেচার সামিল।

"Please say me a good tourist spot to travel around Naples" সাংবাদিক জেনে খানিকটা নির্ভয় হয়েই আমি জানতে চাই মাইকের কাছে।

"You may go to Solero Beach, Which is approximately 310 Miles from Naples" সোলেরো বিচকে অবলীলায় পাশ্চাত্যের গোয়া বলা যেতেই পারে, ইউরোপের বিলাসবহুল, বেহিসাবি, বল্গাহীন ভ্রমণের এক পীঠস্থান এই জায়গা শুনলাম বহু পর্যটক এই সময় সানবাথ নেবার জন্য দলে দলে পারি জমায় এই বিচে। আর টুর্নামেন্টের প্রাক্কালে যে এখানে জনসমাগম বেশ ভালোই হবে তা নতুন করে বলার আশাকরি দরকার পড়বে না।

যাত্রীদের অধিকাংশই মিলানে নেমে যাবার পর হাতে গোনা কয়েকজন যাত্রী নিয়ে দুপুরে বিমানটি নেপলস এর উদ্দেশ্যে রওনা দেবে, এরোব্রিজে উঠতে গিয়ে দেখি ইমিগ্রেশন চেকিং সেরে মাইক ও আসছে আমার পিছনে “Do you want to be my companion on this journey ?”

"ইয়া, ইয়া, নাও উই আর ফ্রম ইংডিয়া” ইংল্যান্ড ও ইন্ডিয়াকে মিলিয়ে এমন অদ্ভুত একটা শব্দ বলে প্রাণখোলা এক হাসিতে ফেটে পড়ে মাইক। সত্যি বলতে ছেলেটার সাথে আলাপ হবার পর থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই কেমন একটা ঘনিষ্টতা তৈরী হয়ে গেছে ওর সাথে। লাউঞ্জে কফি, স্ন্যাক্স, স্যুপ ইত্যাদি মিলিয়ে এতক্ষন আমাদের মুখ প্রায় বন্ধ ছিল না, যার প্রায় পুরোটাই মাইকের সৌজন্য। ফ্লাইটে জনৈক এয়ার হোস্টেজকে অনুরোধ করে ও আমার পাশের সিটে এসে বসে, তারপর ওর নানা গল্প শুনতে শুনতে দেড় ঘণ্টার যাত্রা পথে যেন মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

নেপলস থেকে রেল পথে ট্রেনিতালিয়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে সোলেরো কমবেশি প্রায় সাড়ে চার ঘন্টার জার্নি। বস্তুতপক্ষে আমার যাত্রা পূর্ব নির্ধারিত থাকলে রোম থেকেই এখানে অনেক কম সময়ে পৌঁছানো যেতো। সবুজ সাদা এগারো কোচের বাতানুকূল বিলাসবহুল ট্রেনটি নেপলস ছাড়ে তিনটে দশ এ। মোবাইলে ঘনঘন ফোন আসছিলো মাইকের। খানিকটা দুর্বোধ্য ও সাঙ্কেতিক কোন ভাষায় কথা বলছিলো মাইক। কি ভাষা এটা! একটু অবাকই হই, খুব কৌতূহল হয় আমার মাইকের কাছে সেটা জানতে। কিন্তু দীর্ঘ বিমান যাত্রার ধকলে খানিকটা ক্লান্তই ছিলাম আমি। তাই নেপলস থেকে ট্রেনে উঠে কিছুক্ষনের মধ্যেই নরম গদিওয়ালা সিটে শরীরটাকে এলিয়ে দিই।

ট্রেনিতালিয়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস মন্টেকাসারো জংশনে যখন এসে পৌঁছালো, তখন ঘড়িতে স্থানীয় সময় প্রায় সাড়ে সাতটা। এখান থেকে ছোট গাড়ি ভাড়া করে বিচে পৌঁছাতে আরও কুড়ি মিনিট। ফুটবল জ্বরে ইতালি কতখানি আক্রান্ত তা বুঝতে পারলাম মন্টেকাসারো নেমে। পর্যটকদের ভিড় যেন দক্ষিণ কলকাতার দুর্গাপুজোর রাতগুলোকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল এখানে পা রাখার পর থেকে। মাইককে যতই দেখছি ততই আবাক হচ্ছি আমি। ট্রেন থেকে নেমে খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে গাড়ি বুক করার মাঝেই ও অন্তত আট-দশ জনের সাথে উষ্ণ সৌজন্য

বিনিময় করে ফেলেছে। হ্যাঁ, তাদের হাতের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ দেখে বেশ বুঝলাম তারা কেউ-ই ইংরেজ নয়, তাহলে বিদেশে তার এতখানি পরিচিতি কি ভাবে ! শুধু কি সাংবাদিক বলেই ? নাকি এর পিছনে অন্য কোনো কারণ লুকিয়ে আছে ?

হ্যাঁ, আরেকটা কথাও সেই সাথে বলি, মাইকের সাথে আলাপ হবার পর থেকেই আমার ডান চোখটা খুব লাফাচ্ছে। কাকতালীয় কিনা জানি না, তবু বলছি, অতীতে বহুবার আমি লক্ষ্য করেছি ডান চোখ লাফালে ঠিক তার পর থেকেই একটা বড় কোনো বিপর্যয় বা হাড়হিম করা অভিজ্ঞতার আমি সাক্ষী হয়েছি। এবারেও কি সে রকম কিছু অপেক্ষা করছে আমার জন্য ? কি জানি ! তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারছি এখন আমার পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে, ফালতু চিন্তা ছেড়ে হোটেলের রুমে গিয়ে হালকা টিফিন করে বিয়ার ক্যান হাতে আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলে এই বিচটাকে উপভোগ করাটাই এখন সব চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ।

১০ জুন, সকাল সাতটা, রাত একটায় সি বিচ থেকে ফিরে এসে হোটেলের রুমে আমার পরম তৃপ্তির ঘুম ভাঙলো কিছুক্ষন আগে। মাইককে ঘিরে আমার কৌতুহল ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। কাল রাতে নানান দেশের ফুটবল ভক্তদের সাথে আলাপ ও বন্ধুত্ব হবার সুবাদে স্ট্রং বিয়ার একটু বেশিমাত্রায় খাওয়া হয়ে গেছিলো। তার জেরে সারারাতে বাথরুমে যেতে হয়েছে বার তিনেক। যখনই আমি ঘুম থেকে উঠেছি, তখনই দেখেছি মাইক পাশের বেডে ল্যাপটপ নিয়ে কিছু কাজ করে চলেছে। ওর কাছেই শুনেছিলাম আমার মিলানে পৌঁছাবার এক ঘন্টা আগেই ওর বিমান সেখানে ল্যান্ড করেছে, তাই যদি হয়, তাহলে এতখানি এনার্জি ও পায় কোথা থেকে ! যাই হোক ঘুম ভেঙে উঠে দেখি ও আমার আগেই উঠে পড়েছে। আমার ব্রাশ করে ফ্রেশ হবার আগেই হোটেলের রিসেপশনে কল করে ব্রেকফাস্ট ও কফি আনিয়ে নিয়েছে মাইক। রাতের ধুমকি কাটাতে এই গরমে খাবারগুলোর খুব দরকার ছিল আমার। "Now we should respond to the call of the beach, If you will not be interested to spend the whole morning in the toilet just like the average Indian" মাইক বলে।

সত্যি বলতে মাইকের এই কথায় ঈষৎ অপমানিত বোধ করি আমি, এখনো কি ভাবে ওরা আমাদের ? আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে। এত বছর পরেও এতখানি তাচ্ছিল্য আমাদের প্রতি !

"What do you want to say ? Tell me a little bit clearly" মাইক হয়তো আমার কাছ থেকে এই ধরনের উত্তর আশা করে নি, তাই খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে নেয়, "oh, no dear, I just have a little fun with you, hope you will give me this right as a friend" মাইক ম্যান ম্যানেজমেন্টে কতখানি দক্ষ সেটা কাল সকাল থেকেই বুঝেছি। স্বাভাবিক ভাবেই আমার সবটুকু রাগকে জল করতে ওর খুব বেশি সময় ব্যয় করতে হয় নি। হাত ধরাধরি করে দুই বন্ধুতে আমরা এক সময় সি বিচের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

সি বিচে তখন রামধনুর মতো সাত রঙের সমারোহ। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দেশের ফুটবলপ্রেমীদের ভিড়ে মিশে যায় মাইক। সত্যি বলতে এবার খানিকটা হীনমন্যতা গ্রাস করে আমাকে। আমাদের দেশ এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে নি, ভবিষ্যতে কবে আমরা এই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবো, তা ভগবানই জানেন, আমি ওদের থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখেই সমুদ্র সৈকতটাকে উপভোগ করতে থাকি।

পারেপারে পর্যটকদর ভিড় ঠেলে হয়তো খানিকটা দূরেই পৌছে গেছিলাম আমি। নির্জন সমুদ্রতীরে খানিকটা উঁচু বেলাভূমির বুকে ছড়িয়ে থাকা ঝাউবনে বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজে কেন জানি বুকের ভিতরে একটা ভয়ের চোরাস্রোত বয়ে যায়। ভাঁটার সমুদ্রে নোঙ্গর করা কয়েকটা জেলে নৌকা। জেলেরা জাল ঝেড়ে মাছ সংগ্রহে ব্যস্ত। এখান থেকে বহু দূরে মাইকদের জটলাটা কে যেন বিন্দুর মতো মনে হচ্ছে। হঠাৎ ঠিক তখনই বালির চরে আমার নজর পড়ে যায় সেই বোতলটার দিকে। পুরানো আমলের একটা কাঁচের বোতল। হয়তো বহুদিন নোনা জলে থেকে বোতলের বাইরের গা টা ঘষা কাঁচের মতো খসখসে হয়ে গেছে। বোতলের মুখের কর্কের ছিপিটা পচে মিশমিশে কালো, কিন্তু কি দেখছি আমি ! বোতলের ভিতরে একটা কাগজ ভাঁজ করা। ঝাপসা বোতলের কাঁচের থেকে কাগজটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। ছোটবেলায় বটল মেলের কথা পড়েছি এডভেঞ্চারের বই এর পাতায়, এটা তেমন কিছু না তো ! আমি পচা কর্কের ছিপিটা খুলে ভিতরে কাগজটা বের করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু... হলদে মচমচে হয়ে যাওয়া কাগজটা ছিঁড়ে যাচ্ছে বারবার, বাধ্য হয়ে একটা পাথর জোগাড় করে বোতল ভেঙে কাগজটা বের করি।



হঠাৎ ঠিক তখনই বালির চরে আমার নজর পড়ে যায় সেই বোতলটার দিকে।

আরে কি দেখছি আমি! বোতলের ভিতরের ভাঁজ করা যেই বস্তুটাকে আমি সাধারণ কাগজ বলে ভুল করেছিলাম সেটা আদপে একটা প্যাপিরাসের খন্ড। বর্তমান কালের কাগজ আবিষ্কারের আগে ইওরোপে লেখার জন্য এই ধরণের প্যাপিরাস ব্যবহার করা হলেও এর প্রচলন হয় প্রথম মিশরে।

আর এই প্যাপিরাস শব্দটা থেকেই 'পেপার' শব্দের উৎপত্তি। তবে প্যাপিরাস খন্ডের উপর লেখাগুলো খুবই অস্পষ্ট। তাও কৌতূহলবশত আমি প্যাপিরাসের লেখা গুলো উদ্ধার করার কাজে নেমে পড়লাম। আচমকাই সারা শরীর জুড়ে একটা শিহরন খেলে যায় আমার। কি দেখছি আমি ! এ কি করে সম্ভব!

কাঁচা হাতে একটা মরার মাথার খুলি আঁকা বটল মেলের ঠিক উপরে। আর চিঠির শেষে এলিজাবেথীয় ইংরেজিতে লেখিকার সই ও তার নিচের লেখাটা অনেক কষ্টে উদ্ধার করে 'আনি বনি ৩ মে, ১৭৮১, লিজার্ট পয়েন্ট ভিলেজ' একবার কোন এক ইতিহাস বই-এ পড়েছিলাম মধ্যযুগে জলদস্যুরা তাদের পতাকায় বা চিঠিতে মাথার খুলি আঁকতো, তবে এ কি কোন জলদস্যুর চিঠি যা সত্যি আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগে লেখা ? কিছু ভাবতেই পারছি না আমি। কোমরে আটকানো পাউচ ব্যাগের চেন খুলে একটা বই এর ভিতরে সাবধানে প্যাপিরাস টা ঢুকিয়ে রাখি। এটার ইতিহাস আমাকে জানতেই হবে, কিন্তু কার থেকে তা জানতে পারবো?

দেখতে দেখতে দুপুর প্রায় একটার কাছাকাছি এখন, সমুদ্রের জল অনেকটা দূরে সরে গেছে এখান থেকে। সোলেরো বিচের ঠিক বিপরীতে সমুদ্র খানিকটা তেরছা ভাবে বাঁক নিয়েছে বাম দিকে। ওর একপাশে নারকেল গাছে ঘেরা গ্রামগুলো বায়নাকুলারে চোখ রাখলে দেখা যায়। জেলেরা ছোটছোট ট্রলিতে করে মাছ ভরে নিয়ে একে একে সেদিকে পা বাড়ায়, এখন এই স্থানে সমুদ্রতীরে কিছু নাম না জানা পাখি ছাড়া জনপ্রাণী নজরে পড়ে না। তবু এই নির্জন সমুদ্র সৈকতেও মোবাইলের সবকটা টাওয়ার মার্ক দৃশ্যমান।

আমি বালির উপর পা ছড়িয়ে নেট অন করে গুগল সার্চ করতে বসে যাই। 'লিজার্ট পয়েন্ট' বিচ ইংল্যান্ডের এক ঐতিহাসিক সমুদ্রবন্দর ১৭০৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ভয়ংকর নৌযুদ্ধের সাক্ষী এই বন্দর...

আচমকাই মাথায় বুদ্ধিটা খেলে যায়, আরে মাইক তো ইংল্যান্ডের নাগরিক। ওকে একবার প্রশ্ন করে দেখলে কেমন হয় ? ও নিশ্চয় এই বিষয়ে কিছু জানলেও জানতে পারে। এই ইতিহাস না জানা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই, কিন্তু তখন তো আমি বুঝতে পারি নি যে এই অন্ধ ইতিহাস আমার জীবনের সব সুখ, শান্তি এভাবে কেড়ে নিতে পারে। কি জানি হয়তো সেসব আমার নিয়তির লিখন। তবু ঘর-সংসার কোনো কিছুর স্বাদ জীবনে না পেলেও আজ আমি তৃপ্ত সেদিনটার জন্য। আমার জীবনে সেই অভিশপ্ত বোতল মেল আর মাইক... জীবনের শেষ দিন অবধি এই দুটো বিষয় কে আমি কখনো ভুলতে পারবো না।

।। সেই রহস্যময় জাহাজটি ।।

পায়ে পায়ে আবার সোলারো বিচের দিকে এগিয়ে চলি। খানিক আগে এখানে পর্যটকদের যতখানি ভিড় দেখেছিলাম এখন তাদের কাউকেই আর নজরে পড়ে না, একপাশে স্ন্যাক্স এর স্টল গুলোয় তালা ঝুলছে, বিচের এক পাশে সারি দেওয়া চেয়ারগুলোয় এলিয়ে মাথার টুপিটা মুখ ঢেকে তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে মাইক। "মাইক, মাইক" দুবার ডাকতেই মাইক উঠে বসে। আমার উপর ঈষৎ অভিমান হয়েছে মাইকের। চারবার ফোন করা সত্ত্বেও আমি ওর ফোনটা ধরিনি বলে, ফোন খুলে দেখলাম চারটে নয়, ছটা কল করেছে ও। কোনো কারনে আমার ফোনটা সাইলেন্ট মোড-এ চলে যাবার জন্য আমি রিং-এর আওয়াজ শুনতে পাই নি, যখন আমি নিচে বসে নেট ঘাঁটছি, তখন ওর কল গুলো আমার নজর এড়িয়ে গেছে। "সরি মাইক, এই যাত্রায় আমাকে ক্ষমা করে দাও" মাইকের ভাষাতেই আমি বললাম কথাগুলো।

"তুমি নিশ্চয়ই জানো না, এই বিচ যতটা সুন্দর, ঠিক ততখানি ই অভিশপ্ত" জবাব দেয় মাইক...। কিন্তু কেন এই কথা বলছে ও ? আমি জানতে চাই ওর কাছে। আকাশে এখন নিকষ কালো মেঘ, এঁকেবেঁকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে। আধা অন্ধকার সাগরের বুকে বিন্দুর মতো ক্ষুদ্র একটা জাহাজ দিগন্তের এক দিক থেকে অপর দিকে ধীরেধীরে মিলিয়ে যায়। "আজ কত তারিখ তোমার জানা আছে ?" হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করে মাইক।

"১০ জুন" খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিই আমি।

"তুমি কি এই দিনটার ইতিহাস জানো ?"

ইতিহাসের কথা শুনে আমার শরীরের ভিতরে এক অব্যক্ত উত্তেজনা অনুভব করি, কি বলতে চাইছে মাইক ? "কই, না তো !" কৌতূহল দমন করে জবাব দিই আমি"

"আজ দিনটা আনি বনির মৃত্যুদিন, বিশ্বের সব অতৃপ্ত আত্মারা আজকের দিনে ইউরোপের প্রতিটা সমুদ্র সৈকতে এসে ভিড় করে", আমার শরীরের ভিতরেও কেন জানি ভয়ের একটা চোরাস্রোত বয়ে যায়। কিন্তু কেন ? বটল মেলটা পাবার আগে তো সারাটা আকাশ রোদে ঝলমল করছিল, আমার চারপাশে জেলে নৌকাগুলোয় ছিল লোকজনের ব্যস্ততা। তারপর বোতল থেকে মেলটা বের করে চোখ বুলিয়ে আমি পাউচ ব্যাগে ভরে রেখে কিছুক্ষন মোবাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করি, খুব বেশি হলে আধ ঘন্টা সব মিলিয়ে, এর মধ্যেই আকাশের চরিত্র এভাবে বদলে গেলো কি করে? চারপাশের মানুষজনও ততধিক দ্রুততার সাথে মিলিয়ে যায়। এসব কি স্বাভাবিক ঘটনা না কোনো বিপদের অশনি সংকেত এগুলো, বায়নাকুলারে চোখ রেখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে নিজের মনেই ভাবছিলাম কথাগুলো, দূরে একটা জাহাজ উথালপাথাল ঢেউ এর মধ্যে দিয়ে হেলেদুলে চলছে। বায়নাকুলারের ভিউটাকে যতটা জুম করা যায় করে চমকে উঠলাম আরেকবার। এ ধরনের সাবেকি আমলের জাহাজ এখন ইউরোপে চলাচল করে? ইতিহাসের পাতায় এই ধরনের পালতোলা জাহাজের ছবি দেখেছি। কি আশ্চর্য! পতপত করে উড়ছে ওটা কি আঁকা! মরার মাথার খুলি না? তারমানে কি হতে পারে?

"মাইক, সমুদ্রের দিকে তাকাও, তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ ?" আমার গলায় হয়তো একটা উত্তেজনার রেশ ছিল, মাইক তাড়াতাড়ি আড়মোড়া ভেঙে তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে। ঘাড় নাড়ে মাইক, ও কিছু দেখি নি, আমি আমার বায়নাকুলারটা মাইকের চোখের সামনে ধরলাম, "এবার ভালো করে দেখো"।

"ঠিক কি দেখাতে চাইছে আমাকে একটু বলবে?" ঠিক সেই মুহূর্তেই ভয়ানক আওয়াজ করে আমাদের পিছনের ঝাউ বনে বাজ পড়ে, চমকে উঠি আমরা। স্বাভাবিক ভাবেই বাইনাকুলার থেকে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলো তখন মাইক। এই বৃষ্টির মধ্যেও ঝাউবনের ভিতরে একটা গাছে আগুন জ্বলে ওঠে দাউদাউ করে। সমুদ্রের তীরে কাকভেজা আমরা দুজনেই।

"মাইক, বায়নাকুলারে চোখ রেখে তুমি সমুদ্রের মধ্যে পুরানো দিনের একটা জাহাজ দেখতে পেয়েছিল ?" আমার কথায় মাইক ঘাড় নেড়ে জানায় যে সে এরকম কিছু দেখে নি, আমি জানি ওই রহস্যময় জাহাজটার কথা কেউ কোনোদিন বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি সেদিন স্পস্ট দেখেছিলাম জাহাজটাকে।

"চলো, আবার হোটেলে ফেরা যাক" জাহাজটা না দেখলেও মাইককে দেখে মনে হলো কোন কিছুতে খানিকটা ভয় পেয়েছে ও, মাইকের মতো বেপরোয়া মানুষের ভয়! এর কারন কি হতে পারে? কেনই বা আজকের দিনটাকে অভিশপ্ত বলে বর্ণনা করলো মাইক! আচমকা আমার পুরানো দিনের বটল মেলটা কুড়িয়ে পাওয়া কি সেই অভিশাপের একটা অঙ্গ ? কিছুই মাথায় আসে না আমার। হে ঈশ্বর, তুমি আমার সহায় থেকো।

।। মাইকের বিস্ময়কর আচরণ।।

হোটেল L'Antico Uliveto ফিরে ফ্রেশ হয়ে মাইকের সাথে আমি ডাইনিং হলে যাই। ডাইনিং টেবিলে মাইকের নির্দেশমতো আমাদের জন্য লাঞ্চে ধুমায়িত কার্বোনারা ও হাতে গরম পানজানেলা অপেক্ষা করছিলো। কার্বোনারা প্রকৃতপক্ষে ডিম্, চিজ ইত্যাদি উপকরণে তৈরি ইতালীয় পাস্তা। যদিও দর্শনের দিক থেকে পাস্তার থেকে চাউমিনের সাথে খাদ্যটির বেশি মিল। আর পানজানেলা, ব্রেড দিয়ে তৈরী একপ্রকার সুস্বাদু খাবার। বলাবাহুল্য 'বাপের জন্মে' না খাওয়া আইটেম দুটোর স্বাদ আমি প্রাণ ভরে উপভোগ করলাম। পাশের চেয়ারে বসে তখন আমার থেকে প্রায় আড়াই গুণ পরিমাণ খাবার নিয়ে মাইক দৈত্যের মতো মধ্যাহ্ন সারছে। চড়ুই আর বাজপাখি বোধ হয় এই প্রথম কোথাও একসাথে লাঞ্চের টেবিলে বসল। স্বভাবসিদ্ধ ভাবে খেতে খেতে আমার সাথে মজা করল মাইক। মৃদু হাসি আমি, সত্যি বড় অবাক লাগে আমার মাইককে। L'Antico Uliveto র মতো এক ব্যয়বহুল হোটেল, যেখানে আমাদের রুমের প্রতিদিনের ভাড়া ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬৪০০ টাকা, তার সাথে স্থানীয় কিছু কর যোগ হয়ে সেটা হয়তো আরো কয়েকশ টাকা বাড়বে, সেখানে মাইক এ রুমের তিনদিনের ভাড়া প্লাস খাবারের খরচবাবদ মোটা পরিমাণের অর্থ এখানে জমা করে দিয়েছে।

আমার ইতালিতে পা রাখার পর থেকে ও বলতে গেলে কোনো বিষয়ে

আমাকে খরচ করতেই দিচ্ছে না, এটা নিয়ে যেমন আমি খানিকটা হীনমন্যতায় ভুগছিলাম, ঠিক তেমনই বারেবারে একটা প্রশ্ন উঁকি মারছিল আমার মনে, মাইক কি একজন সাংবাদিক? একজন সাংবাদিক হলে এভাবে কি কেউ দুহাতে পয়সা উড়াতে পারে? নাকি ওর অন্য কোনো পরিচয় আছে যেটা আমার কাছে গোপন করে চলেছে? কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে সে আমার মতো একজন সাধারন ভারতীয়ের জন্য এভাবে অর্থ ব্যয় করে যাবে কেন? এই সকল উত্তরগুলো পেয়েছিলাম বেশ কিছুদিন পর, ঠিক ততদিনে আমিও মাইকদের একজন হয়ে গেছি, আর সেখান থেকে ফিরে আসাটা সম্ভব ছিল না আমার।

খাওয়া শেষে মাইককে যেভাবে ঢেঁকুর তুলতে দেখলাম, সমুদ্র সৈকতে সেই বজ্রধ্বনির সাথে তার তুলনা চলতেই পারে। এরপর ও কচি বাঁদরের লেজের মতো একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করতে লেগে গেলো। "মাইক, তোমার সাথে একটু কথা ছিল" ওর পাশের বেডে শুয়ে টিভি দেখতে দেখতে বললাম।

"বলুন স্যার" চুরুট ধরিয়ে স্টিম ইঞ্জিনের মতো ভস ভস করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে মাইক।

"আজ সি বিচে অদ্ভুত একটা জিনিষ পেলাম, এটা নিয়ে তোমার কাছে আমি কিছু জানতে চাই"।

"কি অদ্ভুত জিনিস ?"

"একটা বোতল"

"কি ব্র্যান্ড ? হয়তো কোন পর্যটক খাবে বলে সাথে এনেছিল, ভুল করে বিচে ফেলে চলে গেছে। কারোর পৌষ মাস, কারোর সর্বনাশ (ইংরেজি ভাষায় ঠিক এই ধরনের একটা প্রবাদ বলে হাসতে থাকে মাইক)

"না না কোন ওয়াইন নয়, এটা সত্যি একটা সিরিয়াস ম্যাটার" খানিকটা গম্ভীর হয়েই আমি বলি। আমার কথার গাম্ভীর্যে মাইক খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

"বলো কি সেই আশ্চর্যজনক বস্তু ?"

"একটা বটল মেল, জনৈক আনি বনির লেখা, আমি এই বিষয়ে তোমার কাছে কিছু ইতিহাস জানতে চাই।" আমার কথায় মাইক ধড়মড় করে উঠে বসে।

“কি বলছ তুমি?” খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো মাইককে। আমি নীরবে পাউচ ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা প্যাপিরাস খন্ডটা বের করে মাইকের হাতে

দিই। প্যাপিরাসটা আদ্যপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে মাইক, তার চোখদুটো যেন জ্বলছে। ঘরে এখন একটা পিন পড়লেও আওয়াজ শোনা যাবে, মাইকের ফর্সা মুখটা উত্তেজনায় লালচে দেখাচ্ছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম ওর সারাটা কপাল জুড়ে। কেন এত উত্তেজিত লাগছে মাইককে ?

প্রায় আধ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়েছে। এখনো মাইকের মুখে কোন কথা নেই। ওর চোখের দৃষ্টি বড় ক্রুর এখন, মাইক ওর ব্যাগ থেকে একটা দামি আতস কাঁচ বের করে মোবাইলের টর্চের আলোয় লক্ষ্য করে চলেছে ওই বস্তুটাকে। বাইরে আবার মুষলধারায় ঝড়-জল শুরু হয়েছে কাঁচের বন্ধ জানলাগুলোয় বিদ্যুৎ চমকের আলো ফুটে উঠছে বারেবারে। আমি এবার দোতলার জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। কতক্ষন এভাবে চুপচাপ বসে থাকা যায় ! ঝড়বৃষ্টিতে বিকেল পাঁচটার মধ্যেই সন্ধ্যে নেমে এসেছে। রাস্তার রঙিন আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। একটা গাড়ি হোটেলের লনে এসে দাঁড়ায়, একদল ব্রাজিল সমর্থক বৃষ্টির মধ্যে হৈ চৈ করে নামছে গাড়ি থেকে। মাইক এবার ক্যামেরা বের করে নানান এঙ্গেল থেকে প্যাপিরাস খণ্ডটার ফটো তুলতে ব্যস্ত। কেন এমন পাগলামি করছে মাইক? খুব আবাক লাগছে ওর এই আচরণগুলো দেখে, কাল থেকে আমি যেই মাইককে দেখে এসেছি তার সাথে ওর কোন মিল নেই। এখন ওর হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্তি পেতে চাই আমি।

।। অন্ধ অতীত ।।

খানিক বাদে বেল বাজিয়ে হোটেল বয় কফি ও সামান্য স্ন্যাক্স দিয়ে যায়। কফির পেয়ালায় চুমুক দেয় মাইক, ওকে আবার আগের মতোই স্বাভাবিক লাগছে। সেভাবেই আমার সাথে আবার মজা করছে সে "কি মিস্টার ইন্ডিয়ান, আমাকে কি তোমার পলাশীর যুদ্ধের রবার্ট ক্লাইভ বলে মনে হচ্ছিল খানিক আগে?" বোকার মতো একটু হাসি আমি। "তোমার পাওয়া মেলটা হাতে পাবার পর আমার যতখানি কৌতুহল হচ্ছিল, তোমার ভিতরেও ঠিক ততটাই কৌতূহল জমে আছে আমার কাছ থেকে ঘটনাটা শোনার জন্য, হ্যাঁ, নিশ্চই আমি সব কিছু বলবো তোমাকে। কফির পেয়ালা শেষ করে শিশুদের মতো কাপটা দিয়ে প্লেটে ঠুকঠাক দু-চারবার আওয়াজ করে সেগুলো ট্রে-এর মধ্যে রেখে দেয় ও।

অবশেষে মাইক প্রথমেই শুরু করে আনি বনির সেই রোমহর্ষক কাহিনী। ওর কাছেই জানতে পারি আনি বনি সত্যি ছিলেন ইংল্যান্ডের একজন নামকরা মহিলা জলদস্যু। তার জন্ম ১৬৯৭ সলে আয়ারল্যান্ডের কাউন্টিকর্কের কিংসলে তে। তার পিতা ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত আইনজীবী উইলিয়াম করমাক। আনি প্রকৃত ছিলেন উইলিয়ামের দাসী মারি ব্রেইনের অবৈধ কন্যা। উইলিয়ামের বৈধ স্ত্রী তার স্বামীর এই ব্যাভিচারিতাকে মেনে নেন নি বলে উইলিয়াম তার দাসী ও সদ্যজাত কন্যাকে নিয়ে দক্ষিণ ক্যারোলিনা চার্লস্টনে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। অবশেষে ১৬ বছর বয়েসে আনি জলদস্যু জেমস বনির প্রেমে পড়ে যায় ও তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। একজন জলদস্যুর সাথে তাঁর মেয়ের এই সম্পর্ক কোন পিতা মেনে নিতে পারে ?

এরপর জেমস ও আনি দক্ষিণ ক্যারোলিনা ছেড়ে নিউ প্রভিডসেন্স পাড়ি দেন এই সময় তাঁরা ওখানকার গভর্ণর উডস রজার্সের জলদস্যুতা বিষয়ক ইনফর্মারের কাজ করতে থাকেন। আনি ও জেমস দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসতেন। আনি ছিলেন সেই সময়ে অন্তঃসত্ত্বা, যদিও আনির সেই সন্তান পরবর্তীকালে পৃথিবীর মুখ দেখে নি। একদিন এক জলদস্যু সর্দারের নজর পড়ে যায় সুন্দরী আনির দিকে, সে আনিকে নানান কথায় ভুলিয়ে জোর করে তার জাহাজে নিয়ে তোলে।

কিছুদিন পর আনি সেই জলদস্যু সর্দারকে হত্যা করে তাঁর স্বামীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু কোন অজানা কারনে তিনি আর তাঁর স্বামীর হাদিস পান নি, অনেকে বলেন ওই সর্দারই লোক মারফত তাঁর স্বামীকে হত্যা করিয়েছেন। যাই হোক, কোন বাধাই তখন থেকে আর টলাতে পারে নি আনিকে। প্রকৃতই সে হয়ে ওঠে সমুদ্রের ত্রাস। ১৭২০ সালে ব্রিটিশ নৌবহরের সাথে জলদস্যুদের দলের যুদ্ধ শুরু হয়, এই যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সাথে ব্রিটিশ নৌবহরের প্রতিরোধ করতে থাকেন আনি ও মেরি নামে আরেকজন মহিলা জলদস্যু। কিন্তু এরকম অসম এক যুদ্ধে জয়ী হওয়া কি সম্ভব? ব্রিটিশ সরকার জলদস্যুদের প্রায় সবাইকেই ফাঁসিতে ঝোলায়, কিন্তু আনি ও মেরি দাবি করেন তাঁরা অন্তঃসত্ত্বা, সে কারণে তাঁদের ফাঁসি না দিয়ে কয়েদে পাঠানো হয়। এরপর জেলখানাতেই মারা যান মেরি। তবে আনি বনির এর পরের ইতিহাস স্পষ্ট করে জানা যায় না, Oxford Dictionary of National Biography (2004) দাবি করে তাঁর পিতা মাতা মুক্তিপণের বিনিময়ে

মেয়েকে চার্লস টাউনে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, ২৫ এপ্রিল ১৭৮২ সলে তাঁর মৃত্যু হয়।

"কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে ১৭২৩ সালে জেলখানা থেকে মুক্তির দিন থেকে ১৭৮২ সাল অব্দি কোথায় ছিলেন তিনি ! ঠিক এখানেই নীরব সবাই, ইভেন Encyclopedia Britannica ও এই সময়ের ইতিহাসের কোন হদিস দিতে পারে নি।" আবেগঘন কণ্ঠে বলে মাইক। একটু দম নেয় মাইক। পায়ে পায়ে সে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, আরও কিছু হয়তো বলতে চাইছিলো মাইক, কিন্তু এক অব্যক্ত বেদনায় যেন ওর গলাটা ভারী হয়ে আসে। আমি আবাক হই মাইকের এই আচরণে, সদা প্রফুল মানুষটা এক অজানা ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে গিয়ে কি কারনে এতখানি আঘাত পেতে পারে ! "কিন্তু এই বটল মেল-এ ঠিক কি লেখা আছে ?" আমার আর তর সইছিল না, তাই প্রশ্ন করেই ফেললাম মাইককে।

“চলো, আবার সি বিচে যাওয়া যাক, যেতে যেতেই এই মেলে লেখা কথাগুলো তোমাকে বলবো।" বৃষ্টি থেমে গিয়ে রূপোর থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদটা কাঁচের জানালার বাইরে থেকে উঁকি মারছে। বেরোবার আগে মাইক বাথরুমে ঢোকে ফ্রেশ হতে। আচমকাই বিষয়টা আমার নজরে আসে। মাইকের বিছানায় বালিশের একপাশে কোন এক বন্য জন্তুর লোম! এই হোটেলটা যথেষ্টই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। আজ দুপুরে লাঞ্চের পরেই হোটেলের বয় এসে বেডকভার চেঞ্জ করে দিয়ে গেছে। তাহলে এই লোমগুলো কোথা থেকে এলো ? আর কিসেরইবা লোম এগুলো ! আমরা তো এর মধ্যে ঘরের বাইরে যাই নি, ঘরের দরজাও ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। তবে এগুলো এলো কোথা থেকে? বটল মেলটা হাতে পেয়ে মাইকের এতখানি সিরিয়াস হয়ে যাবার কারণটাই বা কি? মাথায় আসছে না কিছুই। ঘরের পেন্ডুলাম লাগানো ঘড়িটায় তখন নটার ঘন্টা বাজছে।

সি বিচের পথে যেতে যেতে অদ্ভুত একটা কথা বলে মাইক। “বন্ধু, তোমার দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে যদি কেউ কোন অজানা বস্তু তোমার হাতে দেয়, তুমি সেটা প্রত্যাখ্যান করবে” আশ্চর্য, মাইক এই কথা কেন বলছে? প্রশ্নটা মনের ভিতরে রেখেই সম্মতি দিই আমি।

“বলো মাইক, ঠিক কী লেখা আছে ওই বটল মেলে ?”

“এক গুপ্তধনের হদিস” কেমন যেন হিসহিসে গলায় বলে সে।

“গুপ্তধন ?”

“হ্যাঁ, গুপ্তধন, সুলেমানি গুপ্তধন। যার হদিস পেয়েছিলো আনি বনি, সেই গুপ্তধন গচ্ছিত আছে ইসরায়েলের খিরবেত কুমরানে, সেই সংকেত লেখা আছে এক তাম্রপত্রে, কিন্তু বড় অভিশপ্ত সেই গুপ্তধন", অভিশপ্ত ! কি বলতে চাইছে মাইক ?

"সেই গুপ্তধন কি উদ্ধার করেছিলেন আনি ?"

"না, তিনি সেটা পারেন নি, তবে সেই তাম্রপত্রের সাঙ্কেতিক লিপির মানে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, তা তিনি লিখেও গেছিলেন, কিন্তু...”।

কিন্তু ?

"রাজা সলোমন ছিলেন ইন্দো এরিয়ানদের মতো শক্তির উপাসক। তিনি লিখে রেখে গেছেন একমাত্র কোনো ইন্দো এরিয়ান মানুষ সৎ উদ্দেশ্যে তাঁর গুপ্তধনের হদিস করতে পারবেন, অপর কেউ তার তল্লাশি করতে গেলে তার বিপদ হবে।"

"ইন্দো এরিয়ান ?"

"ইয়েস, জাস্ট লাইক ইউ" কথাগুলো দৃঢ়তার সাথে বলে মাইক।

"মাইক, সত্যি আমি বুঝতে পারছি না যে তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো!”

"আনির আরাধ্যা দেবী ছিলেন Angitia, আর আনির মা মেরি ব্রেইনন ছিলেন ইন্দো এরিয়ান বংশদ্ভূত। আনি চেয়েছিলেন সেই গুপ্তধন উদ্ধার করে প্রাচীন রোমের সর্পের দেবী Angitiaর মন্দির গড়বেন, কিন্তু তা তিনি পেরে ওঠেন নি। কেন তিনি পারেন নি সেই প্রসঙ্গটা তোলাই থাক। তাই অবশেষে দেবী Angitia র অভিশাপ তাঁর উপরে পড়ে, জীবনের শেষ লগ্নে এসে তিনি এই বটল মেলটা লিখে সব জানিয়ে যান। সেই তাম্রপাত্রের রহস্যের হদিস তিনি লিখে রেখে গেছেন লিজার্ট পয়েন্ট ভিলেজে তার বংশের লোকজনদের কাছে।"

"আশ্চর্য, আমার বিশ্বাস-ই হচ্ছে না।"

"মিস্টার ইনদ্রনিল" আমার হাতদুটো শক্ত করে চেপে ধরে মাইক "আমার বিশ্বাস তুমি-ই এ কাজ করতে পারবে" আমি কি বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এরপর গতকাল রাতের মতোই মাইক বিচে কিছু পর্যটকদের সাথে মিশে যায়।

একটা ফোন এসেছিল আমার, কথা শেষ করার পর একজন মানুষ আমার সামনে এসে জানতে চায় প্রাচীন রোমের কোন এন্টিক সামগ্রী আমি ক্রয় করতে চাই কিনা, এন্টিক দ্রব্যের উপর আমার নেশা সবসময়,

তাই আপত্তি করলাম না। প্রায় কুড়ি হাজার লিরার বিনিময়ে আমি তার কাছ থেকে একটা মূর্তি ক্রয় করি। ভারতীয় মুদ্রায় যার দাম তখনকার সময়ে হয়তো আট হাজার টাকার কিছু বেশি। হ্যাঁ বর্তমানে ইতালিতে কেনাবেচা ইউরোয় হলেও তখন লিরা-ই সেখানে প্রচলিত ছিল।

"স্যার, এটা কার মূর্তি ?" বিক্রেতার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে আমি জানতে চাই।

"এটা প্রাচীন রোমের দেবী Angitia" খানিকটা কাঁপাকাঁপা গলায় কথাগুলো বলেই যেন মিলিয়ে যায় সেই বিক্রেতা। একটা শিহরন খেলে যায় আমার সারা শরীরে। খানিক আগে মাইক যাঁর কথা বলছিলো, এই কি সেই দেবী Angitia ? আরে বিক্রেতা আমার দক্ষিণ দিকে এসে দাঁড়িয়েছিল না ? আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়। তারমানে এ ও কোন অশনি সংকেত নয় তো? ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়া মাইককে একবার ফোন করবো কিনা ভাবতে ভাবতে মুর্তিটা ব্যাগের ভিতরে ভরে রাখি।

।। অভিশপ্ত বিমান যাত্রা ।।

২৫ জুন, আজ আমার মুম্বাই ফেরার বিমান বিকেল তিনটেয়। মাইক যেহেতু ফুটবল টুর্নামেন্ট শেষ না হওয়া অব্দি সেখানে থাকবে, তাই সে আমাকে নেপলস বিমানবন্দর অব্দি এগিয়ে দেয়। এই কয়েকটা দিনে মাইকের সাথে বন্ধুত্বটা আমার যথেষ্ট জমে গেছিলো। কাল এখান থেকে কিছু শপিং করেছি। তাই আমার সাথে লাগেজ খানিকটা বেড়েছে "বাহ, তোমার থেকে তোমার লাগেজের ওজন তো বেড়ে গেছে দেখছি" মাইক বিমানবন্দরের লাউঞ্জে আমার ব্যাগটা তুলে তার ওজন অনুমান করে আমাকে বলে। আচমকাই মাইক ব্যাগটা রেখে ছিটকে সরে যায় খানিকটা। ওর মুখটা কেমন পাংশু দেখায় হঠাৎ করে। আমি তার কোন কারন বুঝে উঠতে পারি না। ওর কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। সারা মুখটা লাল টকটক করছে। ঠিক কোনো বিষয়ে টেনশন করলে মাইককে যেমন দেখায়।

"কি হল মাইক হঠাৎ ?"

"নো, নো, আই আমি ওকে" তারপর কিছুক্ষন দুজনেই আমরা নীরব "আমি একটা কথা তোমার কাছে জানতে চাইব ঠিকঠাক জবাব দেবে"? মাইককে কেমন চিন্তান্বিত লাগছে এখন। ও আমার হাতটা

চেপে ধরে জানতে চায়।

“হোয়াই নট, বলো তুমি ঠিক কি জানতে চাইছ ?"

"তুমি ইতালি থেকে কোন এন্টিক মেটেরিয়াল সংগ্রহ কর নি তো? যদি করে থাকো তাহলে সাবধান, এই জিনিসটা তোমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে।" কি বলতে চাইছে মাইক কিছুই আমার বোধগম্য হয় না। সত্যি আমি মনে করতে পারি নি কোন বিষয়ে মাইক এ কথাগুলো বলতে পারে! এ দেশ থেকে কিছু গোল্ড অর্নামেন্ট, গার্মেন্টস একটা রিস্ট ওয়াচ ও দুখানা স্কচ হুইস্কির বোতল আমি সংগ্রহ করেছি। সেগুলো নিয়ে মাইকের কি বলার থাকতে পারে ! ও ক্যাজুয়াল ভাবে মজা করতে করতে হঠাৎ করে কেন যে এভাবে সিরিয়াস হয়ে যায় তা আমার মাথায় ঢোকে নি সেদিন।

"চিন্তা করো না, সত্যি আমি তেমন কিছু সংগ্রহ করি নি" আশ্বস্ত করি মাইককে। এই কদিনে সত্যি খুব আপন হয়ে গেছিলাম আমরা। আর ব্রিটিশরাও এতখানি আবেগপ্রবন হতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না।

"আবার আমাদের দেখা হবে।" মাইকের চোখে জল, কাঁদছে মাইক। আমার জন্য মাইক কাঁদছে ! ও আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না, ওকে কাঁদতে দেখে আমারও চোখে জল এসে যায়।

"নিশ্চয়ই, তোমার মতো বন্ধু খুব ভাগ্য করলে পাওয়া যায়, ইতালিতে এসে তোমার বন্ধুত্ব লাভ আমার জন্য ঈশ্বরের অভাবনীয় উপহার হয়ে থাকবে" আমি মাইকের ঘাড়ে হাত রেখে বলি।

"তোমার জন্য নয়, বলো আমাদের জন্য। God Angitia এতদিনে হয়তো আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। আমার বিশ্বাস আমাদের মুক্তিলাভের দিন এগিয়ে আসছে, বিদায় বন্ধু, দয়াময় ঈশ্বরের ইচ্ছেয় অবশ্যই আবার আমাদের দেখা হবে।" শেষ কথাগুলো বলতে বলতে কাঁদছিল মাইক।

অবশেষে মাইককে বিদায় জানিয়ে আমি বিমানে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু কয়েকটা হিসাব কিছুতেই মিলছিল না। শেষ কথাগুলো বলার সময় মাইকের কণ্ঠস্বরটা যেন নেকড়ে বা হায়নার মত ফ্যাসফ্যাসে শোনাচ্ছিল, বিমানবন্দরের লাউঞ্জের মায়াবী আলো আঁধারির মধ্যেও চোখের তারাগুলো জ্বলজ্বল করছিল ওর। এর কারণ কি হতে পারে? আরেকটা বিষয় ও যথেষ্ট অবাক লেগেছিল আমার, মাইক বলেছিল এতদিনে God Angitia আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

'আমাদের' বলতে মাইক আর কার কথা বলতে চেয়েছিলেন ? মাইক ও কি তাহলে রোমান দেবী Angitia র ভক্ত ? সত্যি বলতে এই প্রশ্নগুলোর কোনটারই উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি। অবশ্য ভোরে ওঠার কারণে তখন সেই উত্তর খোঁজার চাইতে খানিকটা ঘুম আমার বেশি দরকারি ছিল কাজেই...।

বেশ কিছুক্ষন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলাম, যেটা আমার মতো ঘুমকাতুরে মানুষের জন্য খুবই দরকারি ছিল। আমাকে কেউ বিরক্ত না করলে হয়তো ঘুমের মেয়াদ আরও দীর্ঘায়িত হত, কারন এই বিমান নেপলস থেকে মিলানে ল্যান্ড করবে না, সরাসরি চলে আসবে মুম্বাইএ। কাজেই যাত্রী কোলাহলে অযথা ঘুম ভাঙ্গার কোন সুযোগ ছিল না। তবুও ভেঙেই গেল ঘুমটা, আর সেটা জনৈক এয়ার হোস্টেসের ডাকে। বিমানে তখন ধুন্দুমার অবস্থা। গ্রিসের Zakynthos International Airport এ জরুরি অবতরণ করেছে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। চরম বিষধর এক সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিমানের ভিতরে। 'ভাইপার'- যার এক ছোবলে নিভে যেতে পারে যে কোন যাত্রীর জীবনদীপ। জনৈক এয়ার হোস্টেসের নজরে পড়ে যায় সেটা। কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ে সেই মৃত্যুদূত! বাধ্য হয়ে পাইলট যোগাযোগ করে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রালে। অবশেষে অবতরণের অনুমতি পাওয়া যায়, পাইলট বারেবারে সতর্ক করে দিচ্ছেন যাত্রীদের বিলম্ব না করে বিমান থেকে নেমে যেতে। স্থানীয় এয়ারপোর্টে তৈরী কমান্ডার ও সর্পবিশারদরা। সকল যাত্রী নেমে যাবার পর তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও হদিস পাওয়া যায় নি সেই ভাইপারের। অথচ নাকি সি.সি ক্যামেরায় পরিস্কার দেখা গেছে এক সিটের মাথায় কুন্ডলী পাকিয়ে আছে কালো, হলুদে ডোরাকাটা সেই সাপটা। আর দূর্ভাগ্যজনকভাবে সেই সিটের যাত্রী ছিলাম আমি। তবে কি মাইকের কথাই ঠিক! God Angitia-র অভিশাপ আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তাহলে এর থেকে মুক্তি কিসে? হে ঈশ্বর, আমাকে তুমি রক্ষা করো।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে, কিন্তু সেই সর্পরাজের দেখা মেলে না, অথচ ভিডিও ফুটেজে নাকি পরিস্কার দেখা গেছে সেই সাপটাকে, তাই যদি হয় তাহলে সেটা কোথায় উবে যেতে পারে এর মধ্যে? এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের জরুরি বার্তা আদানপ্রদান শুরু হয়। যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবস্থা করা হয় বিকল্প বিমানের। সেই বিমান এখানে এসে পৌঁছাবে আরও দুঘন্টা পর। অগত্যা ! মাইক এর মধ্যে দুবার কল

করেছিল, কিন্তু বিষয়টাকে চেপে গেছি আমি, তবে কি ও কোন অশনি সংকেতের আভাস পেয়েছিল ?

অবশেষে দীর্ঘ বিপদসংকুল বিমানযাত্রা শেষে প্রায় একদিন পর আমি মুম্বাই হয়ে দমদম বিমানবন্দরে এসে নাম। ইতালি থেকে বিমানে ওঠার সময় যেই চনমনে সতেজ ভাবটা আমার ভিতরে ছিল সেটা আমি সম্পুর্ন হারিয়ে ফেলেছি। একটা মৃত্যুভয় সবসময় আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। চোখ বুঝলেই দেখতে পাচ্ছি এক ফণাতোলা ভাইপার আমার দিকে চেয়ে আছে অথবা একদল ক্ষুদ্ধার্থ নেকড়ে ছুটে আসছে আমার দিকে। এর কারণ কি হতে পারে ?

।। সেই পুরানো জার্নালের পাতাটা ।।

বাড়ি ফেরার পর আমার প্রথম কর্তব্য ছিল ব্যাগগুলো খালি করে এতদিন ধরে ব্যবহৃত ময়লা জামাকাপড় লন্ড্রিতে পাঠানো। ট্রলি ব্যাগের সাইড চেনটা খুলে হঠাৎ যেন তড়িতাহত হই আমি। একটা কাগজে মোড়া বাক্স যার ভিতরে সেই রহস্যময় দেবী Angitia র মূর্তিটা। কিন্তু তার নিচে এটা কি ? ফেরার আগের দিন কেনা একজোড়া সৌখিন ইতালিয়ান স্যান্ডেল। একটা অজানা ভয় আবার আমাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। তার মানে এই কারণেই কি দেবী রুষ্ট হয়েছেন আমার উপরে! দেবী মুর্তিটা ব্যাগ থেকে বের করে নিজের অজান্তেই যেন তাঁর কাছে ক্ষমা চাই আমি, তারপর মূর্তিটা একটা টেবিলের উপরে নিয়ে রাখি। মূর্তিটা আকারে হয়তো খুব একটা বড় নয়, কিন্তু তার মধ্যে চোখদুটোর চাউনি অসম্ভব রকম তীক্ষ্ণ। ভাস্কর যেন তাঁর সবটুকু শিল্পসুষমা ফুটিয়ে তুলেছেন মূর্তির চোখদুটোর মধ্যে। সেই চোখের দৃষ্টিতে মায়া, স্নেহ, ক্রোধ কি নেই !

জুলাই মাস হলেও আজ রোদের তেজ সাংঘাতিক এ.সি জোরকদমে চালিয়ে জানলা দরজাগুলো বন্ধ করে সবার আগে ভালো করে স্নান সারলাম। এতক্ষণে কিছুটা শান্তি পাই আমি। ছাদে ভিজে গামছা মেলতে গিয়ে কি মনে হতে টব থেকে একমুঠো সাদা নয়নতারা ফুল তুলে আমি Angitia-র মূর্তির সামনে এনে রাখি। মৃদু একটা সুগন্ধে যেন ভরে ওঠে সারা ঘর। কিন্তু এ কি করে সম্ভব ? নয়নতারা কোনদিন ই সুগন্ধি ফুল নয়, তবে কি আমার অবর্তমানে মা দামি কোন রুম ফ্রেশনার স্প্রে করেছিল আমার ঘরে? যার গন্ধের রেশ এখনো সামান্য

হলেও রয়ে গেছে ! কিন্তু তাহলে ঘরে ঢুকেই আমি সেই সুগন্ধ পেলাম না কেন ? নানান প্রশ্ন তখন একের পর এক উঁকি মেরে চলেছে আমার মনে। তার মধ্যেই ইন্টারকম বেজে ওঠে। মা খেতে ডাকছে। বহুদিন পর মায়ের সাথে বসে লাঞ্চ করব। আর মায়ের হাতের রান্না ! বিদেশে গিয়ে যেটা আমি সবচাইতে বেশি মিস করেছি।

ডাইনিং চেয়ারে বসে খাবারের থালাটা সামনে টেনে নিই। খেতে খেতে মাকে তখন বলে চলেছি ইতালি দেশের নানান কথা। আমার কথার মধ্যেই হঠাৎ চমকে ওঠে মা, "সমু, তোর চেয়ারের পিছনে ওটা কি রে ?" আমি ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পিছন দিকে তাকাই, কিন্তু কোন কিছুই আমার নজরে পড়ে না।

"কি দেখলে তুমি ?" আমি ভয়ে ভয়ে জানতে চাই। মা-ও খানিকটা ভয় পেয়ে গেছে বেশ বোঝা গেলো। কিন্তু এর কোন কারন মাথায় আসছে না, কাঁপাকাঁপা গলায় আমি আবার জানতে চাই মায়ের কাছে।

"মনে হলো ডোরাকাটা মতো একটা সাপ তোর চেয়ারের পায়ায় পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।"

"তা কি করে সম্ভব? এই দোতালার ডাইনিং রুমে সাপ কোথা থেকে আসবে বলো তো?" পাছে মা ভয় পেয়ে যায়, তাই শান্তনার সুরে আমি বলি। আমার তখন হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে। খাবার আর মুখে তুলতে পারি না আমি, তবে কি দেবী আবার রুষ্ট হয়েছেন আমার প্রতি ! কিন্তু কেন ? আমাকে ভাত ফেলে উঠে পড়তে দেখে মাও তার বাড়াভাত ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখে। ভয়ের এক চোরাস্রোত তখন বইছে আমাদের চারপাশে, অথচ বিমানের মতো এখানেও অলক্ষ্যে রয়ে যায় সেই স্বর্প দেবতা। আমি আমার রুমে ঢুকে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে আবার এ.সি. অন করি। আচমকাই চোখ যায় সেই টেবিলের দিকে। কি দেখছি আমি ! আমার পোষা বিড়াল ব্ল্যাকি তখন পরম তৃপ্তিতে একটা ইঁদুর মেরে সেই টেবিলে বসে খাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি ব্ল্যাকিকে তাড়িয়ে দেয়াল আলমারির মধ্যে নিয়ে রাখি আমি সেই রহস্যময় মূর্তিটাকে। কি আশ্চর্য, খানিক আগে সারা ঘরে যে মিষ্টি একটা গন্ধ পেয়েছিলাম, সেটা এখন উধাও। তার জায়গায় এক বিশ্রী পুতি গন্ধ তখন আমার চারপাশে। বাধ্য হয়ে এ.সি. বন্ধ করে জানলাগুলো আমি খুলে দিই। জানলা দিয়ে তখন তপ্ত আষাঢ়ের প্রখর রোদ ঘরের ভিতরে এসে ঢুকছে। ইতালিতে শপিং করার

সময় নানান জিনিসের সাথে বেশ কিছু স্থানীয় পেপারের পাতা চলে এসেছে আমার ব্যাগেজে। ফ্যানের হওয়ায় সেগুলো সারা ঘরে উড়ছে। অবসর সময়ে পুরানো নিউজ পেপারের পাতায় চোখ বোলানো অভ্যাস অনেকের মতো আমারও আছে। আমার কোলের কাছে উড়ে এসে পড়া একটা সংবাদপত্রের পাতায় হঠাৎ-ই চোখ পড়ে গেল। ফুটবল যুদ্ধ নিয়েই নানান খবর প্রায় পুরো পাতাটা জুড়ে ছাপা হয়েছে। তার মাঝে দুই কালামের একটা খবর ! তবু সেটাই আমার সম্পূর্ণ মনযোগটাকে আকর্ষণ করে নেয়। এটা কোনো একটা আর্টিকেলের অংশ, পূর্বের পাতার পর এখানে সেটা ছাপা হয়েছে। কিন্তু কি লিখেছে সেখানে ! ইংরেজি ভাষায় লেখা সেই আর্টিকেলটা বাংলায় তর্জমা করলে যা দাঁড়ায় সেটা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।

'রাজা সলমন' দেবী Angitia-র ভক্ত ছিলেন তা আমি আগেও বলেছি। বিভিন্ন ধর্মমত যেই কথাই বলুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক। তাঁর ধর্মীয় দর্শনের সাথে প্রাচীন হিন্দু ও ইহুদি ধর্মমতে সবচাইতে বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি তার রাজত্বে লৌহযুগের ইজরায়েলের উপাস্য দেবতা Yahweh-র মন্দির স্থাপন করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি প্রাচীন রোমান স্বর্পের দেবী Angitia-র প্রতি আনুগত্যশীল হন, কেন তিনি দেবী Angitia-র প্রতি অনুগত হন এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে স্যার মার্স মনে করেন রাজত্ব বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি যখন অধুনা ইতালি অভিমুখে গমন করেন, তখন কোন এক বিষধর সর্প তাঁকে দংশন করলে সেই স্থানে জাগ্রত দেবী Angitia-র মন্দিরে গিয়ে তিনি প্রার্থনা জানিয়েই সুস্থ হন এবং পরবর্তীকালে তিনি তাঁর রাজত্বে দেবীর মন্দির স্থাপনের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু কোন এক অজানা কারনে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি সেই মন্দির স্থাপন করে যেতে পারেন নি। সেই কারণে তিনি দেবীর অভিশাপ প্রাপ্ত হন, এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত জ্যোতিষী নাস্ট্রাদামুস এক ভবিষ্যৎবানী করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে এগারোটা নয়, জ্যোতিষী নাস্ট্রাদামুসের পৃথিবী বিখ্যাত ভবিষ্যৎবাণী ছিল বারোটা। তাঁর সেই দ্বাদশ ভবিষ্যৎবাণীটা অন্ধকারেই রয়ে গেছে। (এরপর সতেরোর পাতায়)' যেহেতু পত্রিকাটির সতেরো পাতাটা আমার কাছে ছিল না, তাই সেটা আমার জানার কোন সুযোগও ছিল না। কিন্তু কি বলে গেছেন জ্যোতিষী নাস্ট্রাদামুস ? এর উত্তর কে দিতে পারে ?

।। গুরুদেবের আগমন।।

১৭ জুলাই, ঘরে আসার পর থেকে অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা ঘটতে শুরু করেছে, তাতে আমাদের এই বাড়িতে থাকার মনবলটা দিনের পর দিন তলানিতে এসে ঠেকেছে। অবশ্য তার কোন ব্যাখ্যা দেওয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু সেই ঘটনাগুলো এখন তোমাদের বলব, যেহেতু আমি ক্রিমিনাল লয়ার, সে কারনে আমার চেম্বারে হাইপ্রোফাইল মক্কেলের আনাগোনা শুরু হয় রাত দশটার পর। তার আগে দু-চারজন ভদ্রলোক হয়তো আসেন এফিডেভিড বা দলিলের কাজ নিয়ে, কিন্তু সেটা খুবই নগন্য সংখ্যায়, আমার কাছে সমন বা ওয়ারেন্ট খাওয়া বা জেল ফেরত মণিমাণিক্যরা একটু দেরিতে আসেন। এর দুটো কারন, প্রথমত পাছে পুলিশের ঝামেলায় পড়ার ভয়, দ্বিতীয়ত নিজেদের সমাজের কাছে গোপন রাখার প্রয়াস। যাই হোক নিজের পেশার বিষয় বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এই মুহূর্তে আমার মা বয়সজনিত কারণে খানিকটা অসুস্থ হওয়ায় রাত দশটার মধ্যে তিনি ডিনার সেরে আমার খাবার ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েন। মক্কেলদের বিদায় জানিয়ে খানিক স্টাডি, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ঘাঁটা বা টিভি দেখা, এসবের পর রাতের খাবার খেয়ে শুতে শুতে প্রায়দিন আমার দুটো বেজে যায়।

শিহরণটা প্রথম সেদিনই অনুভব করি আমি। পরশু N.D.P.S. মামলার আসামি খিদিরপুরের আসলাম আমার চেম্বারে ছিল প্রায় বারোটা অব্দি। এর মধ্যে ব্ল্যাকির আর্তনাদ আমি বার কয়েক শুনেছি, অবশ্য আমল দিই নি। কারণ এটা বিড়ালদের মেটিংয়ের সময়। মনে মনে হাসছিলাম এই ভেবে যে ব্ল্যাকি হয়তো নতুন কোন বয়ফ্রেন্ড জুটিয়েছে। আসলামকে ছেড়ে আমার রুমে ঢুকে আঁতকে উঠি আমি... এ কি দেখছি! মেঝের একপাশে পড়ে আছে ব্ল্যাকি। বিড়ালটার দুজোড়া পায়ের মাঝে ব্যবধান অনেকখানি। চোখের চাউনি বিষ্ফোরিত,ফরনসিক সায়েন্সের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে হয় শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে অবলা প্রাণীটাকে, আর মৃত্যুর আগে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে সে। তাই যদি হয় তবে কে এমন পৈশাচিক ভাবে মারতে পারে ব্ল্যাকিকে ? ওর নরম কালো লোম টপকে সাদা মার্বেল পাথরের মেঝেতে খানিকটা শুকনো রক্তের দাগ! আর...! সেই দেবী Angitia-র মুর্তিটা পড়ে আছে ব্ল্যাকির প্রায় কাছেই। তবে কি ইঁদুর ধরার জন্য মূর্তিটার কাছে উঠেছিল ব্ল্যাকি? আর ঠিক সেই সময় দেখলাম মেঝেতে পড়ে আছে বস্তুটা ! সাদা ঈষৎ

দলা পাকানো একটা জিনিস। একটা সাপের খোলস ! পাখার হাওয়ায় সেটা তখন মেঝের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ঠিক তখনই...লোডশেডিং! 'ফোঁস!' একটা আওয়াজ যেন অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসে, কিন্তু কাঁপা কাঁপা হাতে মোবাইলের টর্চটা জ্বেলে আর কিছু আমার নজরে পড়ে না, জানলার বাইরে আকাশে এঁকেবেঁকে বিদ্যুৎ চমকে যায়, সাথে গুরুগম্ভীর মেঘের গর্জন। অজানা এক ভয়ে তখন কাঁপছি আমি, যদিও আলোগুলো জ্বলে ওঠে খানিক পরেই। ভাল করে লক্ষ করি ব্ল্যাকির নিথর দেহটাতে পিঁপড়ে ধরতে শুরু করেছে। তারমানে ব্ল্যাকির মৃত্যু হয়েছে বেশ খানিকক্ষন আগেই, হয়তো ঠিক যখন আমি চেম্বারে আসলামের সাথে কথা বলছিলাম।

মা বড় ভালোবাসতো ব্ল্যাকিকে। পাছে মায়ের মন খারাপ হয়ে যায়, সেকারণে সংবাদটা আমি তাকে দিতে চাইনি, ভেবেছিলাম ব্ল্যাকির নিথর দেহটা ভোর হলে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবো। কিন্তু ভয়ে, দুঃখে আমার ও তখন আর ঘুম আসছে না কিছুতেই। বেতের আরাম কেদারায় বসে একের পর এক সিগারেট শেষ করতে করতে ভোরের দিকে কখন যেন চোখ দুটো বুজে গেছিল খানিক্ষণের জন্য। 'ঠক ঠক', মা দরজা ধাক্কাচ্ছে। ভোরের দিকে কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে মায়ের মনটাও বিপর্যস্থ। আর ঠিক তখনই মেঝেতে টাওয়াল দিয়ে ঢাকা ব্ল্যাকির দেহটা মায়ের নজরে পড়ে যায়, হাউ হাউ করে মা কেঁদে ফেলে। "তোকে আমি বারবার বলেছি ওই অলুক্ষুনে জিনিসটা এ বাড়িতে রাখিস না, শুনলি আমার কথা ? এরপর আর কি বিপদ অপেক্ষা করছে তা ভগবান জানে।"

আমি তখন কি করব, তা নিজেই ঠিক করতে পারছি না, একবার মাইককে কল করতে গেলাম, কিন্তু ওর ফোন কিছুতেই লাগছে না। "একটা মূর্তি থেকে কি এমন বিপদ হতে পারে? আমার মনে হয়..." কাঁপা কাঁপা গলায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম আমি, কিন্তু মা আমার কথায় কান না দিয়ে সিদ্ধান্ত মহারাজকে কল করতে শুরু করে। সিদ্ধান্ত মহারাজ আমাদের পারিবারিক গুরুদেব। আমাদের পরিবারের সাথে তাঁর সম্পর্ক বহুদিনের মানুষটাকে দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে।

"হ্যালো বাবা, আ... আমাদের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেবেন? আমাদের খুব বিপদ... না না এভাবে ফোনে সব কথা বলতে পারবো না, আপনি একবার অন্তত আসুন না হলে..." মা কাঁদতে থাকে।

ফোনের ওপার থেকে সিদ্ধান্ত মহারাজের মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা যায়, কিন্তু মোবাইলটা ধরার মতন মনের অবস্থা আমারও ছিল না।

ব্ল্যাকির নিথর দেহটা খাল পাড়ে একটা ভ্যাটের পাশে ফেলে ঘরে এসে ভালো করে স্নান করি আমি, তারপর কোর্ট-এ আমার জুনিয়র স্বপ্নাকে আজ যেতে না পারার জন্য মনগড়া একটা কারণ দেখিয়ে ফোনটা সুইচ অফ করে রাখি। সকাল থেকে আজ কিছু রান্না হয়নি, বাসি ঘরে ঝাঁট-ও পরে নি। মায়ের ঘরের মশারীটা একই ভাবে টাঙানো, ডাইনিং টেবিলে আমার বাসি খাবারগুলো ঠিক সেভাবেই ঢাকা দেওয়া। 'টিক টিক' দেওয়ালে টানানো ঘড়ির সামান্য আওয়াজটাই আজ বড় জোরে শোনাচ্ছে। মাইকের কথাগুলো বারেবারে আমার কানে বাজছে "তুমি ইতালি থেকে কোন এন্টিক ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ কর নি তো? যদি করে থাক, তাহলে সাবধান, এই জিনিসটা তোমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে" হায় ভগবান, সেদিন মাইকের কথাগুলো যদি একটু শুনতাম।

ঠিক এভাবেই আরও ঘন্টা দুয়েক কেটে যায়, মেঝেয় বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথাই হয়তো ভাবছিলাম, তখনই সদর দরজার বাইরে গাড়ির আওয়াজ কানে আসে। গুরুদেব সিদ্ধান্ত মহারাজ এসেছেন। আমি তাড়াতাড়ি নিচে গিয়ে সদর দরজাটা খুলে গুরুদেবকে প্রনাম করি। মা উপরের বারান্দায় একই ভাবে তখনো দাঁড়িয়ে।

দোতলার ড্রইং রুমের একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে গুরুদেব, খানিক দূরে চেয়ারে ঈষৎ মাথা নিচু করে মা বসে আছে। আমি গুরুদেবের মুখামুখি আরেকটা সোফায় বসে সোলেরো বিচ থেকে সেই রহস্যময় মুর্তিটা সংগ্রহের ইতিহাস গুরুদেবকে বর্ণনা করি। আমার কথা শেষ হবার পর তিনি মূর্তিটার সামনে গিয়ে ভালো করে সেটাকে কিছুক্ষন পর্যবেক্ষন করেন।

"শান্তি, আমার মনে হয় তোমার অনুমানটাই সঠিক, পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু অভিশপ্ত বস্তু আছে, যার সংস্পর্শে এলে তা মানবজীবনে চরম কোনো প্রভাব ফেলে যায়, আমার বিশ্বাস এটা ঠিক তেমনি একটা কিছু।"

গুরুদেবের কথায় মা একবার ওনার দিকে, একবার আমার দিকে তাকান। "তাহলে আমরা কি করবো, আপনি বলে দিন।" কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত লাগছে মা'কে, এর আগে মা'কে এতখানি ভেঙে পড়তে আমি কখনো দেখি নি।

"গঙ্গাতীর আতি পুণ্যভূমি। আমার মনে হয় মা গঙ্গার কূলে মূর্তিটাকে নিবেদন করাটাই তোমাদের কাছে সবচাইতে নিরাপদ হবে।"

“তাহলে গুরুদেব, যা করার আপনি তাড়াতাড়ি করুন তেমন হলে কালকেই আমরা...”

“কাল নয়, আজই, এক্ষুনি।” মায়ের কথা শেষ করার সাথে সাথেই বলেন গুরুদেব। আমার মনের ভিতর তখন একটা ঝড় বয়ে চলেছে দেবী Angitia-র মূর্তিটাকে বিসর্জন দিতে গেলে তার চরম কোন কু প্রভাব আমাদের জীবনে নেমে আসবে না তো ! কিন্তু কে শুনবে আমার কথাগুলো।

"ঠিক আছে, আপনি তাহলে একটু বসুন, আমি চট করে তৈরী হয়ে আসি” মা ভিতরের ঘরে যায়।

“বারুইপুরের আদি গঙ্গার তীরে সদাব্রতঘাট বড় পবিত্র জায়গা। আমার ইচ্ছে মূর্তিটাকে ওখানেই আমরা মা গঙ্গার চরণে নিবেদন করব।” অনিচ্ছেসত্বেও আমি সম্মতি জানাই গুরুদেবের কথায়। খানিক বাদে মা তৈরী হয়ে এলে আমরা সদর দরজা বন্ধ করে গুরুদেবের পিছন পিছন তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠি। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে গুরুদেব, পিছনে আমরা দুজন, আর গাড়ির ডিকিতে সেই রহস্যময় Angitia-র মুর্তিটা। আজ রাস্তায় যানজট কম থাকায় বাইপাস ধরে বারুইপুর পৌঁছাতে ঘন্টা খানিকের বেশি সময় লাগলো না। বহু বছর আগে একবার এসেছিলাম এখানে, তবে আগের সাথে এখনকার জায়গাটাকে ঠিক মেলাতে পারলাম না।

সদাব্রত ঘাটের সামনে এসে ঈষৎ ঝাকুনি দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। ড্রাইভার নেমে সামনে ও পিছনের দরজা খুলে দেয়, গুরুদেবের ইশারায় আমরা নেমে আসি। বিশালাকার এক বট ও অশ্বত্থ গাছের নিচে বহু প্রাচীন এক কালী মন্দির, তার এক পাশে আরেকটা ছোট বটগাছের তলায় বাবা ভোলানাথের এক মন্দির। মাঝে আদিগঙ্গার সমান্তরালে রাস্তা চলে গেছে। গঙ্গার কোলে বিশাল সাবেকি এক ঘাট। গুরুদেব সাদা কাপড়ে মোড়া মূর্তিটা এনে ঘাটের এক পাশে রাখেন। তারপর কিছুক্ষনের জন্য ধ্যানে বসেন 'গয়া গঙ্গা গদাধর হরি, হরিবোল হরি, হরিবোল হরি, হরিবোল হরি' মন্ত্রপাঠ করে মূর্তিটার গায়ে তিনবার গঙ্গাজল ছিটিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করে আবার গাড়িতে এসে উঠি। বটগাছের কোটর থেকে অদ্ভুত এক আওয়াজে বোধ হয় কোন তক্ষক শিশু ডেকে ওঠে। খানিক দূরে কীর্তনখোলা শ্মশানে চিতার আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। সূর্য অস্ত

গেছে বেশ কিছুক্ষণ, গঙ্গার ঘাটে বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। তবু পশ্চিম আকাশে একটা লালচে আভা রয়ে গেছে। আমরা গাড়িতে ওঠার পর ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয়। "আজ রাতটা নিরাপদে কেটে গেলে বুঝবে আর তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।" সামনাসামনি সেই ছিল গুরুদেবের শেষ কথা। এর পর আমাদের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে তাঁর সাদা স্করপিওটা মিলিয়ে যাওয়া অব্দি তিনি আর কোন কথা বলেন নি আমাদের সাথে।

সারাদিন আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়নি বললেই চলে। বাড়ি ঢোকার মুখে পাড়ার মোড়ের দোকান থেকে রুটি সবজি কিনে নিয়ে ঢুকেছিলাম। খানিক পরে মা আর আমি সেটা দিয়ে ডিনার কমপ্লিট করলাম। আজ আমাদের দুজনেরই ঘুমের ভীষণ প্রয়োজন। সেকারনে সদর দরজার বাইরে 'চেম্বার বন্ধ' বোর্ডটা ঝুলিয়ে রেখে আমি দরজার তালা লাগলাম। গাড়িতে যাবার সময় গুরুদেব অদ্ভুত একটা কথা বলেছিলেন, মনে পড়ে গেল, তিনি বলেছিলেন, আজ রাতে যেন আমরা এক ঘরে শুই। এর কোন কারণ না বুঝলেও রাতে মায়ের সাথেই শুলাম আজ।

ঘড়িতে তখন কটা হবে বলতে পারব না, দরজায় মৃদু একটা আওয়াজ পেয়েছিলাম বোধ হয়। মা বাথরুমে যাবার জন্য উঠেছে। রুমের বাইরে লনের আলোটাও জ্বলছে। আমি আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ি। ঠিক কতক্ষন ঘুমিয়েছি জানি না, মা তখনো বাথরুম থেকে আসে নি এতো দেরি তো হবার কথা না। ঘুম চোখে উঠে লনে যাই আমি। দোতলার লনের এক পাশে বাথরুম। বাথরুমের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। তাহলে মা এত রাতে কোথায় যেতে পারে। সিঁড়ি দিয়ে এক পা এক পা করে নিচে নামি, নিচের তলাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি চিৎকার করে মা'কে ডাকতে ডাকতে নিচের তলায় আলোগুলো জ্বালি।

হঠাৎ করে চমকে যাই, নিচের তলার সোফায় হেলান দিয়ে বসে অসম্ভব রকম ঘামছে মা। সারা মুখে একটা ভীতসন্ত্রস্ত ভাব। আমাকে দেখে মা কিছু একটা বলতে চায়, কিন্তু জড়ানো গলায় মায়ের সেই কথাগুলো আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনা শুধু কথার মাঝে 'সাপ' শব্দটা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি করে ডাক্তার সরকারকে কল করি। ডাক্তারবাবু আমাদের বিশেষ পরিচিত, তাই আমার ফোন পেয়ে খুব একটা দেরি তিনি করেন নি। মিনিট কুড়ির মধ্যেই তাঁর গাড়ি এসে দাঁড়ায়। মাকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে দরজা

খুলে আমি তাঁকে ঘরে নিয়ে আসি। কিন্তু তার মধ্যেই... ডাক্তারবাবুর বক্তব্য, কোনকিছুতে ভীষণরকম ভয় পেয়েই মা হার্টফেল করেছেন, কিন্তু কিসের ভয় পেয়েছে মা? কেনই বা মাঝরাতে উপরের বাথরুম ছেড়ে মা নিচের তলায় নামতে গেলো ?

সকালে মায়ের মৃত্যুসংবাদ সবাইকে ফোন করে জানাচ্ছিলাম, আমার পাশে দু-একজন পাড়া প্রতিবেশী বাদে শান্তনা দেবার আর কেউ নেই, তখনই গুরুদেবের নাম্বারে আমি ফোন লাগাই। দুবার ফুল রিং হয়ে কেটে যায় ফোনটা। এমন তো কখনো হয় না, আমি যতটা জানি গুরুদেব ভোর পাঁচটার মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে পড়েন। তবে কি উনি এখন প্রার্থনা কক্ষে ব্যস্ত ? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমি ল্যান্ড নাম্বারে কল করি। ফোনটা ধরে জনৈক আশ্রমিক সংযুক্তানন্দ ভাই। খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ লাগছিল ছেলেটার কণ্ঠস্বর। ওর কাছে জানতে পারি রাতে গুরুদেবকে সম্ভবত বিষধর কোন সর্প দংশন করেছে। তাঁকে কলকাতার এক নামকরা বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সবাই সেখানেই আছেন। ভয়ের আরেকটা শীতল স্রোত আচমকা আমার সারা শরীরে বয়ে যায়, তবে কি... এসবই দেবী Angitia র অভিশাপ ! কিন্তু কে সেই প্রশ্নের জবাব দেবে ? আমি ছাড়া যে আর একজন প্রাণী ও এই ঘটনার সম্বন্ধে কিছু জানে না।

।। সেই ইহুদী পুরোহিতের কথাগুলো ।।

আমাদের আদালতের এক বয়স্ক উকিলবাবু একটা কথা মাঝেমধ্যেই বলতেন। ঘরে মা, বোন বা স্ত্রী না থাকলে তুমি বাড়িতে থাকার চেয়ে হাওড়া স্টেশনে থাকতে পারো, অনেক শান্তি পাবে, সেখানে হয়তো সময় সময় ঝাড়পোছ, সাফ-সুতরো হবে অন্তত। কথাটা যে বাস্তবিক কতখানি সত্যি, তা বুঝলাম মা চলে যাবার পরে। দেখতে দেখতে প্রায় দুমাস হতে চললো আমার এই অন্তহীন নিঃসঙ্গতার। এর মধ্যে দু-দুটো কাজের মেয়ে জোগার করেছিলাম, সকালে বাসন কটা মজা, ঘর মোছা। ব্যাস এটুকুই কাজ, কিন্তু কেউ টেকে নি। ঘরে ঢুকলেই ওরা নাকি সাপের ফোঁস ফোঁসানির আওয়াজ পায়, আমিও আর আপত্তি করি নি। পরের মেয়ে, আমার বাড়ি কাজ করতে এসে শেষমেশ সাপের কামড় খেয়ে মরবে নাকি।

এখন কিছু কাগজের থালা এনে রেখেছি। কোনদিন ইচ্ছে হলে চারটে চাল ফুটিয়ে নিই, ইচ্ছে না হলে সস্তার হোটেল। আর দুটোর কোনোটাতেই মন সায় না দিলে ক্রিমক্রেকার বিস্কুট আর জল। আজ রবিবার বহুদিন পর আজ বাড়িতে মাংস ভাত রান্না করে খেলাম। রাতে ভালো ঘুম হয় নি, তাই তাড়াতাড়ি মাধ্যান্নভোজ সেরে একটু ঘুমোতে চাই আমি। ঘন্টাখানিক এপাশ ওপাশ করেও ঘুম এলো না। সারা ঘরে কার্বলিক এ্যাসিডের ঝাঁঝালো গন্ধের মধ্যে কি ঘুম আসে নাকি? জানি কার্বলিক এ্যাসিডে এ বিপদ কাটার নয়, তবু জাস্ট মনের শান্তনা। পরদিন কোর্টে একটা ভাইটাল কেস আছে, তাই লিডিং কেসের একটা বই সেলফের উপরের তাক থেকে নামতে গিয়ে আচমকাই জিনিসটার দিকে আমার নজর যায়, কি দেখছি আমি। এ কি করে সম্ভব ! ঈশ্বর আমার জীবনটাকে আর কতখানি দুর্বিষহ করে দেবেন ? সাদা কাপড়ে জড়ানো দেবী Angitia-র মূর্তিটা সদর্পে বিরাজ করছে সেলফের তাকে। আমার পরিষ্কার মনে আছে গুরুদেব মূর্তিটাকে আদি গঙ্গার ঘাটে রেখে এসেছিলেন, অথচ... ! এ কি করে সম্ভব। এ.সি. র মধ্যেও তখন আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। একলাফে ল্যাডার থেকে মেঝেতে নেমে পড়ি আমি। তখনই টেবিলে রাখা একটা হ্যান্ডবিলের দিকে আমার নজর চলে যায়। হলুদ রঙের হ্যান্ডবিলটা পেপার ওয়েট চাপা দেওয়া। বাংলায় লেখা হ্যান্ডবিলটার নিচের দিকে কয়েকটা লাইনের তলায় লাল দাগ দেওয়া। একটা সস্তা হ্যান্ডবিল কে এভাবে যত্ন করে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে টেবিলে রেখে গেছে ? এ ঘরে তো আমি ছাড়া আর কেউ এর মধ্যে ঢোকে নি।

কাল অভিশাপের কবলে পড়েছেন? গৃহে অশান্তি? মৃত্যুভয়? সর্পদংশনযোগ? গ্যারান্টি দিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করা হয় --ইহুদি পূজারী আব্রাহাম... তলায় ডটপেনে লেখা একটা মোবাইল নাম্বার।

কাগজটা ভালো করে দু-চারবার চোখ বোলাই আমি, বানের জলে ভেসে যাওয়া মানুষ খড়কুটোর মতো হাতের কাছে যা পায় আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। আমার অবস্থাটা আজ অনেকটা সেরকমই। দু-চারবার ইতস্তত করতে করতে অবশেষে হ্যান্ডবিলের নাম্বার ধরে করেই ফেললাম ফোনটা। "হ্যালো, কে বলছেন ?" ওপার থেকে গম্ভীর গলায় ঈষৎ টানাটানা বাংলায় কে একজন বলেন।

“একটা জটিল সমস্যা নিয়ে আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই।

কোথায় কখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি, দয়া করে যদি একটু বলেন।"

"হুম, ঠিকানাটা বলছি, লিখে নিন 'JEWISH CEMETERY, NARKELDANGA MAIN ROAD, KOL : 54" তিনি আমাকে কলকাতার এক ইহুদি সমাধিক্ষেত্রে যেতে বলছেন। তবে কি সেই সমাধিক্ষেত্রে আবার নতুন কোন বিপদ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে ?

অক্টোবর মাসের নির্দিষ্ট দিন দুপুর বেলা আমি রওনা হলাম। সেই পুরহিতের কথা অনুযায়ী শিয়ালদা কোর্টের পাশের বিগবাজারের সামনে থেকে ৪৫ এ বাস ধরে মিনিট পনেরোর মধ্যেই চলে এলাম বেলেঘাটা ফুলবাগান কালীমন্দিরের সামনে। মন্দিরের ডানপাশ থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে সুভাষ সরোবরের দিকে। ওই পথে মিনিট দুয়েক হেঁটে গুরুদাস কলেজের মাঠের পিছনেই সেই পুরানো আমলের প্রাচীর ঘেরা জায়গাটা চারিদিকে গাছপালায় ঢাকা। কল্লোলিনী ব্যস্ত শহরের মাঝে খানিকটা শান্তির মরুদ্যান যেন। আকাশটা আজ সকাল থেকেই মেঘলা। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি থেকে বাঁচতে সমাধিক্ষেত্রের একপাশে শিবমন্দিরের চাতালে আশ্রয় নিই আমি। বাস থেকে নেমে এই রাস্তায় আসার পর থেকেই ওই মানুষটার মোবাইলে ফোন করতে বলেছে সেটা নাকি কভারেজ সীমার বাইরে। আশ্চর্য ! এটুকু সময়ের মধ্যে মানুষটা কোথায় যেতে পারে ? আর এই ব্যাস্ত মহানগরীর মধ্যে এমন জায়গা আছে নাকি যেখানে বহুল ব্যবহৃত একটা মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার পাওয়া যায় না ?

দেখতে দেখতে প্রায় এক ঘন্টা সময় পেরিয়ে যায়। এর মাঝে বেশ কয়েকবার তার মোবাইল নাম্বারে আমি কল করেছি, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। মেঘলা দুপুর তিনটে বাজতে না বাজতেই রাস্তার আলোগুলো আজ জ্বলে উঠেছে। বৃষ্টিটা এখন বেশ জোরেই পড়ছে। শিবমন্দিরের পুরানো টিনের শেডের ফাঁক দিয়ে জল এসে পড়ছে সারা গায়ে। অবশেষে প্রায় দেড়ঘন্টা পর আমার মোবাইলটা বেজে ওঠে। "ইন্দ্রনীল বাবু, আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক সেখানেই অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুনি আসছি।" গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আমার। আমাকে তো উনি চেনেন না, তাহলে কি করে জানলেন যে আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি ? আর যেখানে কিছুক্ষন আগে অব্দি ওনার মোবাইলের টাওয়ার

ধরছিল না তখন ধরেই নেওয়া যায় খুব কাছাকাছি ছিলেন না তিনি, তবে কি তাঁর হয়ে অপর কেউ আমার গতিবিধির দিকে নজর রাখছিলেন এতক্ষন ধরে ? কিন্তু কেন ?

"ইন্দ্রনীল বাবু, আপনাকে বহুক্ষন অপেক্ষা করতে হলো, আমি খুব দুঃখিত, আসুন আমার সাথে" আমি চমকে ওনার দিকে তাকাই। এক মাথা কাঁচা পাকা চুল অব্রাহামের। গলায় নানান রকমের পাথরের দু-চারটে মালা। রোগ, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, সামনের দিকে খানিকটা ঝুকে হাঁটেন মানুষটা। "চলুন এবার ভিতরে যাওয়া যাক।" ওনার কথায় আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। বহুদিনের পুরনো এই সমাধিক্ষেত্র। রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার লুকিয়ে কত না ইতিহাস।

আব্রাহাম সাহেবের কাছে সেই সব শুনতে শুনতে আমি Jewish Cemetry-র ভিতরে প্রবেশ করি। ইতিহাসের পাতায় আমরা যেই বর্ননা পাই তা হলো একজন ইহুদি ধর্মাবলম্বী যিনি প্রথম কলকাতায় পা রাখেন তিনি হলেন Shalon Cohen সময়টা ছিল ইংরেজি ১৭৯৮ সাল। অধুনা আলেপ্পো শহর থেকে তিনি এখানে বাণিজ্য করতে আসেন। এরপর ধীরেধীরে আরও বেশ কিছু ইহুদি মানুষজন এখানে আসতে শুরু করেন। আর প্রথম যেই ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষ এখানে দেহত্যাগ করেছিলেন তাঁর নাম ছিল Hacham Moses, সেদিনটা ছিল পয়লা জুন, ১৮১২ সাল। সেই মুহূর্তে তাঁকে দাফন করার জন্য ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রয়োজন সমাধিক্ষেত্রের জন্য খানিকটা জায়গা। তখন এ শহরে তাঁর চেনা জানা মানুষজনদের Shalon Cohen সাহেব অনুরোধ জানান সমাধিক্ষেত্রের জন্য খানিকটা জায়গা খুঁজে দিতে। সাহেবের পরিচিত এক বাঙালি ভদ্রলোক তাঁকে এই স্থানটি সম্পূর্ন বিনামূল্যে দান করতে চান, কিন্তু সাহেব দান নিতে অস্বীকার করেন। তখন সাহেবের আঙুলের একটি আংটির বিনিময়ে তিনি এই স্থানটা ইহুদি সমাধিক্ষেত্রের জন্য লিখে দেন।

নিজেকে তখন আমার খুব ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছিল এরকম ঐতিহাসিক এক স্থানে আসার সুযোগ পাবার জন্য। সমাধিস্থলটা পুরানো হলেও পরিচ্ছন্ন। উঁচু প্রাচীরের চারপাশে সুউচ্চ বৃক্ষরাজি মেঘলা বিকেলে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝখান দিয়ে পারে চলা পথ। বহু পুরানো চুন-সুরকির রাস্তা এগুলো, শুকনো শ্যাওলা জমে জমে কালো হয়ে গেছে। খানিকটা গিয়ে ফুলের বাগান, পায়ে চলা রাস্তার

দুধারে গাছগুলো সেখানে ফুট চারেক উচ্চতায় নিপুন করে ছাঁটা। এই স্থানটির সৌন্দর্য যে কোন পার্কের শোভাকেও হার মানায়। বৃষ্টি থেমে গেছে কিছুক্ষন, মেঘলা বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের আলোটা মেঘের ভিতর থেকে উঁকি মারছে। আব্রাহাম সাহেবের সাথে হাঁটতে হাঁটতে আমি সমাধিক্ষেত্রের আরেক প্রান্তে এসে পড়ি। বোঝা যায় এদিকের সমাধি গুলো বহু প্রাচীন, যার কোন কোনটা বিংশ শতকেরও আগের। একে একে সারি দেওয়া নৌকোর খোলের আকারের ফুট তিনেক উচ্চতার সমাধি এই স্থানে, তার মাঝে শ্বেত পাথরের কিছু সমাধি থাকলেও সেগুলো বয়েসের সাথেসাথে কালচে হয়ে গেছে।

"তাহলে এখানে বসা যাক ইন্দ্রনীল বাবু" দুটো প্রাচীন সমাধির মাঝে একফালি ফাঁকা জায়গায় এসে তিনি আমাকে বলেন। সত্যি বলতে দেখা হবার পর মানুষটা যেন আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছেন, তাঁর কথায় আপত্তি করতে পারলাম না, আমি মাটিতেই বসতে যাচ্ছিলাম, উনি বাঁধা দেন, কাঁধের ব্যাগ থেকে তিনি একটা পলিথিন শীট বের করে পেতে দেন। দুজনে মুখোমুখি সেখানে বসি।

"ইন্দ্রনীল বাবু"

"বলুন"

"আপনি দুটো পা এক করে চোখ বুজে আমার সামনে দাঁড়ান, আমি বলার আগে চোখ খুলবেন না।" আমি হুকুম তামিল করি। কতক্ষন এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎই তাঁর ডাকে আমার সম্মতি ফেরে। তিনি আবার আমাকে আগের জায়গায় এসে বসতে বলেন। "আপনি তো একজন শিক্ষিত মানুষ, তাহলে এত বড় ভুল আপনি কি করে করলেন ?"

"আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।" খানিকটা অবাক হয়েই আমি বলি।

"আপনি প্রাচীন রোমান সর্পের দেবী Angitia-র রোষে পড়েছেন। তিনি কিছুতেই আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না, তিনি সবকিছু কেড়ে নিয়ে আপনাকে পথের ভিখারী বানিয়ে দেবেন, মহারাজ হরিশচন্দ্রের কাহিনী আপনি শুনেছেন তো ?"

"হুম" কাঁপা কাঁপা গলায় আমি সম্মতি জানাই।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র শনি মহারাজের রোষে পরে সবকিছু হারিয়েছিলেন, দেবী Angitia-র রোষও ঠিক তেমনই ভয়াবহ। তাঁর রোষের হাত

থেকে রাজা সলোমন, ইংলন্ডের জলদস্যু আনি ও তার স্বামী বনি কেউ রেহাই পায় নি। তবু হরিশ্চন্দ্র একসময় শনির দশা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন, কিন্তু...'

কিন্তু...? অক্টোবরের বিকেলে সূর্যটা ডুবে গেছে এর মধ্যেই। ধীরেধীরে সন্ধ্যে নেমে আসছে। সমাধিক্ষেত্রে চারিদিকটা আলোয় ঝলমলে হলেও গাছের ছায়ায় এপাশটা খানিকটা আলো আঁধারী।

"দেবী Angitia-র অভিশাপ কখনো এক জন্মে শেষ হয় না, এটা জন্মজন্মান্তরকাল ধরে চলতেই থাকে।"

“তার মানে ? কি বলছেন আপনি?”

“নেকেশিয়া রাজ্যের নাম শুনেছেন?" ঘাড় নেড়ে আমি জানাই যে এই বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই। "রাজা সলমন একজন সুদক্ষ রাজা হলেও তিনি ছিলেন লোভী। না, অর্থের উপর তার কোন লোভ ছিল না, তাঁর লোভ ছিল মান, যশ আর সাম্রাজ্যের উপরে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। সুহাইনো যুদ্ধে যাবার আগে তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন যুদ্ধজয় করে আসার পর তিনি দেবী Angitia-র মন্দির নির্মাণ করবেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি, বরং সেই যুদ্ধজয় করে ফেরার পর তিনি ছুটে যান নেকেশিয়া প্রদেশ জয় করতে, সময়টা হয়তো ছিল ৯৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। তাঁর বয়স তখন ষাটের আশেপাশে কিন্তু তিনি নেকেশিয়া জয় করতে পারেন নি, সেই যুদ্ধে তাঁর বহু সৈন্য মারা যায়, অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভগ্ন মনোরথে তিনি ফিরে আসেন। কিন্তু দেবী Angitia-র চরিত্রে ক্ষমা বলে কোন শব্দ ছিল না।"

"কি বলছেন এসব !” চমকে উঠি আমি।

“আমি ঠিকই বলছি, রাজা সলমনের সেই বিখ্যাত (তাম্রফলক) Copperscroll এর কথা জানেন আপনি?"

"হ্যাঁ, সেটা আবিষ্কার হয়েছিল ১৪ই মার্চ, ১৯৫২ সালে Qumran এর তৃতীয় গুহা থেকে। যেই তাম্রফলক আজ অবধি কোন ঐতিহাসিক পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি, তবু সবাই মনে করেন ওই তাম্রফলকে সুলেমানি গুপ্তধনের হদিস লেখা আছে।" এক নিঃশ্বাসে আমি কথাগুলো বলি, এতক্ষন হয়তো আমরা দুজন দুজনকে ঈষৎ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখছিলাম, আমি প্রথম থেকেই আব্রাহামকে একজন অর্ধশিক্ষিত বুজরুক বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম, আর উনি ও হয়তো ভেবেছিলেন ইতিহাস

সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুব সামান্য। এবার ভুল ভাঙল দুজনেরই। সেই সাথে ওনার কথায় মানুষটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেকটাই বেড়ে গেল।

আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে মৃদু হাসেন আব্রাহাম "হ্যা ইন্দ্রনীল বাবু, কেতাবি ইতিহাস তাই বলে, কিন্তু...।"

“কিন্তু ?” আমার কৌতুহল তখন ফুটন্ত জলের মতো টগবগ করে ফুটছে।

“১৪ ই মার্চ, ১৯৫২ এর অনেক আগেই একজন মানুষ এই Copper Scroll এর শুধু সন্ধানই পান নি, ইভেন তার পাঠোদ্ধারও করেছিলেন, হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত সেই গুপ্তধনের হদিস তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি এত নিখুত ভাবে জানতে পারেন নি। অবশ্য পরবর্তী সময়ে একজন ঐতিহাসিক এই গুপ্তধনের বিষয়ে গবেষণায় খানিকটা সফল হন, সেকথায় পরে আসছি।"

"তারমানে! কে সেই ব্যক্তি যিনি সুলেমানি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিলেন ?"

"ইংলন্ডের বিখ্যাত জলদস্যু আনি বনি” আব্রাহাম খুব ধীর লয়ে কেটে কেটে বললেন কথাগুলো যা হয়তো আমার বুকের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

“কিন্তু...!”।

“কোন কিন্তু নয় ইন্দ্রনীল বাবু, সম্ভবত রাজা সলমন চেয়েছিলেন আনির হাত দিয়ে দেবী Angitia র মন্দির নির্মাণ হোক, তাই Dead Sea র উত্তর পশ্চিমে Kalya অঞ্চলে কুমরানের গুহায় তাঁর গুপ্তধনের হদিস তিনি আনিকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জলদস্যু আনি সেই একই ঐতিহাসিক ভুল করে বসলেন, ঠিক যেই ভুল সলমন করেছিলেন।"

"কি সেই ভুল ?” জানতে চাই আমি।

“আনি ও তার স্বামী বনি দেবী Angitia-র মন্দির নির্মাণে না এগিয়ে চললেন পরবর্তী অভিযানে। আর তখন ব্রিটিশ নৌবহরের সাথে যুদ্ধে ছারখার হয়ে যায় তাদের সাধের বাহিনী। আনির স্বামী কৌশলে পালিয়ে গেলেও তিনি ধরা পড়ে যান। অবশ্য শাস্তি বিশেষ কিছু হয় নি আনির। কারন তখন নাকি তিনি ছিলেন গর্ভবতী। আর তখনকার ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী কোন গর্ভবতী মহিলাকে সাজা দেবার বিধান ছিল না। অবশ্য অনেকে বলেন প্রকৃতপক্ষে তিনি গর্ভবতী ছিলেন না।

এটা ছিল তাকে বাঁচাবার জন্য তার পিতা তখনকার ইংল্যান্ডের বিখ্যাত আইনজীবী উইলিয়াম কারমাকের একটা চাতুরী মাত্র।" মাইক যে কথাগুলো বলেছিল আজ আমাকে প্রায় সেই কথাগুলো বলে আব্রাহাম।

রাত এখন প্রায় সাড়ে আটটা। আব্রাহামের কথার মধ্যেই আমাদের ডানপাশের সমাধির এক কোনে জঙ্গলগুলো কেঁপে ওঠে কয়েকবার। সমাধিক্ষেত্রের ভিতরে আমাদের নিকটবর্তী ল্যাম্প পোস্টটার দূরত্ব প্রায় দুশো গজ। তবে সেটা একটা বড় গাছের আড়ালে হওয়ায় এখানে তার আলো সেভাবে এসে পৌঁছাচ্ছে না। কাজেই আলো-আঁধারী পরিবেশটা আরও রহস্যময় করে তুলেছে। "কি ওখানে !" আমি কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাই।

"কিছু না, একটা ভাইপার" ছোট্ট জবাব অব্রাহামের।

"ভাইপার... কিছু না !" অস্ফুট ভয়ার্ত গলায় কিছু একটা বলতে চাই আমি, তবে কথাটা শেষ করতে পারি না, এই মানুষটার সাথে এখানে প্রবেশ করাটা কি ঠিক হয়েছে আমার? দিনের পর দিন আমি শুধু বিপদের পথে পা বাড়িয়েই চলেছি এর শেষ কোথায়... হে ঈশ্বর আমাকে তুমি বলে দাও।।

"হ্যাঁ, আরেকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক তথা প্রত্নতাত্ত্বিকের কথা এবার আপনাকে বলবো। তাঁর নাম ছিল Gerald Lankester Harding, (8 Decemer 1901 to 11 February 1979) যিনি ১৯৩৬ - ১৯৫৬ অব্দি জর্ডনের পুরাতাত্বিক বিভাগের প্রধান রূপে কাজ করেছিলেন। শোনা যায় এই সময় ১৯৪৮ সালে হার্ডিক্স-এর একটি প্রত্নতাত্বিক জার্নালে তিনি ডেড সি র নিকটবর্তী Copper Scrolls গুলো সম্বন্ধে জানতে পারেন। জাতিতে তিনি ছিলেন ইংরেজ, কিন্তু ওনার একটা পরিচয় হয়তো খুব কম জনই জানেন, তিনি ছিলেন আনি বনির বংশধর।" আরেকবার ওই নামটা শুনে আমার গায়ের প্রতিটা রোম যেন খাঁড়া হয়ে ওঠে। মনে হয় কোন এক রহস্যময় চক্রবুহের ভিতরে আমি প্রবেশ করছি, এখান থেকে আমার মুক্তি নেই, এই মহানগরীর বুক থেকেও সে আমাকে টানছে। তার ডাকে একদিন আমাকে সারা দিতেই হবে, আর এরা সকলেই সেই চক্রবুহের একেকজন কুশীলব। মাথার উপর দিয়ে এক রাতজাগা প্রাণী ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে যায়। কি ওটা? বাদুড়? আচ্ছা বাদুড় কি এতো বড় হয়? কে জানে। "ভয় পাচ্ছেন ইন্দ্রনীল বাবু ?" জানতে চায় আব্রাহাম।

“না মানে... আসলে অনেক রাত হল তো তাই...।"

"রাত-দিন সবটাই তো প্রকৃতির নিয়ম স্যার, দিনকে যদি ভয় না পান, তা হলে রাতকেই বা কিসের ভয়, আর... আমি তো আছি আপনার সাথে।" শেষের কথাগুলোয় অব্রাহামের দৃঢ়তায় যেন খানিকটা সাহস পাই আমি।

"না, না ইয়ে মানে ভয় পাচ্ছি না, কিন্তু...।” আমার কাঁপা কাঁপা কথাগুলোয় মৃদু হাসেন আব্রাহাম।

“আচ্ছা আপনাকে যদি বলি, দেবী Angitia-র অভিশাপ থেকে এতগুলো মানুষকে বাঁচাতে পারেন আপনি, যদি শুধুমাত্র আমার কথা শুনে চলেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে আপনার কোন ক্ষতি করতে পারে, তবে সেই সাথে একটা কথা আপনাকেও দিতে হবে।"

“কি সেই কথা ?” অবাক হয়ে জানতে চাই আমি।

“এই দায়িত্বগুলো পালন করার দিনগুলোর মধ্যে আপনি কখনো মদ্যপান করতে পারবেন না, আর কোন নারীর সাথে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হতে পারবেন না, দেবী Angitia এই দুটো জিনিসকে খুব অপছন্দ করেন। আমার চোখে চোখ রেখে বলুন, পারবেন আপনি ? যদি পারেন, তাহলে আপনার জীবনে কোনদিন ধনসম্পদের কোন অভাব হবে না, শুধুমাত্র কয়েকটা বছর আপনাকে এই ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, তারপর আপনার জীবন ভরে উঠবে অপার্থিব সুখ শান্তিতে। সেই সাথে যা যা আপনি হারিয়েছেন, একদিন সব আবার ফিরে পাবেন।"

"আমার মা কে কি আর ফেরত পাবো ?” নিজের অজান্তেই আমার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

“পেতেই পারেন, সাগর, আর দেবী Angitia কোন কিছুই কেড়ে নেন না, কোন এক সময় সব কিছুই ফিরিয়ে দিয়ে যায়।" অর্থবহ এক হাসি তখন আব্রাহামের মুখে।

"আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, আমাকে আর কয়েকদিন...।”

“বলুন ইন্দ্রনীল বাবু, পারবেন আপনি ? বলুন... আমি জানি পারলে একমাত্র আপনিই পারবেন" আমার ভিতরে সবটুকু চেতনাশক্তি যেন লোপ পাচ্ছে। আমি সম্মোহিত হয়ে পড়ছি ওই মানুষটার কাছে। কিন্তু কে এই মানুষটা! উনি কোন সাধারন ইহুদি পুরোহিত হতেই পারেন না

--নিজের মনেই কথাগুলো ভেবে চলেছি আমি।

"আঃ... হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি পারবো, আমি পারবো" বুঝতে পারছি আমার সবটুকু বাহ্যিক চেতনা লোপ পেয়েছে। আমি এখন ওই মানুষটার হাতের পুতুল শুধুমাত্র।

"আমার পরিচয় তুমি একদিন জানতে পারবে ইন্দ্রনীল। তুমি জেনে রেখো, এই লড়াই এ দেবীর আশীর্বাদ যেমন তোমার মাথায় আছে, ঠিক তেমন আমিও সব সময় তোমার পাশেপাশেই থাকবো" চমকে উঠি আমি, এ তো সেই ইহুদী পূজারী আব্রাহামের কণ্ঠস্বর নয়, তবে কে বলছে কথাগুলো?

মানুষটা আমাকে বুঝিয়ে দেন এখন আমার কর্তব্যটা কি, হ্যাঁ আমাকে যেতে হবে ব্রিটেনের লিজার্ট পয়েন্ট-এর কোন একস্থানে, সেখানে আমার জন্য বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক Gerald Lankester Harding এর কনিষ্ঠ পুত্র গ্রাহাম ডিলি অপেক্ষা করে থাকবেন। গুপ্তধনের হদিস দেওয়া সেই Copper Scrolls এর দুর্বোদ্ধ লিপির পাঠোদ্ধার করে গেছিলেন আনি, কিন্তু সাংকেতিক ভাষায়। আনির বংশধর Gerald Lankester Harding সেই সাংকেতিক ভাষার প্রায় নব্বই শতাংশ উদ্ধার করেছিলেন, হয়তো সেই গুপ্তধনের হদিস করে তা দিয়ে দেবীর মন্দির নির্মাণ তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক। ঠিক সেই সময় এক পার্টিতে মদ্যপান করে বসেন Gerald Lankester Harding। এর পর দেবী মুখ ফিরিয়ে নেন। অন্ধকারেই রয়ে যায় সবকিছু। সেই রহস্যের সমাধান করতে যেতে হবে আমাকে সুদূর ইংল্যান্ডে। আমার পাশে কোন কাছের মানুষ নেই, আছেন এমন কিছু ব্যক্তি যাঁরা প্রত্যেকেই একেকটা “?" আমার কাছে। আমি আজ নিছকই তাদের হাতের পুতুল। আমি যা করতে চলেছি, জানি না সেটা ঠিক না ভুল, কেই বা আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে ?

আব্রাহামের সাথে কথায় কথায় সময় এগিয়ে চলে। ধীরেধীরে অন্ধকার আকাশটা ফিকে হতে শুরু করেছে, চারিদিকে বইছে ভোরের ঠান্ডা বাতাস। সমাধিক্ষেত্রের সুউচ্চ গাছের ডালগুলো থেকে পাখিরা উড়ে যাচ্ছে একে একে। পাঁচটা বাজতে যায়। "চলো ইন্দ্রনীল, এবার ওঠা যাক" আমার পিঠে হাত রেখে বলেন আব্রাহাম।

"এখানকার সিকিউরিটি গার্ডরা আবার কিছু বলবে না তো আমাদের দেখতে পেলে ?"

"এত চিন্তা করছ কেন? আমি তো আছি তোমার সাথে" মৃদু হেসে বলেন আব্রাহাম। আমি এগিয়ে চলি, ভেজানো লোহার দরজাটা যেন দমকা হাওয়ায় খুলে যায়, বাইরে বেরিয়ে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানান সেই মানুষটা। রাস্তাঘাট শুনশান। সি. আই. টি. রোড দিয়ে বেশ দ্রুতগতিতে দু-একটা ট্যাক্সি ছুটে যাচ্ছে বিক্ষিপ্ত ভাবে। একটা গলির মুখে দুধের দোকানের সামনে দুধের গাড়ি দাঁড়িয়ে। ফুটপাতের সস্তা চায়ের দোকানের লোকটা উনুনে আঁচ দিয়েছে। মৃদু কুয়াশার মধ্যে সেই ধোয়ায় ভারী হয়ে আছে সেখানটা। এক পুরানো দালানের বারান্দায় খবরের কাগজ বিক্রেতারা পত্রিকা ভাগ-যোগে ব্যস্ত। মূল সড়কে এক ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঘুমোচ্ছে, দু-একবার ডাকতে ঘুম ভাঙে মানুষটার "আপ কাহা যাওগি সাব ?"

"কসবা" আমাকে ইশারায় গাড়িতে উঠতে বলেন তিনি, অবশেষে গাড়ি থেকে জলের বোতলটা নিয়ে ফুটপাতে নেমে মুখে চোখে খানিকটা জল দিয়ে গাড়ির এক্সেলেটারে পা রাখে সেই হিন্দুস্থানি চালক। এবার আমার বাড়ি ফেরার পালা।

ফাঁকা রাস্তায় বাইপাস হয়ে বাসায় ফিরতে বিশেষ সময় লাগে না, সদর দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকেই আমি জানলা দরজা গুলো খুলে ফ্রেশ হয়ে এসে কড়া করে এক কাপ চা বানাই। ভোরের আলো সবে তখন ঘরের ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। আমার টেবিলের কাছে এসে চমকে উঠি, এগুলো কি ? আলো জ্বেলে ভালো করে পরীক্ষা করি জিনিসগুলো। আমার লন্ডনগামী ফ্লাইটের টিকিট, ভিসা ও নগদ কিছু ইউরো, আর ইংরেজিতে লেখা একটা চিঠি, পথনির্দেশ ইত্যাদি। তালাবন্ধ ঘরে এগুলো কে এখানে রেখে যেতে পারে।

।। গন্তব্য এবার লিজার্ট পয়েন্ট।।

একটা বিষয় এখন আমি বেশ বুঝে গেছি যে আমার জীবনটা কোনভাবেই আমার ইচ্ছেয় পরিচালিত হচ্ছে না, আমি যেন আজ পুতুলনাচের মঞ্চের এক পুতুল মাত্র। কিন্তু অন্তরীক্ষে থেকে কে এভাবে আমাকে নিয়ে খেলা করছে ? কি তার উদ্দেশ্য ? কিছুই আমি জানি না। আমার ইচ্ছে না থাকলেও যেতেই হবে আমাকে লিজার্ট পয়েন্টে, কিন্তু কে আমার জীবনটাকে নিয়ে এভাবে খেলা করছে ? তিনি কি আনি বনি না কিংস সলোমন নাকি দেবী Angitia ? দেবীর সেই মূর্তিটার দিকে চেয়ে কেঁদে

ফেলি "তুমি না দেবী? তবে কেন এভাবে আমার জীবনটাকে ছারখার করে দিতে চাইছো ? আমি কি ক্ষতি করেছি তোমার ?"... মনে মনে ঠিক এই কথাগুলোই হয়তো বলেছিলাম আমি। টিক টিক...টিক টিক..., দেওয়াল ঘড়ির আওয়াজ ছাড়া কিছু আর কানে আসে না আমার। আচমকাই যেন কেউ আমার মাথায় হাত রাখে, দমকা হাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় জানলাগুলো, নিভে যায় ঘরের আলোটা। লোড শেডিং হয়েছে মনে হয়, ঘরটা ভরে যায় মিষ্টি এক সুগন্ধে।

হঠাৎ মোবাইল বেজে ওঠে, নাম্বারটা দেখে চমকে উঠি আমি। মাইক ফোন করেছে। "বন্ধু, ৫ নভেম্বর আমাদের দেশে তুমি পা রাখতে চলেছ শুনলাম"... কি আশ্চর্য! আমার ফ্লাইটের টিকিট নভেম্বরের ৪ তারিখের। বিমান ছাড়বে রাত নটায়, মানে লন্ডন হিথরো এয়ারপোর্ট-এ আমার পৌছাবার সময় পরের দিন, কিন্তু এই তথ্য কে জানাল মাইক কে ?

আমি আর এই বিষয়ে আমার কৌতুহলটা মাইকের কাছে ভাঙতে চাই নি, "তুমি কি থাকবে ওই দিন বিমানবন্দরে ?" আমি জানতে চাই। "সিওর, সিওর, আমার বন্ধু আসছেন, অথচ আমি এয়ারপোর্টে থাকবো না, এ কি হয় নাকি?" মাইকের কথায় খানিকটা মনের জোর পাই, ভেবেছিলাম একজন কাছের মানুষ তবু আছে আমার সাথে, কিন্তু হতভাগ্য মাইকও যে ওদেরই একজন, সেটা বুঝেছিলাম কিছুদিন পর। আরেকটা বিষয়েও আমার খুব আশ্চর্য লাগত, তা হল মাইক প্রথম আলাপের পর থেকেই ধীরেধীরে আমার সাথে বাংলায় কথা বলতে শুরু করে। এত সুন্দর বাংলা কোথায় শিখল মাইক ? বাংলায় তো ও কখনো আসেই নি, তাহলে ? কি জানি হয়তো সাংবাদিকতার কারণেই তাকে বাংলা ভাষাটা শিখতে হয়েছে। কৌতূহলকে দূরে সরিয়ে রেখে নিজের মনকে এমনটাই বোঝাতাম আমি।

৪ নভেম্বর, অবশেষে বেলা দশটার কিছু পরে ট্যাক্সি নিয়ে বাইপাস হয়ে দমদম এয়ারপোর্টে উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাই আমি। কোলকাতাকে তোমরা আজ যেমনটা দেখছ ১৯৯৮ সালে ঠিক তেমনটা ছিল না। মেট্রোপলিটান বাইপাসের প্রথম পর্যায়ের কাজ ১৯৮২ সালে শেষ হলেও, সেই বাইপাস ছিল আকার আকৃতিতে অনেকটাই ছোট। গড়িয়া থেকে বাঘাযতীনের লেবেলক্রসিং পার হয়ে ধাপা হয়ে বর্তমান বিশ্ববাংলা সরণি অব্দি ছিল তার ব্যাপ্তি। সামান্য কিছু পণ্যবাহী গাড়ি ও প্রাইভেট কার ছাড়া বাস এ রাস্তায় বড় একটা চলত না, সন্ধ্যের পর

চুরি ছিনতাই এ পথে ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। রাস্তার দু পাশে দেড়, দুশো গজ বাদ দিয়ে জঙ্গল না হয় সবজির খেত। তখন না হয়েছে সায়েন্স সিটি, না হোটেল সোনার বাংলা না গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি। নকশাল জামানা পার হলেও বেলেঘাটা চুনাপট্টির দিকের রাস্তা ধরে এগোতে ভর দুপুরে যে কোন সাহসী মানুষের গা ছমছম করে উঠত। এ পথে বেলেঘাটা জোড়ামন্দিরের রাস্তার ঢুকে সি.আই.টি রোড হয়ে পৌঁছাতে হবে বিমানবন্দর। জীর্ণ খোয়া ওঠা রাস্তা দিয়েও ট্যাক্সি বেশ জোরেই এগোচ্ছিল। আর ঠিক তখনই...। ক্যাচ... বিকট শব্দ তুলে ও একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে যায় গাড়িটা। রাস্তার একপাশে পচা খাল, অন্যদিকে বহুদিনের বন্ধ, পরিত্যক্ত কিছু কলকারখানা। দূরে গাছের নিচে ভাঙাচোরা একটা লরির কঙ্কাল দাঁড়িয়ে... "কি হলো ?" আমি কাঁপাকাঁপা গলায় জানতে চাই।

“টায়ার পাংচার হুয়া" বর্ষীয়মান পাঞ্জাবি চালক চিন্তিত গলায় বলে।

"গাড়ি জলদি সে ঠিক কর লো, মেরে পাস যাদা সময় নেহি হ্যায়" পারলে আমিও তখন চালকের সাথে হাত লাগাই। কাছে ব্রিটিশ পাউন্ড ও ভারতীয় মুদ্রায় অর্থের পরিমাণ নেহাত খারাপ না। এই অবস্থায় ছিনতাইবাজের কবলে পড়লে তো কথাই নেই। আর ঠিক তখনই...! এক পা, এক পা করে দূর থেকে এগিয়ে আসছে সে। আমার সারা শরীর জুড়ে ভয়ের একটা স্রোত বইতে শুরু করে। কিন্তু বড্ড চেনা লাগছে মানুষটাকে, কোথায় যেন ওনাকে দেখেছি।

মানুষটা আরও খানিকটা কাছে আসার পর আমি ওনাকে চিনতে পারি, উনি আব্রাহাম। ইহুদি সমাধিস্থলে আমার দেখা সেই পুরোহিত। কিন্তু লাইম স্ট্রিটের এই নির্জন পথে উনি কি করেছেন? দূর থেকেই আমাকে দেখে হাত নাড়ে সে। আমি চিন্তিত মুখে তখন একবার ড্রাইভারের চাকা মেরামত, একবার ঘড়ির দিকে দেখছি। "আপনার যাত্রা শুভ হোক ইন্দ্রনীল বাবু।" আমি মৃদু হাসি ওনার কথায়।

"গাড়িটা আচমকা ফেঁসে গেল, এদিকে ফ্লাইটের সময় হয়ে আসছে।"

"চিন্তার কিছু নেই, তুমি সঠিক সময়ের এক ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবে।" আব্রাহাম এবার আমাকে তুমি করে সম্বোধন করতে শুরু করে। খুব অবাক লাগে আব্রাহামের কথাগুলো।

"আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?"

"ঈশ্বর যেদিকে নিয়ে যায়, ও হ্যাঁ, ভালোকথা, তোমার সাথে দেখা

হয়ে ভালোই হয়েছে, এই বাক্সটা ব্যাগে ভরে নাও, এটা কাছে থাকলে তোমার কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না" আব্রাহাম কাপড়ের ব্যাগে করে একটা বাক্স আমার হাতে দেয়।

"কিসের ক্ষতির কথা বলছেন আপনি ?" আমার হাত পা এবার এক অজানা আশংকায় কাঁপতে থাকে।

"কিছু না, যাও এবার ড্রাইভারের মনে হয় চাকা বদলানো হয়ে গেছে।" আব্রাহামের সাথে কথায় কথায় সামান্য কিছুটা এগিয়ে এসেছিলাম, পিছন ফিরে দেখছি সত্যি চালক ইশারায় আমাকে ডাকছেন।

"আপনি এদিকে কোথাও গেলে চলুন না, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।"

"না, তার দরকার হবে না, এখান থেকে ফুলবাগান সামান্য রাস্তা হেঁটেই চলে যাব। ভালো কথা আমার নাম্বার তো তোমার কাছে রইলো, কোন প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন করতে পার।" আমি সম্মতি জানিয়ে ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করি। বাইরে থেকে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানায় আব্রাহাম। সত্যি বড় অদ্ভুত মানুষটা, এই জনহীন পথে কোথায় যে উনি যাচ্ছেন কে জানে। আর লাইমস্ট্রিট থেকে ফুলবাগান কি একটুখানি রাস্তা নাকি। ভাবতে ভাবতে হয়তো একটু চোখ বুজে এসেছিল আমার, অবশেষে চালকের ডাকে সম্মতি ফেরে। দমদম বিমানবন্দরের সামনে তখন ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে।

মুম্বাই হয়ে হিথরো এয়ারপোর্টে পৌছালাম স্থানীয় সময় সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ। লন্ডন থেকে ভারতের স্ট্যান্ডার্ড টাইমের তফাৎ চার ঘন্টা, সে কারণে আমাকে এই পথ অতিক্রম করতে ঠিক যতটা সময় লেগেছে, তার চেয়ে এখানকার স্থানীয় সময় অনেকটা কম। সম্পূর্ন অজানা লক্ষে আমি এতটা পথ পাড়ি দিলাম, কোথায় যাচ্ছি তা অনিশ্চিত, সেখানে কি ধরণের আপ্যায়ণ পাব জানি না, তবু ছুটে চলেছি, আমার ক্যারিয়ার, আমার সময় সব নষ্ট করে। নাকি কেউ আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে? কিন্তু কি লাভ তার? আমি তো আজ নিঃস্ব পৃথিবীতে। যার মা নেই, তার কে আছে? আজ বড় মায়ের কথা মনে পড়ছে। আমার ইতালিতে যাবার আগে মা আমাকে বারেবারে বারণ করেছিল। রাজি হই নি। আমি সেখান থেকে এক করাল অভিশাপ সাথে নিয়ে ফিরলাম। লিজার্ট পয়েন্টে পৌছাবার জন্য Newquay Cornwall Airport গামী বিমান এখান থেকে ছাড়বে স্থানীয় সময় রাত দুটোয়। এক ঘন্টার কিছু বেশি সময়ের যাত্রাপথ। সেখান থেকে পৌঁছাতে হবে লিজার্ট পয়েন্ট, কিভাবে পৌঁছাব তা ঈশ্বর জানেন। প্রতি শনিবারের মতো আজও আমার উপবাস থাকায় পানীয় জল বাদে বিমানের সব খাবারই যা আমি প্রত্যাখ্যান

করেছি। এখন সারা পেট জুড়ে আগুন জ্বলছে আমার। বিমানবন্দরে আমার উল্টো দিকের সিটে বসে এক ভারতীয় পরিবার। সম্ভবত পর্যটক, কি আনন্দ করে নৈশভোজ একসাথে সারছে ওঁরা। খুব হিংসে হচ্ছিল আমার বয়সী ছেলেটাকে দেখে। ও কি সুন্দর বাবা-মায়ের সাথে এ দেশে বেড়াতে এসেছে। আমার মতো অসহায় অভাগা কে আছে।

এসব কিছুই ভাবছিলাম হয়তো, হঠাৎ মোবাইলটা বেজে ওঠে। হ্যাঁ, আমাদের কলকাতায় সবেমাত্র তিনবছর মোবাইল পরিষেবা চালু হলেও ইউরোপে এখন মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই উন্নত। ইতালির মতো এদেশে পা রাখার পর আমার সম্মতিতে মোবাইলে অটো রোমিং পরিষেবা চালু হয়ে গেছে এখানেও। ফোনটা ধরেই আমি চমকে উঠি। উল্টো দিকে মাইকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, হ্যাঁ, কলকাতা থেকে মাইককে জানিয়েছিলাম আমি আজ আসছি, কিন্তু এত নিখুঁত সময়ে মাইক কি করে কল করছে আমাকে, তার মানে মাইক কি কোনভাবে আমার গতিবিধির ওপর নজর রেখে চলেছে ?

“হ্যালো মাইক”

“ওয়েলকাম টু ইউনাইটেড কিংডম, প্লিজ ডোন্ট বি টেন্সড, আই নো দ্যাট ইউ ফিল হাংরি নাও, You shuld go to right way and come out from airport right now, and please have your dinner from king's palace hotel. Then you will come to airport for your next flight to Newquay Cornwall Airport." আমি যন্ত্রের মতো মাইকের নির্দেশ পালন করি। অবশেষে ভোর তিনটে বেজে দশ মিনিটে আমি Newquay বিমানবন্দরে পা রাখি। এত রাতেও বিমানবন্দরের লাউঞ্জে মাইক অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। ও আমাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে সবার আগে জানতে চায় যে যাত্রাপথে আমার কোন সমস্যা হয়েছে কিনা। তারপর ওর ইশারায় আমি বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আসি। আমাকে অপ্রস্তুত করে তখন আমার অধিকাংশ লাগেজ বয়ে নিয়ে চলেছে মাইক। বিমানবন্দরের বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে দুধসাদা কনটেসা। মাইক আমার লাগেজ পিছনে রেখে আমাকে চালকের বিপরীত দিকের দরজা খুলে দেয়। আমি গাড়িতে ওঠার পর স্টিয়ারিং এ বসে সে এক্সেলেটারে পা রাখে। কুয়াশা মাখা রাস্তার ফগ লাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে চলে মাইক। আমি খুব ক্লান্ত এখন এতখানি বিমানযাত্রার পর, তবু বড় রহস্যময়

লাগে এই যাত্রা। হে ঈশ্বর তুমি বলে দাও, এই যাত্রাপথে কখন শেষ হবে।

Newquay থেকে A 3075 হাইরোড এঁকেবেঁকে চলে গেছে Lizard Point এর দিকে। Newquay স্থানটা বিশেষ বড় নয়। এতরাতে ছোট্ট এ শহরটা ঘুমোচ্ছে হালকা কুয়াশার অন্তরালে। ল্যাম্প পোস্টের আলোগুলো জ্বললেও সেগুলোর দূরত্ব অনেকটাই। ব্রিটেনে বহুদিন ধরে এই রেওয়াজ চালু আছে ছোটোখাটো শহরগুলোতে, রাত বাড়ার সাথে সাথে কিছুকিছু বাতিস্তম্ভের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয় এতে একদিকে যেমন বিদ্যুতের সাশ্রয় হয়, তেমনই বৃক্ষ ও বৃক্ষবাসী প্রাণীকূল রাতের অন্ধকারে একটু হাফ ছেড়ে বাঁচে। গাড়ি ধীরেধীরে আঁকাবাঁকা পথে শহরের প্রাণকেন্দ্র পার হয়ে যায়। Newquay Zoo র পর শহরটাকে বামপাশে রেখে গাড়ি এবার এগিয়ে চলে। বন্ধ কাঁচের ভিতর থেকেও যেন তিরের ফলার মতো ঠান্ডা ঢুকছে গাড়ির ভিতরে। আমার বন্ধু তখন স্টিয়ারিংটাকে শক্ত করে চেপে ধরে গাড়ির গতি বাড়াচ্ছে একটু একটু করে। ক্লান্তিতে আমার চোখ আর পারমিট করছে না, সিট বেল্টটাকে শক্ত করে আটকে বসি আমি। মাঝেমধ্যে চোখদুটো লেগে এলেও গাড়ির গতিতে ঘুমটা জমাট বাঁধছে না। সেই সাথে নতুন দেশটাকে মায়াবী রাতে দেখার একটা উৎসাহ তো আছেই। শহর ছেড়ে আসার পর কুয়াশা যেন ক্রমশই গাঢ় হচ্ছে চারিদিকে। ফগ লাইটের আলোর চারপাশেও যেন সৌখিন শিল্পীর জলরঙে রাঙানো ক্যানভাসের মতো কুয়াশারা শিল্পসুষমা সৃষ্টি করে চলেছে, সেই সাথে লং এ দেওয়া হেড লাইটের রেখাদুটোকেও প্রায় গিলে ফেলেছে রাক্ষুসে ধোঁয়াটে পরিবেশ। রাস্তার দুই পাশে সরলবর্গীয় গাছের সারি। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া মৃদু আলোতে মাঝেমাঝে তার কান্ডের নিম্নাংশটুকু শুধু নজরে আসে। গাছের উপরিভাগ হারিয়ে গেছে কোন এক দিগন্তবিস্তৃত মেঘের রাজ্যে, হেডলাইট যার হদিস খুঁজে পায় না। চোখ বুজে ফেলেছিলাম মনে হয় আবার ক্ষনিকের জন্য। আচমকাই মাইকের ফ্যাসফ্যাসে গলার আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়।

"Indranil, wake up, wake up please, we are in a terrible danger now."

আমি চমকে গিয়ে মাইকের দিকে তাকাই। মাইকের এই এক রোগ, টেনশন করলেই ওর গলার স্বরটা কেমন যেন ফ্যাসফ্যাসে শোনায়। সে আওয়াজের সাথে পাহাড়ি নেকড়ের ডাকের হয়তো খানিকটা মিল আছে, কিন্তু গাড়ি চালাতে চালাতে মাইক কেন এখন করছে? উইন্ড স্ক্রিনের উইপারটা চলছে বেশ জোরকদমে। তবু বাইরেটা একেবারে ঝাপসা।

ঘড়িতে এখন চারটে পয়ত্রিশ, চোখ রগড়ে আরেকবার বাইরের দিকে তাকাই আমি। কিন্তু নজরে কিছু পরে না। খানিকটা আবাকই লাগে আমার, মাইক কি দেখে এতোটা ভয় পেতে পারে।

“Please tell me what happened” আমি জানতে চাই। এই রহস্যময় আলো-আঁধারী রাস্তায় আমার কৌতুহল ক্রমশ বেড়েই চলেছে, যাকে নিয়ন্ত্রণে আনা আমার পক্ষে অসম্ভব এক রকম।

"মাইক, তুমি কি কোনো কারণে শারীরিক অসুস্থতা বোধ করছ ?”

গাড়ি চালাতে চালাতেই মাইক একবার আমার দিকে এক ঝলক তাকায়, কি দেখছি আমি। অন্ধকার গাড়ির ভিতরে মাইকের চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। কোনো মানুষের চোখ জোড়া এরকম হয় নাকি ? আমার মনে পড়ে যায় পিনোলোজির 'Law and Superstation' চ্যাপ্টারের একটা প্যারাগ্রাফ। পরীক্ষায় কমন ছিল বলে জায়গাটা জলের মত মুখস্থ করে ফেলেছিলাম, যা এখনো আমার সেভাবেই মুখস্থ আছে, 'The glow of red human eyes is a little like the glow of the moon. It's the reflected light of a far greater light source. The flash of a camera travels through the pupil and hits the back of the eye – the retina. The retina reflects the light back towards the camera, but it does so just a little differently than it came in. Like most of the insides of our bodies, the retina is an icky red mess, with blood vessels criss-crossing it. Those blood vessels color the light that shines back red. We literally dye the light red with our blood.' তবে কি এটা সত্যি স্বাভাবিক একটা বিষয় ? তাহলে এরকম অদ্ভুত একটা আওয়াজ কেন করছে মাইক ? কোনরকম টেনশন ফিল না করলে তো মাইককে এই ধরণের আচরণ করতে আমি কখনো দেখি নি।

"Indra--a--a--a! look at the front”

ক্যা--চ! দু তিনটে হালকা ধাক্কা খেয়ে অবশেষে দাঁড়িয়ে যায় গাড়িটা। ফোর্থ গিয়ারে প্রায় ষাট মাইল বেগে চলা গাড়িটাকে অপরিসীম দক্ষতায় দুশো মিটারের মধ্যে প্রায় দাঁড় করিয়ে দেয় মাইক। অত্যন্ত দুর্বল একটা ছোট নদীর ব্রিজ এটা। যার একদিকের রেলিং কোন কারণে ভেঙে পড়েছে। সেতুতে ওঠার মুখেও বেশ খানিকটা জায়গা ভাঙা। বোধহয় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে এখানে, তাই মেরামত এখনো শুরু হয় নি। সামনে একটা বোর্ড, কুয়াশার মধ্যে যেটা খানিক

দূর থেকে কারোর নজরে পড়ার কথা নয়। 'Poor bridge, drive slow. speed limit less than 10 miles per hour. Large vehicles and goods carriage are completely prohibited' তবে এটাই কি মাইকের ভয়ের কারণ ছিল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এতবড় একটা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে।

ব্রিজটা খুব ধীরগতিতে পার হয়ে যাই আমরা। ওপারে গিয়ে ছোট্ট একটা স্পিড ব্রেকার পার হয়ে সবে ক্ল্যাচে পা রেখে মাইক গিয়ারটা তিন নম্বরে টেনে এক্সেলেটারে পা ছুঁইয়েছে ঠিক তখনই কি এটা ! উইন্ড স্ক্রিনের বাইরে গাড়ির ইঞ্জিনের উপর বিশাল সেই প্রাণীটা এসে ডানা ঝাপটাতে থাকে। মাইক গাড়ির কাঁচটা ঈষৎ সরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন দেখতে চায়, কি দেখছে মাইক এভাবে ? আজ তো অমাবস্যা, তার মধ্যে ঝাপসা আকাশে হয়তো দু-চারটে তারা খুব ভালো করে তাকালে দেখা যায়। এর মধ্যে কি খুঁজতে চাইছে মাইক,

"আমি এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম" সেরকম ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে মাইক। কি এটা ?

মাইককে এতখানি বিচলিত দেখে আমার বুকের ভিতরটাও কেঁপে ওঠে। মাইক স্টিয়ারিং ডানদিক বাঁদিক করে প্রাণীটাকে কাটিয়ে এগোতে চায়, কিন্তু বিশাল ডানায় ভর করে সেই ভয়ানক প্রানীটা বারেবারে আড়াল করে ফেলছে গাড়ির সামনেটা। এভাবে গাড়ি চালানো যায় নাকি।

“ইন্দ্র, এখন সময় কত শো করছে ?” মাইক এতটাই বিপর্যস্থ প্রাণীটাকে নিয়ে যে স্পিডোমিটারের একপাশে ঘড়িটা দেখারও সুযোগ নেই ওর।

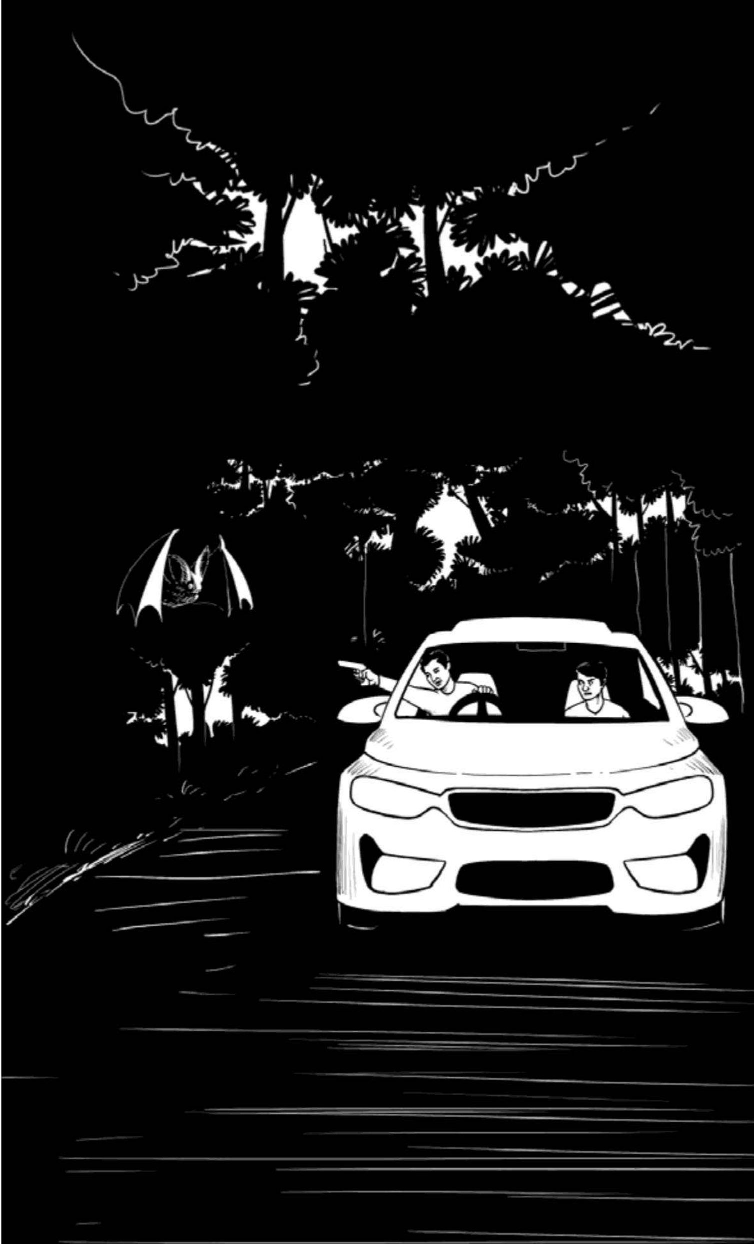
“চারটে পঞ্চাশ”।

“মানে এখনো পঁচিশ মিনিট" নিজের মনেই বলে মাইক।

“কিসের ?"

"নাহ, কিছু না"

আচমকাই মাইক একটা অদ্ভুত কান্ড করে বসে কোমরের সিক্রেট পকেট থেকে ওর পিস্তলটা অন্ধকারের মধ্যেই বের করে সে। Beretta Px4 Storm মডেলের পিস্তল এটা। এর মধ্যে ছয় রাউন্ড গুলি ভরা যায়। ওজনে হালকা হলেও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে এর জুড়ি নেই। ইতালিতে হোটেল রুমে বসে ওটার টেকনোলজি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে মাইক। মাইকের বাম হাতটা গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে, ডান হাতটা গাড়ির জানলা দিয়ে খানিকটা বের করে ফায়ার করে সে। সাইলেন্সার



ডান হাতটা গাড়ির জানলা দিয়ে খানিকটা বের করে ফায়ার করে মাইক।

লাগানো পিস্তল, খুব একটা আওয়াজ না হলেও মাইকের ডান হাতটা ফায়ারিংয়ের কারণে ঈষৎ কেঁপে ওঠে। এর মধ্যেই নিখুত ভাবে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে ও। ভেবেছিলাম নিশাচর শয়তানটা হয়তো গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছে রাস্তায়, কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। ওটা আগের মতোই আবার উইন্ড স্ক্রিনের সামনে এসে ডানা ঝাপটাচ্ছে। পুনরায় নিখুঁত নিশানায় আবার ফায়ার করে মাইক। কিন্তু... হঠাৎই আর্তনাদ করে ওঠে সে, ক্ল্যাচে পা রেখে গিয়ার টেনে ব্রেক কষে গাড়ির গতি অনেকটাই কমিয়ে ফেলতে হয় মাইককে।

"কি হলো?" আমি মোবাইলের টর্চটা জ্বালি। মাইকের হাতে গভীর আঁচড়ের ক্ষত। সেখান থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। "মা--ই-- ক" চেচিয়ে উঠি আমি।

"শয়তানটা আমার পিস্তলটা কেড়ে নিয়েছে" চিন্তিত ভাবে সে বলে।

মাইকের সারাটা হাত এখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কনুই বেয়ে টপ টপ করে রক্তের ফোটা গড়িয়ে পরছে ওর প্যান্ট এ। তার মধ্যেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে গাড়ি চালিয়ে চলেছে ও।

কিন্তু এ কি ! আচমকাই ঝনঝন শব্দে চমকে উঠি আমরা দুজনেই। উইন্ড স্ক্রিনের কাঁচটা চুরচুর করে ভেঙে পড়েছে। মাইক এবার গাড়ি থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়। মোবাইলের আলো ফেলে চমকে উঠি আমি, প্রানীটা এক বিশাল আকৃতির বাদুড়। আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে ওর চোখ দুটো, মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ছুঁচালো একজোড়া দাঁত। এবার আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, মাইক নয়, ওর মূল লক্ষ আমিই। আমার জীবনের শেষ সময় হয়তো উপস্থিত, আমি আতঙ্কে চোখ বুজে ফেলেছি। প্রাণীটা হয়তো নিমেষেই আমার শরীরটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে, আর ঠিক তখন ই...!

'ফোঁস ফোঁস' গাড়ির পিছন থেকে আমাদের দুজনের মাঝখান দিয়ে বিশাল আকৃতির একটা সাপ এসে পেঁচিয়ে ধরেছে বাদুড়টাকে। চটজলদি আমরা দুজনেই দুদিকের দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। নিরাপদ দুরত্বে দাঁড়িয়ে মোবাইলের আলোয় আমাদের সারা শরীরের লোম খাঁড়া হয়ে ওঠে। ভাইপার ও বাদুড়ের সেই সাংঘাতিক লড়াই দেখে। অবশেষে একসময় নিশ্চল হয়ে পড়ে সেই ভয়ানক বাদুড়টা। ভাইপারটা এঁকেবেঁকে মিলিয়ে যায় রাস্তার এক পাশে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে আমাদের। আমার হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে ঘড়ির দিকে

একবার লক্ষ করে মাইক।

“পাঁচটা পঁচিশ, মানে অমাবস্যা কেটে গেছে, আমাদের আর কোন ভয় নেই চল এবার গাড়িতে ওঠা যাক" মাইক আমার পিঠে হাত রেখে মৃদু গলায় বলে।

"কিন্তু তোমার হাত দিয়ে এখনো রক্ত ঝরছে, এভাবে তুমি গাড়ি চালাবে কি করে ?"

"ওসব নিয়ে তোমার না ভাবলেও চলবে" আমার কথায় মৃদু হাসে মাইক।

আমি ওঠার পর আবার গাড়িতে স্টার্ট দেয় সে। ভেঙে পড়া উইন্ড স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে হু হু করে ঠান্ডা ঢুকছে, এভাবে বেশি জোরে গাড়ি চালানো অসম্ভব। কুয়াশার তান্ডবের মধ্যেও আকাশ ধীরেধীরে খানিকটা ফর্সা হয়ে আসছে। কিছুটা এগিয়ে এসে গাড়ি মেরামতের একটা দোকানের কাছে এসে দাঁড়িয়ে যায় মাইক। কমবেশি আধ ঘণ্টার মধ্যেই উইন্ড স্ক্রিন বদল হয়ে যায়। গাড়ির ভিতরে ফ্লাস্ক বোঝাই কফি মাইক আমাদের জন্য নিয়ে এসেছিল। ঠান্ডার মধ্যে কফি খেয়ে সিগেরেট ধরাবার পর আমরা নিজেদের ফিরে পাই খানিকটা হলেও, এবার আমাদের গন্তব্যের পথে এগোবার পালা।

গাড়ি লিজার্ট পয়েন্ট-এর দিকে যত এগোচ্ছে ততই আকাশে পরিষ্কার হচ্ছে ভোরের লাল সূর্যটা। স্থানটা আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে হাওয়ায় সমুদ্রের নোনা হওয়ায় এখানে কুয়াশার তান্ডব খানিকটা কম। এক কথায় জায়গাটার সৌন্দর্য বলে বোঝানো সম্ভব নয়। স্থানটা মূলত পর্যটন কেন্দ্র হলেও জনবসতি এখানে খুবই কম, আর চারিদিকে সবুজের সমারোহ। দিগন্ত বিস্তৃত ফার্মহাউস গুলো দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। এখানকার পুরানো পোস্ট অফিসের কাছে গাড়ি থামিয়ে মাইক আমার গন্তব্যের ঠিকানাটা দেখতে চায়। কাগজটার দিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে রাস্তার ধারে প্রাতঃভ্রমণে বেড়ানো কিছু মানুষের কাছে ঠিকানাটা জানতে চায় মাইক। তারপর ইশারায় আমাকে গাড়ি থেকে নামতে বলে পুরাতন পোস্ট অফিসের পাশে গাড়ি পার্ক করে পদব্রজে খানিকটা পথ এগিয়ে আসি আমরা। মূল রাস্তাটা খানিকটা এগিয়ে বাম দিকে সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে গেছে, ডানদিকে বিশাল এক ফার্ম হাউসে পাশ দিয়ে Chypons Road এঁকেবেঁকে চলে গেছে সব্জিক্ষেত গুলোকে দুই পাশে রেখে। খানিক দূর দিয়ে এই পথ

আবার এসে মিলেছে মূল সড়কপথে। ক্ষেতের টাটকা সবজি এই পথ ধরেই সকালে পৌঁছে যায় Newquay শহর হয়ে দেশের নানান স্থানে।

Chypons Road দিয়ে খানিক এগোবার পর সেখান থেকে ডানদিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। মাইকের সাথে আমি সেই পথে হাঁটতে শুরু করি। রাস্তাটা ঈষৎ সংকীর্ণই বলা যায়, তার একপাশে ঘন সরলবর্গীয় বৃক্ষের সারি অপর পাশে অগভীর এক ক্যানেল। মাইকের কাছে জানতে পারি সমুদ্রের লোনা জলকে কৃত্রিম উপায়ে মিষ্টি জলে পরিণত করে চাষের কাজে এই ক্যানেলের মাধ্যমে প্রবাহিত করা হয়। সর্পিল এই ক্যানেল পৌঁছে গেছে সমুদ্রের ধার বরাবর। সেখানে নুন, বরফ ও প্যাকিং বাক্স তৈরির নানান ছোটবড় কারখানা। ওই স্থানটা নাকি বহু প্রাচীন এবং একসময় ইংলন্ডের সবচাইতে বড় বন্দর শহর ছিল। ক্যানেলের আরেক পাশে এক বিশালায়তন ফার্ম হাউসে নানা ধরনের ফল ও ফুলের গাছের মনমুগ্ধকর শোভা। মাইকের কাছে আরও জানতে পারি নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ও লিজার্ট পাথরের গুনে এখানে প্রায় ছয়শোর বেশি প্রজাতির ফুলের চাষ হয়, যা সেদেশের প্রায় এক চতুর্থাংশের কাছাকাছি। খানিকটা দূরে গিয়ে আমরা ছোট্ট একটা সাঁকো পার হয়ে ক্যানেলের অপর পাশে পৌঁছাই। দিগন্তবিস্তৃত দুটো ফ্লাওয়ার'স গার্ডেনের মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা পথে আরও খানিকটা পদব্রজে এগিয়ে এলে গাছপালায় ঢাকা সেই ঐতিহাসিক কটেজ। "তুমি তোমার গন্তব্যে পৌঁছে গেছো ব্রাদার, এইবার আমার ছুটি" মৃদু হেসে বলে মাইক।

"মানে ?"

"ডোন্ট বি টেন্সড ডিয়ার, তুমি যেই কাজে এসেছ, সেই কাজটা সেরে নাও, আমি ততক্ষনে সি বিচের নিয়ারেস্ট ওয়াইন শপে আমার অপেক্ষায় থাকা Guinness-র কয়েকটা বিয়ার ক্যানের সাথে আমার সুখ দুঃখ ভাগ করে নিই।"

"ছেলেমানুষি করো না মাইক, এই অচেনা জায়গায় আবার যদি কোনরকম বিপদে পড়তে হয়, তাহলে...।"

"নাও ইউ আর টোটালি আউট অফ ডেঞ্জার" আবার প্রানখোলা হাসিতে ফেটে পড়ে মাইক।

সত্যি এত কাছের বন্ধুটিকে মাঝেমাঝে আমার বড্ড রহস্যময় বলে মনে হয়। কিছুতেই ভেবে পাই না যে কি এমন কথা আমি বললাম

যার জন্য মাইক এভাবে হাসতে শুরু করলো, আরও কিছু আমি হয়তো বলতে যাচ্ছিলাম, আর ঠিক তখন ই... ! তখনই কটেজের কাঠের দরজাটা খোলার মৃদু আওয়াজ আমার কানে আসে, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

"হু আর ইউ মাই বয়েস ?"

"I am Maik and he is Indranil, One of my very close friend, who came from India to meet you"

"O God, I am very happy to meet you" আমার পরিচয় পেয়ে বৃদ্ধ অতিশয় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন আমাদের আপ্যায়নের জন্য।

।। গ্রাহাম ডিলির কথাগুলো।।

কটেজটা সম্পূর্ণ কাঠের তৈরী, কিন্তু অত্যন্ত পরিস্কার এবং সেই সাথেও বিলাসবহুল ও বলা যায়। কটেজের ভিতর থেকে এক নাগাড়ে কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। আমাদের ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে ভদ্রলোক মিনিট দুয়েক ঘরের ভিতরে যান। সম্ভবত তাঁর পোষা কুকুরটিকে ভিতরের ঘরে আটকে রেখে তিনি আমাদের সসম্মানে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসান, তারপর একটা ফ্লাস্কের থেকে তিনি ধূমায়িত চা তিনটে পেয়ালাতে ঢালেন। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছি ঘটনা পরম্পরায়। বারেবারে শুধু মনে হতে থাকে সব ঘটনাগুলোই যেন পূর্ব নির্ধারিত এবং আমার নিয়তির সাথে গভীর ভাবে সংযুক্ত। কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? তবু মানুষটাকে অবাক চোখে আমি দেখতে থাকি। বড় অদ্ভুত লাগে ওনাকেও। ভদ্রলোকের সারাটা মাথা ঢেকে রেখেছে একটা জাদরেল হ্যাট। ফর্সা মুখমন্ডলে একরাশ সাদা দাড়ি। চোখে রোলগোল্ডের সাবেকি গোল ফ্রেমের চশমা, কপালে ও চোখের কোনে চামড়া বয়েসের ভারে খানিকটা কুঞ্চিত, পরনে চকলেট কালারের দামি ড্রেসিং গাউন। তাঁর নীলচে চোখগুলোর মধ্যে যেন অপরিসীম এক মমতার ছোঁয়া, যাকে ভালো না বেসে পারা যায় না। "আপনি কি এখানে একাই থাকেন ?" চা খেতে খেতে আমি নীরবতা ভঙ্গ করি।

"Last thirty years I am alone. But now I am very happy because today I will take my lunch with two guests" হালকা হেসে জবাব দেন উনি।

“I’m sorry Mr Graham Dilly, because I can not take part in the lunch with you due to something personal” মাইকের কথায় আমি আবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি মানুষটার প্রতি। উনি-ই তাহলে গ্রাহাম ডিলি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Gerald Lankester Harding এর কনিষ্ঠ পুত্র। আব্রাহামের কাছে শুনেছিলাম উনি একজন মস্তবড় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। Kellingley Collieries দুর্ঘটনার কবলে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারকার্যের মাস্টারমাইন্ড ছিলেন গ্রাহাম সাহেব। ভদ্রলোক মাইককে কিছু একটা বলতে চান, কিন্তু মাইক আমার দিকে একবার ভিকট্রি সাইন শো করে ততক্ষনে উঠান পেরিয়ে রাস্তার পা রেখেছে। আবাক হয়ে ভাবি মাইকের এই ভিকট্রি সাইনের মানে কি হতে পারে? মাইককে বিদায় জানিয়ে আমরা কটেজের বারান্দায় এসে বসি।

“Please tell me what do you want to know” মৃদু হেসে গ্রাহাম সাহেব চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখেন। সরাসরি ওনার প্রশ্নটা শুনে আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি ক্ষনিকের জন্য। ঠিক এভাবে উনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চান সেটা আমি ভাবি নি।

"Please give me few information about Suleimani treasure, actually I am very much interested to know that” অবশেষে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্থভাবেই কথাগুলো বলি আমি।

কুকুরের ডাক থেমে গেছে বহুক্ষন, কটেজের সামনের গাছের ছায়ায় ঢাকা উঠান থেকে অজানা কোন পাখির আওয়াজ ভেসে আসছে একনাগাড়ে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের সোনালী আলো এসে পড়েছে গ্রাহাম সাহেবের চোখেমুখে। ঠান্ডা শিরশিরে বাতাসের সাথে অজানা কোন ফুলের মিষ্টি একটা গন্ধ মনটা ছুঁয়ে যায়। গ্রাহাম সাহেব কিছুক্ষণ নীরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। এক অব্যক্ত কৌতূহল নিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন তখন আমাকে। কিন্তু তাঁর সেই দৃষ্টির মধ্যে কোন রাগ বা ক্ষোভ নেই বরং আছে এক অপার পরিতৃপ্তি, কিন্তু কিসের সেই তৃপ্তি ? কেন ইতালি থেকে ফেরার সময় বিমানবন্দরে মাইক আমার হাত দুটো ধরে বলেছিলো যে আমার মতো বন্ধু পাওয়া ওর কাছে ঈশ্বরের এক অভাবনীয় উপহার হয়ে থাকবে-- এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাকে আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

"Suleimani treasury is a vast treasure hidden in the world, but why do you want to know about it? Those who went in search of that treasure with greedfull nature, were in danger"

"I do not want to ask you this because of any greed" গ্রাহাম সাহেবের কথায় প্রতিবাদ জানিয়ে আমি বলি, "then why do you want to know about that cursed treasure?"

এরপর আমি কোনকিছু গোপন না করে সব ইতিহাস খুলে বলি গ্রাহাম সাহেবকে। তিনি দুচোখ বুজে মন দিয়ে শুনে যান আমার কথাগুলো। এরমধ্যে বেশ কয়েকবার গ্রাহাম সাহেবের মোবাইলটা বেজে উঠলে তিনি অর্ধনিমীলিত চোখে অবলীলায় কল গুলো কেটে দিয়ে আমার কথা শুনতে থাকেন, অবশেষে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে সবকিছু ওনাকে বলে আমি হালকা হই।

"I believe that only you can do to free the world from the curse of the goddess Angitia. You get full support from me" গ্রাহাম সাহেব আমার কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বলেন। তাঁর অপরিসীম ব্যক্তিত্ব, স্নেহ ও বন্ধুত্বপূর্ণ বাচনভঙ্গি আমাকে প্রেরণা যোগায় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত একটা কাজের ঝুঁকি মাথায় নিতে।
"Yes Sir, I believe that I will be successful in this work" মাথা উঁচু করে ওনার চোখে চোখ রেখে আমি বলি।

গ্রাহাম সাহেব আমাকে জানান যে এই কাজে এগোতে গেলে সবার আগে আমাকে লোভ, লালসা, মিথ্যাচার, যৌনতা ও মদ্যপান সম্পূর্নরূপে বিসর্জন দিতে হবে, কারন দেবী Angitia এই জিনিসগুলোর ঘোরতর বিরোধী। আমি সম্মতি জানাই ওনার কথায়। সেই সাথে বলি এই বিষয়গুলো আমি ইতিপূর্বে শুনেছি এবং আমি সেই মতো মনস্থির করেই এই পথে পা বাড়িয়েছি।

"তুমি এই কথাগুলো আগে শুনেছ ! কিন্তু কার কাছে ?" আগের মতোই আভিজাত্যপূর্ণ ইংরেজিতে কথাগুলো বলতে বলতে তীব্র কৌতূহলে আচমকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান তিনি।

"এক ইহুদি পূজারির থেকে" শান্ত স্বরে আমি জবাব দিই।

আমার কথা শুনে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করে দুহাত ভাঁজ করে বুকের মাঝে রেখে বোধকরি কিছুক্ষন পরম শক্তিমানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন।

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকি, এক অজ্ঞাত কুলশীলহীন ইহুদি পুরোহিতের কথায় তিনি কি এমন পেলেন যে কারণে এভাবে প্রার্থনা শুরু করলেন, নাকি এখন তাঁর প্রার্থনা করার নির্ধারিত সময়? হয়তো এই ঘটনাটার সাথে সমাধিক্ষেত্রের সেই পূজারির কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য ধীরেধীরে আমি জেনেছিলাম ঘটনাগুলো প্রতিটাই পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই কথায় আমি পরে আসছি।

"সুলেমানি গুপ্তধনের বিষয়ে জানতে গেলে সবার আগে তোমাকে জানতে হবে ডেড সি র সংলগ্ন খিরবেত কুমরানের তৃতীয় গুহা থেকে উদ্ধার হওয়া সেই ঐতিহাসিক কপার স্ক্রল (তাম্র ফলক) সম্বন্ধে" খানিক বাদে নীরবতা ভঙ্গ করে বলেন মিস্টার গ্রাহাম।

"কপার স্ক্রল !"

"ইয়েস মাই সান, সেখানে আবিস্কৃত অন্যান্য স্ক্রলগুলো প্যাপিরাসে লেখা হলেও ওই নিদৃষ্ট স্ক্রলটি লেখা হয়েছে এক সংকর ধাতুর ফলকে, যেই ফলকটি তামার সাথে এক শতাংশ টিন দ্বারা নির্মিত। প্রত্নতাত্বিক ইতিহাসে যা জানা যায় তা হলো এক বেদুঈন গোষ্ঠী ১৯৫২ সালের ১৪ ই মার্চ আরও বহু স্ক্রলের সাথে ওই কপার স্ক্রলের সন্ধান পায়। এর পর সেই রহস্যময় স্ক্রলটিকে পাঠোদ্ধারের জন্য জর্ডনে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু রোল করা এই তাম্রফলকটি কে তাঁরা খুলতে ব্যর্থ হন" আবার কিছুক্ষন নীরব থাকেন তিনি। তাঁর এই নীরবতা আমার কৌতূহলকে যেন চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে থাকে।

"তারপর ?"

"তদানীন্তন জর্ডন সরকার তখন ওই স্ক্রলটিকে এ দেশের Manchester University's College of Technology তে পাঠান পাঠোদ্ধার করার জন্য এবং সেই কাজের দায়িত্ব ছিল আমার পিতা Gerald Lankester Harding এর উপর। কারণ তিনি ছিলেন জর্ডনের Director of the Department of Antiquities. সেই রহস্যময় কপার স্ক্রলের রোলটিকে নানা ভাবে খোলার চেষ্টা করেও উনি সফল হন নি, এর পর আমার বাবা স্ক্রলটিকে ২৩টা স্ট্রিপে সাকশনাইস করেন এই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন দুজন, একজন হলেন বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ও ডেডসি স্ক্রল বিশেষজ্ঞ John Marco Allegro এবং Professor H. Wright Baker। এই স্ক্রলটিকে প্রথম ট্রান্সক্রাইবের কাজে হাত দেন Józef Milik। তিনি এই সত্যিটা উপলব্ধি করেন যে its a product of the Essenes।

“Essenes কি ?" আমি জানতে চাই।

"Essenes হলো এক প্রাচীন ইহুদি মন্দির, যা খিস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে প্রথম শতকের মধ্যে সেখানে অবস্থিত ছিল। কিন্তু মজার কথা হলো অন্যান্য স্ক্রলগুলোর মতো এই স্ক্রলটি কিন্তু হিব্রু ভাষায় লেখা হয় নি বরং প্রাচীন মিশান ভাষার সাথে এই স্ক্রলের ভাষার অনেক বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায়।”

গ্রাহাম সাহেবের এই ধরণের ইতিহাসের চর্বিতচর্বনে হয়তো খানিকটা বিরক্তই হচ্ছিলাম সেই সাথে বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে কপার স্ক্রলের এই ইতিহাস শুনে আমার কি লাভ। "তাহলে এবার আপনি বলুন কপার স্ক্রলের এই ইতিহাস আমাকে এই বিষয়ে কিভাবে সাহায্য করতে পারে ?” মা চলে যাবার পর ইদানিং আমার সব বিষয়ে অতি অল্পেতেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে, কিছুদিন আগে হলেও হয়তো একজন আদর্শ আইনজীবীর মতো আমি সবার আগে মন দিয়ে শুনতাম ওনার কথাগুলো।

“সে কথাগুলোই তো আমি তোমাকে বলতে চাই ইয়ং ম্যান, কারণ এর মাঝে আমাদের বংশের এক অভিশপ্ত ইতিহাস জড়িয়ে আছে" কথাগুলো বলতে গিয়ে ওনার হাত-পা কাঁপতে থাকে, এই মৃদু ঠাণ্ডার মধ্যেও যেন ঘামছিলেন গ্রাহাম সাহেব। কথার মাঝে রুমাল দিয়ে তিনি তার চকচকে মুখমণ্ডল ভালো করে মুছে নেন। কিন্তু কেন ? কোন কারণে কি টেনশন ফিল করেছিলেন উনি ? এর উত্তর কে দিতে পারে?

"আংকেল, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ?” জানতে চাই আমি।

“ও-নো, আই অ্যাম টোটালি ওকে" শান্তনার স্বরে বলেন তিনি।

তবু আমার কাছে একসময় ধরা দেন মিস্টার গ্রাহাম। তিনি ইশারায় আমাকে তাঁর সাথে ভিতরে আসতে বলেন। আমাকে উনি প্রথমে ঘুরিয়ে দেখান ঘরগুলো। কটেজটা আকৃতিতে খুব একটা বড় না হলেও রুমগুলো সাজানো গুছানো, বাম দিকের শেষ মাথায় কিচেন তারপর অপ্রশস্ত খানিকটা জায়গা। যার একপাশে বাথরুম, অপর পাশে ডাইনিং রুম। অলিন্দ ধরে আরেকটু এগিয়ে এলে একদিকে ওনার শোবার ঘর, ও বিপরীত পাশে ড্রয়িং রুম, ড্রয়িং রুমের সাথে লাগোয়া ওনার লাইব্রেরি, ড্রয়িং রুম, লাইব্রেরি ও অলিন্দ-সব জায়গা দিয়েই ব্যালকনিতে আসার রাস্তা। রানিং ইলেক্ট্রিসিটি নেই এখানে, সোলার ফটোভোল্টাই এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে সমগ্র ফার্ম

হাউজের চারিদিকে। সারা কটেজ জুড়ে সাবেকি আভিজাত্যের ছোঁয়া। দেয়ালে টাঙানো বহু পুরানো ক্যানভাসের উপর আঁকা বিভিন্ন চিত্র, সেই সাথে হরিনের মাথা, বাঘের চামড়া, সাবেকি আমলের পিয়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি। হয়তো আমি বিভোর হয়েই দেখছিলাম সেগুলো, সম্বিত ফেরে ওনার কথায়। "দেখেছ তোমাকে তো এখানকার সবচাইতে রহস্যময় জায়গাটাই দেখানো হলো না" মৃদু হেসে বলেন তিনি, সত্যি বলতে খানিকটা চমকে যাই ওনার কথায়।

"কিসের রহস্যের কথা আপনি বলছেন ?"

"যদি বলি আমাদের অভিশপ্ত জীবনের রহস্য" একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন তিনি।

গ্রাহাম সাহেবের ইংরাজী উচ্চারণে মাঝেমধ্যে খানিকটা আঞ্চলিকতার টান থাকলেও যেভাবে ধীরেধীরে উনি কথাগুলো বলছিলেন তাতে আমার বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। লাইব্রেরিতে বই ভর্তি দুটো সেল্ফের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। এই কটেজের মেঝের বেশিরভাগ স্থানই পুরানো দিনের বিবর্ণ ক্ষয়িষ্ণু কার্পেটে ঢাকা। যার জায়গায় জায়গা মানচিত্রের মতো তলার কাঠগুলো অনাবৃত হয়ে পড়েছে কালের নিয়মে। কিন্তু এই স্থানে কোন কার্পেটের অস্তিত্ব নেই। সেল্ফের পিছনের দেয়ালের সংলগ্ন একটি ধাতব দন্ডকে পাকাতে থাকেন তিনি, একটু একটু করে কাঠের মেঝের খানিকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে যায়, এখান থেকে কালচে মলিন ধুলোমাখা কিছু সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। ওনাকে অনুসরণ করে ঘুটঘুটে অন্ধকার সেই সিঁড়িগুলো পেরিয়ে আসি আমি। অবশেষে বিশাল এক কক্ষে এসে শেষ হয় সিঁড়িটা, এখানে বিজলি বাতির ক্ষীণ আলো জ্বলছে।

গ্রাহাম সাহেব জানান, বহুদিন অব্দি সমুদ্র ছিল এক কক্ষের সংলগ্ন, তারপর ধীরেধীরে সমুদ্র পশ্চিমে এতখানি দূরে চলে গেছে এবং মাটির নিচে চলে গেছে এই ঘরখানা। ঘরের মৃদু আলোতে তিনি কয়েকটা জানলা আমাকে দেখান, বহু বছর এই স্থানটি বালির নিচে চাপা পড়ে যাওয়ায় সার্সি জানলাগুলোর কলকব্জা বিকল হয়ে সেগুলো দেয়ালের অংশবিশেষে পরিণত হয়ে গেছে, কক্ষটিকে ছোটখাটো একটা জাদুঘর বলা চলে। কি নেই এখানে ! পুরানো জাহাজের মাস্তুলের অংশ থেকে জাহাজে ব্যবহৃত কম্পাস,ক্যানভাসে আঁকা নানান চিত্র, পুরানো দিনের নানান অস্ত্র সামগ্রী। ঘরটি সম্পূর্ন মাটির নিচে হলেও প্রপার

ভেন্টিলেশনের জন্য দেয়ালের গা বরাবর বেশ কয়েকটি টিনের চ্যানেল বসানো, যা দিয়ে একজস্ট ফ্যানের সাহায্যে বাইরের বাতাস এই ঘরে এসে ঢোকে, একটা জিনিস দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে ব্রিটিশরা পুরানো সাবেকি ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে কতখানি সচেতন। আমাদের দেশে হলে কবে এই ঘর ভেঙে প্রোমোটার লাগিয়ে এখানে মাল্টি স্টোরড বিল্ডিং তৈরি হয়ে যেত। আমি আপ্লুত হয়ে যাই কক্ষটি দেখে। "আপনার সাথে পরিচয় না হলে এই অসাধারন জায়গাটা দেখার সুযোগ কখনোই পেতাম না" কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি বলি।

"কয়েকশো বছর আগে এই স্থানটিকে বলা হতো Porto marítimo। পর্তুগিজ ভাষায় যার অর্থ হলো সমুদ্র বন্দর। তবে সমুদ্রবন্দর হলেও পণ্যবাহী জাহাজ এখানে বড় একটা ঘেঁষতো না, কারণ মূলত এক স্থানটিকে জেলে ও জলদস্যুরাই বন্দর হিসেবে ব্যবহার করতো। এখানে আসার সময় যেই ফুলের বাগান, সবজির ক্ষেতগুলো দেখতে পেলে, আঠেরোশো শতকের শেষ অব্দি সেখানে ছিল জেলেদের গ্রাম। উনবিংশ শতকের শুরুতে এ দেশের পশ্চিম উপকূলে ভয়াবহ এক সুনামি আছড়ে পড়ে, সেই সুনামির তান্ডবে ধ্বংস হয়ে যায় এই বিস্তৃত জনপদ। তারপর সমুদ্র ধীরেধীরে সরে যায় আরও পশ্চিমে। জঙ্গলে ঢেকে যায় গোটা অঞ্চলটা। অবশেষে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে তদানন্তিন প্রধানমন্ত্রী Herbert Henry Asquith সাময়িকভাবে এখানে নৌসেনাদের ঘাঁটি নির্মাণ করেন। রাস্তা নির্মাণ করা হয় Newquay থেকে Lizard point অব্দি। বানানো হয় সামরিক বিমানঘাঁটি। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে শেষ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এখানে সেনাদের পরিত্যাক্ত ছাউনি, ভাঙা জাহাজ এসব দেখতে শুরু হয় পর্যটকদের আনাগোনা। ধীরেধীরে Lizard point হয়ে ওঠে এদেশের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র আর এই অঞ্চলের মাটি চাষের পক্ষে উর্বর হওয়ায় একের পর এক ফার্ম হাউস এখানে গড়ে উঠতে থাকে।"

এঘরে পা রাখার পর থেকেই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হয়তো জানান দিচ্ছিল এখানে আমাদের দুজনের বাইরে আরেকজন কেউ আছে। গ্রাহাম সাহেব যে বলেছিলেন এখানে তিনি একাই থাকেন, তবে কে সে! উনি কথার মাঝে নানান ঐতিহাসিক সামগ্রীর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, এর মধ্যে অষ্টাদশ শতকের প্যাপিরাস

খন্ডের উপরে লেখা একটা চিঠি ও তিনি আমাকে দেখান। ঠিক তখনই সোলেরো বিচ থেকে পাওয়া সেই বোতল মেলটার কথা আমার মনে পড়ে যায়, এখানে আসার আগে সাথে করে সেটা নিয়ে এসেছি আমি "মিস্টার গ্রাহাম, ইতালির সোলেরো বিচ থেকে কিছুদিন আগে আমি একটা বিস্ময়কর বস্তু সংগ্রহ করেছিলাম, সেটা সম্বন্ধে মাইক আমাকে অনেকটাই বলেছিলো, বাট এই বিষয়ে আরও কিছু আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।"

"মিস্ট্রিয়াস থিঙ্কস! হোয়াট ইস ইট ?"

তিনি নেক স্ট্রিপে ঝোলানো চশমার কাঁচ দুটো ভালো করে পরিষ্কার করে সেটা চোখে দেন। দেয়ালের এক কোনে সাবেকি আমলের কাঠের টেবিল। টেবিলটাকে খানিকটা এগিয়ে এনে একটা চেয়ারে তিনি নিজে বসে আরেকটায় আমাকে বসতে ইঙ্গিত করেন। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে তিনি এবার প্যাপিরাস খন্ডটা পাঠোদ্ধারে মননিবেশ করেন।

ঠিক যেভাবে মাইককে বটল মেলটা পড়তে দেখেছিলাম, গ্রাহাম সাহেবের মধ্যেও আলাদা কিছু নজরে এলো না, আমি নীরবে কিছুক্ষন ঘরের চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে গদিওয়ালা চেয়ারটায় গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দীর্ঘ পথ বিমানযাত্রার পর সেভাবে আর বিশ্রাম পেলাম কোথায়, তার উপর আসার পথে স্নায়ুর চাপও তো কম যায় নি।

এভাবে কতক্ষন ঘুমিয়েছি ঠিক খেয়াল নেই, আচমকা আমার পায়ের কাছে লোমশ কিছু একটা স্পর্শে চমকে উঠি। তবে আমার অনুমানটাই ঠিক, এই প্রাণীটার অস্তিত্বটাই আমি অনুভব করেছিলাম। কিন্তু কি এটা! প্রানীটা ততক্ষনে আমাদের দুজনের মাঝে এসে সামনের দুটো পা টেবিলে তুলে দিয়েছে। ভয়ে আমি শিউরে উঠি। এ তো কুকুর নয়, এটা আসলে একটা পূর্ণবয়স্ক রকি মাউন্টেন উল্ফ। অত্যন্ত বিরল প্রজাতির প্রাণী এরা, যাদের আমেরিকার ইয়েলো স্টোন ন্যাশনাল পার্ক ফরেস্টে দেখা যেত। এই অঞ্চলের তুতুদিকা উপজাতির মানুষ এদের পবিত্র প্রাণী হিসেবে মনে করত। তারপর একসময় মানুষের লোভের কাছে হার মানে এরা। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আমেরিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একদল পশুপালক এখানে বসতি স্থাপন করে, ধীরেধীরে তাদের হাতে একসময় প্রায় ধ্বংস হয়ে যায় এই প্রজাতির নেকড়ে। এই ধরণের হিংস্র প্রাণী ব্রিটেনের পশ্চিম উপকূলে কিভাবে আসতে পারে।

হিংস্র মাউন্টেন উল্ফটা এখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আমার দিকে, হয়তো যেকোন মুহূর্তে সে আমাকে আক্রমন করে কণ্ঠনালি ছিন্নভিন্ন করে দেবে। আমি চেয়ারের মধ্যে জড়সড় ভাবে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছি। গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোচ্ছে না, আত্মরক্ষার সব ক্ষমতাই আমার লুপ্তপ্রায় কিন্তু! হাতদুটো ফাঁক করে প্রাণীটার দিয়ে তাকিয়ে আবাক হয়ে যাই আমি। এ কি দেখছি ! ওটার মধ্যে কোনরকম নিষ্ঠুরতার চিহ্ন নেই, বরং মায়াবী চোখে ফ্যালফ্যাল করে সে আমার দিকে চেয়ে আছে। গ্রাহাম সাহেব তখনও একমনে সেই প্যাপিরাস খন্ডটিতে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে এভাবে দেখে তিনি মুখ তোলেন, "আঃ, কি হচ্ছে কি! তুমি তোমার জায়গায় যাও, ওনাকে বিরক্ত করো না" ঠিক যেমন করে পোষা কুকুরকে মনিবরা শাসন করে থাকে, সেভাবেই মৃদু ধমক দেয় গ্রাহাম সাহেব। তাঁর কথায় অনুগত প্রাণীর মতো নেকড়েটা একটা ডেস্কের নিচে গিয়ে আশ্রয় নেয়, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আরও কিছুক্ষন পর তিনি প্যাপিরাস খন্ডটা পড়া শেষ করে সযত্নে আমাকে ফেরত দেন।

"আপনি কি কিছু বুঝতে পারলেন এটা পড়ে ?" খানিকটা দ্বিধাগ্রস্থ ভাবেই জানতে চাই।

"সব কথা তোমাকে বলব, কিন্তু তার আগে চলো আমরা লাঞ্চ সেরে নিই, আমার বিশ্বাস এই মুহূর্তে তুমি একই সাথে ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত।"

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গ্রাহাম সাহেব আমাকে নিয়ে যান ডাইনিং রুমে। ডাইনিং প্লেটে আমাদের দুজনের খাবার সাজানোই ছিল। হ্যাডক মাছের ফ্রাই, ব্রাউন ব্রেডের চিকেন স্যান্ডউইচ, স্যালাড ও ভেজিটেবল স্যুপ। ক্ষিদের মুখে বেশ উপভোগ করলাম খাবারগুলো, কিন্তু ঘুরেফিরে একটা কথাই বারবার মনের কোনে উঁকি মারছিল। ভদ্রলোক এখানে তো একাই থাকেন, তাহলে এতকিছু আয়োজন এটুকু সময়ের মধ্যে কে করল ? তবে কি এর পিছনেও সেই মাইক ?

খাওয়া শেষ করে গ্রাহাম সাহেব আমাকে ঘরের চারপাশের বাগানগুলো ঘুরে দেখাচ্ছিলেন। তিনি জানান এখানে প্রতিটা ফলই খুব অর্গানিক ভাবে চাষ করা। কোন রাসায়নিক সার বা ক্ষতিকর বিষ এখানে প্রয়োগ করা হয় না। ক্ষেতের টাটকা আঙুর ও স্ট্রবেরি তিনি আমাকে খেতে দেন, এরপর পদব্রজে আমরা বেরিয়ে আসি। ঈষৎ মেঘলাটে আবহাওয়া। ঘড়িতে তখন প্রায় দেড়টা বাজে। অসীম

নীরবতা ভরা সবুজ শস্যক্ষেতের মাঝখান দিয়ে তখন আমরা হেঁটে চলেছি। "খুব সুন্দর লাগছে আপনাদের এই জায়গাটা" আমি নীরবতা ভঙ্গ করে বলি।

"ইন্দ্রনীল, তুমি আজ কি জিনিস নিয়ে এসেছ, তা তুমি নিজেই জানো না, আমার বিশ্বাস স্বয়ং দেবী Angitia তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমাদের পূর্বপুরুষকে জন্মজন্মান্তর ধরে চলে আসা তাঁর অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে।"

অবশেষে পায়ে পায়ে আমরা এক গির্জার কাছে এসে পৌঁছাই। Parish Church of St Winwaloe সমুদ্রের ধারে জনকোলাহলের বাইরে শান্ত সমাহিত সুন্দর এক স্থান। সবুজে ঢাকা লিজার্ট রকের উঁচুনিচু টিলায় ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। টিলার একধারে সমুদ্রসৈকত। সামনে একফালি সবুজ ঘাসের কার্পেট বিছানো মাঠ পেরিয়ে আমরা ছোট্ট কাঠের গেট টেনে সেখানে প্রবেশ করি। চার্চটা বহুদিনের পুরনো দেখেই বোঝা যায়। সাবেকি Renesus Architecture কায়দায় পাথরে নির্মিত তিনটি কক্ষ পরস্পর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে আসার পথে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, ক্রমশ বৃষ্টির দাপট বাড়তে থাকে। বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে আমার প্রানভরে উপভোগের বাসনা থাকলেও অবশেষে গির্জার ভিতরে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমাদের কিছু তখন করার ছিল না। এক হলঘরে অবশেষে আমরা প্রবেশ করি। এই চার্চে গ্রাহাম সাহেবের অবাধ গতি সেটা বেশ বোঝা যায়, তার সামান্য ইশারায় খানিক পরে বছর কুড়ির এক যুবক দুই পেয়ালা চা ও সামান্য স্ন্যাক্স নিয়ে প্রবেশ করে। মধ্যান্নভোজের পর চা খাওয়ার রেওয়াজ এদেশে প্রচলিত।

"গির্জা টা খুব পুরনো তাই না ?"

"এই গির্জা নির্মিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতকে"

পঞ্চদশ শতকে! চমকে যাই ওনার কথায়।

"হ্যাঁ, তুমি হয়তো জানো না, এই গির্জায় আমাদের পূর্বপুরুষদের আলাদা এক সমাদর ছিলো।" গ্রাহাম সাহেব পকেট থেকে কলম ও একফালি কাগজ বের করে আমাকে এঁকে দেখান। সেই সময় সমুদ্রের গতিপথ ঠিক কেমন ছিলো, পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই চার্চের বামপাশে সমুদ্র তখন অনেকখানি ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হত। তারপর সমুদ্র উপকূল একসময় সেখান থেকে বেশ খানিকটা সরে যায়।

"আপনাদের পূর্বপুরুষ ! প্লিজ, আমাকে সব বলুন, আমি সেই ইতিহাস জানতে চাই" আমার কথায় মৃদু হাসেন তিনি।

"তুমি হয়তো জানো না আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন একজন জলদস্যু, যিনি শুধুমাত্র আটলান্টিক ওসান কেন, ইন্ডিয়ান ওসান ইভেন এরাবিয়ান সি র ও ত্রাস ছিলেন।"

"হু ইস হি ?"

"নট হি, তিনি ছিলেন একজন মহিলা, অষ্টাদশ শতকে এদেশের নামকরা মহিলা জলদস্যু আনি বনি। যাঁর বটল মেল টা তুমি আমাকে দেখালে।" গ্রাহাম সাহেবের কথায় আমার সারা শরীরে এক অব্যক্ত শিহরণ খেলে যায়।

"তার মানে ?" আমি উঠে দাঁড়াই।

"হ্যাঁ, ইতিহাসে যেই কুখ্যাত জলদস্যু আনি বনির কথা শুনেছ, আমরা তাঁর বংশধর। তবে তাঁকে ইতিহাস যতখানি নিষ্ঠুর ভাবে দেখিয়েছে, তিনি কিন্তু সেরকম ছিলেন না, জীবনে তিনি শুধুমাত্র তিনজনকে হত্যা করেছিলেন, তারমধ্যে দুজন ছিল তাঁর দলের বিশ্বাসঘাতক, আরেকজনকে তিনি হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন আত্মরক্ষার তাগিদে, যেকারণে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছিলেন। শুনবে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথাগুলো ?" জীবনে কখনো আমি যেই মানুষটার সম্বন্ধে জানতাম না, আজ গ্রাহাম সাহেবের কথায় কোন এক অজ্ঞাত কারণে সেই মানুষটাকে বড় বেশি করে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে।

"বলুন, আমি নিশ্চই শুনব।"

"তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি কখনো মৃত্যুকে পরোয়া করেননি। আটলান্টিক মহাসাগর, জিব্রাল্টার প্রণালী, লোহিত সাগর, আরব সাগর সব জায়গায় ছিল তার অবাধ গতি। একবার জিব্রাল্টার প্রণালীর এক ভয়াবহ ঝড়ের তান্ডবে পড়েছিলেন তিনি, তাঁদের নৌকা যখন জলমগ্ন প্রায়, ঠিক তখন এক নারী মূর্তিকে তিনি নৌকায় দেখতে পান। সেই নারীমূর্তি আর কেউ নন, তিনি দেবী Angitia।

আমি চমকে উঠি ওনার কথায়। আমার কাছে Angitia এখন অসীম এক বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে, যার থেকে মুক্তিলাভের উপায় আমার অজানা, গ্রাহাম সাহেবের মুখেও তাঁর কথা শুনলাম আজ।

"মানে, দেবী দেখা দিয়েছিলেন ওনাকে ?" কাঁপা কাঁপা গলায় আমি প্রশ্ন করি।

“আমরা যেটুকু শুনেছি তা হলো দেবী Angitia-র ইচ্ছায় সেই ঝড়জল মুহূর্তের মধ্যে থেমে যায়। দেবী তাঁর কাছে চেয়েছিলেন যাতে আনি বনি সুলেমানি গুপ্তধন দিয়ে তাঁর মন্দির নির্মাণ করেন।"

সুলেমানি গুপ্তধন ! অবাক হয়ে আমি সবকিছু জানতে চাই তাঁর কাছে।

"হ্যাঁ, রাজা সলোমনের ইতিহাস সেভাবে জানা না গেলেও শোনা যায় তিনি ও ছিলেন দেবী Angitia-র ভক্ত। তিনিও চেয়েছিলেন তাঁর অপরিসীম ধনদৌলত দিয়ে দেবীর মন্দির স্থাপন করতে। কিন্তু কোন এক যুদ্ধযাত্রার কারণে তা করে যেতে পারেন নি। এরপর তিনি বুঝতে পারেন তাঁর শেষ সময় উপস্থিত, তখন তিনি তাঁর সারা জীবনের ধনসম্পত্তি কোন এক গোপন স্থানে রেখে যান। যার নকশা তিনি গচ্ছিত রাখেন খিরবেত কুমরানের তৃতীয় গুহার তাঁর সবচাইতে বিশ্বস্ত Essenesর পূজারীর কাছে। এই নকশার তিনটে অংশ, যার প্রথম অংশ সেখান থেকে পাঠোদ্ধার করে এসে আনি বনি এই গির্জায় লিখে রেখে গিয়েছিলেন। একটা আশ্চর্যের বিষয় কি, উনবিংশ শতকের শুরুতে যে সাংঘাতিক সুনামি এখানে আঁছড়ে পড়েছিল, তাতে একটা গোটা জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও এই গির্জার কোন ক্ষতি হয় নি।

"আর সেই নকশার বাকি অংশ গুলো ?” আমি জানতে চাই।

“দ্বিতীয় অংশটা ও তিনি পাঠোদ্ধার করে ফেলেন, কিন্তু শোনা যায় এই সময় ছোট্ট একটা ভুল করে বসেন তিনি।"

“কি ভুল ?"

“এক দুঃসাহসিক অভিযানের কারণে বহুদিন তিনি ছিলেন দেশের বাইরে। দেশে ফেরার পর এক রাতে নিভৃতে তার স্বামী তাকে আলিঙ্গন করে বসেন, আনি বনির সব প্রতিরোধ এই সময় ভেঙে পড়ে বালির বাঁধের মতো। অবশেষে তাঁরা মিলিত হন, কিন্তু দেবী Angitia-র নির্দেশ ছিল মন্দির নির্মাণের পূর্বে কোনভাবেই কামনার ফাঁদে পড়া চলবে না। অবশেষে দেবীর রোষে পড়ে যান তিনি। আনি বনি যখন বুঝতে পারেন, এ মন্দির দেবী আর কোনভাবেই তাঁকে দিয়ে নির্মাণ করতে দেবেন না, তখন ক্ষোভে, হতাশায়, অনুশোচনায় সেই প্যাপিরাসে লিপিবদ্ধ নক্সার মূল অংশটাকে বোতলে ভরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেন। যদি কোনদিন কারো হাত দিয়ে তাঁর শাপমুক্তি হয় সেই আশায়।"

বাইরে তখন একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে আকাশ ভেঙে গমগম

আওয়াজ করে টিনের ছাদের উপর এসে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা গুলো। পুরানোদিনের বিশাল জানলাগুলোর বাইরে আকাশটা একেবারে থম মেরে আছে। শিরশিরে বাতাসে সারা শরীরে কাঁপ ধরিয়ে দেয়। গির্জার হলঘরে অন্ধকার নেমে আসছে ধীরেধীরে। চার্চের অল্টারের দুইপাশে দুটো মোমবাতি জ্বলছে। কাঁপা কাঁপা মোমের আলোয় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গ্রাহাম সাহেবের কথাগুলো। মোমের মৃদু আলোয় উল্টো দিকের দেয়াল জুড়ে দুলছে ওনার বিশাল ছায়াখানি "নকশার তৃতীয় অংশটা ?" আমি জানতে চাই ওনার কাছে।

"মিসান ভাষায় লেখা কপার স্ক্রলের কিছুটা অংশ পাঠোদ্ধার করেন আমার পিতা Gerald Lankester Harding। বাকিটা দুর্বোদ্ধ কিছু জ্যামিতিক সংকেতে লেখা। হয়তো তিনি এই কপারস্ক্রল পাঠোদ্ধার করে দেবী Angitia র মন্দির নির্মাণ করে ফেলতেন, কিন্তু নিয়তি তাঁকেও সফল হতে দেয় নি।"

"হ্যাঁ, আমি শুনেছিলাম, কোন এক পার্টিতে মদ্যপানের কারণে! কিন্তু আনি বনির বংশধর হলে আপনার পিতা দেবীর অভিশাপের হাত থেকে মুক্তি পেলেন কিভাবে ?" আমি আশ্চর্য হয়ে জানতে চাই।

"খুব দামী একটা প্রশ্ন করেছ। কেউ দেবী Angitia-র কোপে পড়লে অষ্টাদশ প্রজন্ম অবধি তাদের এই অভিশাপ বহন করতে হয়, আমার পিতা ছিলেন আনি বনির উনিশতম প্রজন্মের বংশধর। তাই সেই অভিশাপ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপর বর্ষিত হয় নি, তিনি পারতেন আমাদের পূর্বপুরুষকে শাপমুক্ত করতে কিন্তু সবটাই আমাদের দুর্ভাগ্য" কথা শেষ করে সুগভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বৃদ্ধ।

"কপারস্ক্রলের সেই অংশের নকশা ও কি এখানেই আছে ?" আমি জানতে চাই।

"না, সেই সকল গাণিতিক সংকেত রাখা আছে জর্ডনের রাজধানী আম্মান মহানগরীর শহরতলির Ras Al-Ein এ অবস্থিত The Jordan Museum এর সংরক্ষিত স্থানে, অথচ সমস্যাটা কোথায় জানো, জর্ডনের সাথে ইসরায়েলের রাজনৈতিক সম্পর্ক ঠিক এতটাই খারাপ যে জর্ডন কোন ইসরায়েলি নাগরিককে কপারস্ক্রলের ওই অংশটা দেখতেও দেয় নি।"

"তাহলে এই রহস্যের সমাধান তো কখনোই করা সম্ভব নয়" আমার কথায় গ্রাহাম সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদু হাসেন। দেবী

Angitia জানেন, আরেকটা কথা হলো রাজা সলোমন নাকি বলে গিয়েছিলেন যে একমাত্র ইন্দো এশিয়ান বংশোদ্ভূত মানুষই পারবেন এই মন্দির নির্মাণ করতে।"

"আমার বাবা বাঙালি হলেও মা ছিলেন ইন্দো এরিয়ান বংশোদ্ভূত।" আমার কথায় বৃদ্ধ গ্রাহাম সাহেব উঠে দাঁড়ান, মোমের আলোয় বেশ বোঝা যায় তাঁর গাল বেয়ে নেমে আসছে অশ্রুর ধারা, হয়তো বা আনন্দাশ্রু।

কি জানি, এও হয়তো দেবী Angitia-র আশীর্বাদ। নিজের মনেই যেন কথাগুলো বলে তিনি মস্ত একটা আলমারি থেকে পার্চমেন্ট কাগজের কিছু রোল বের করে আমার সামনে মেলে ধরেন। "এই সেই মূল নথি, খিরবেত কুমরানের সাঙ্কেতিক কপার স্ক্রল পাঠোদ্ধার করে আনি বনি গুপ্তধনের বিষয়ে যা যা আবিষ্কার করেছিলেন। তার সমস্তটাই এখানে আছে, অবশ্য বটলমেল-এও তিনি এই দলিলের সম্পূর্ণটাই অতি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে লিখে রেখে গেছিলেন, যেটা এখন তোমার কাছে।" আলো আঁধারি গির্জা কক্ষে মোমের মৃদু আলোয় আমি হলদেটে কাগজগুলোর মধ্যে আবছা কালির লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করি, কিন্তু লেখাগুলো এতোটাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে সেটা পাঠোদ্ধার করাটা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। "চলো, সন্ধ্যে হয়ে এলো, এবার ফেরা যাক" আমার কাঁধে হাত রাখেন মিস্টার গ্রাহাম, বৃষ্টি থেমে গেছে খানিক্ষন, ধীরেধীরে অন্ধকার নেমে আসছে, ভীষণরকম নির্জন চারিদিকটা। পশ্চিম আকাশের মৃদু আলোর আভা প্রতিফলিত হচ্ছে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের মাঝে। পায়ে চলা পথের দুপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের মধ্যে থেকে ভেসে আসা পাখির কলতান জানান দিয়ে যায় পৃথিবীটা এখনো জেগে আছে।

"আপনাকে কি আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে পারি, যদি কিছু মনে না করেন ?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই, বলো কি জানতে চাও"।

"আপনি বাড়িতে হিংস্র রকি মাউন্টেন উলফ পুষে রেখেছেন কেন? এই ধরণের প্রাণী তো আপনার পক্ষে বিপদজনক হতে পারে, আর তাছাড়া সংরক্ষিত লুপ্তপ্রায় প্রাণী ঘরে রাখা ইন্ডিয়া বা ইংল্যান্ড দুই দেশের আইনের চোখেই সমানভাবে অপরাধ।

"বেগ ইওর পারডন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে এই মুহূর্তে

দিতে পারব না, দেবী Angitia চাইলে তিনিই একদিন তোমার সব কৌতূহলের অবসান করবেন।"

শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলো বলেন তিনি। ওনার কথার মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া ছিল যার পর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তবে এটা বেশ বুঝতে পারি যে এর মধ্যেও কোন এক অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু কি সেই রহস্য?

।। গন্তব্য এবার তেল-আভিভ।।

গ্রাহাম সাহেবের কটেজে ফিরতে ফিরতে চারিদিকে অন্ধকার বেশ গভীর হয়ে গেছে। এই স্থানটা মূলত কৃষি নির্ভর হওয়ায় এখানে রাতে জোরালো আলো জ্বালা নিষেধ। তাই গ্রাহাম সাহেবের টর্চের আলোয় এতখানি পথ ফিরতে হল। অন্ধকার আকাশে বহুদুরে উত্তরপশ্চিম কোনের কিছুটা জায়গা আলোকিত, ওটা Newquay শহরের আলো। আজ রাতে মাইকের সাথে আমার ওই শহরে থাকার কথা। গ্রাহাম সাহেবের কটেজের বাইরে সৌরশক্তির দুটো বাতি জ্বলছে, তবে তাতে আরও রহস্যময় আলোআঁধারী লাগছে জায়গাটা। সমুদ্রের নোনা হাওয়া গাছে গাছে একটা অদ্ভুত আওয়াজ তুলছে বারেবারে, হাইরোডে পেট্রল পাম্পের আলো দুটো হীরক খন্ডের মতো দেখাচ্ছে এখান থেকে।

আমাদের আসার আগেই মাইক এখানে পৌঁছে গেছে। একটা ব্ল্যাকবেরি গাছে ঝোলানো দোলনায় শিশুর মতো দোল খাচ্ছে মাইক, "গাড়িটা বোধহয় আমাদের জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে" আমাদের ফিরতে দেখে মৃদু হেসে বলে মাইক।

"মাইক, তুমি কতক্ষন ?"

"চাপ নিয়ো না ইয়ার, খুব বেশি হলে ফিফটিন মিনিটস।"

আমি বিদায় নিতে চাইলেও রাজি হলেন না গ্রাহাম সাহেব। সামান্য সময়ের মধ্যেই কফি, ওমলেট আর স্যালাড বানিয়ে আনলেন তিনি, আর আমরাই বা কি করে বয়স্ক মানুষটার সামান্য অনুরোধটাকে অগ্রাহ্য করি। অবশ্য শুধু গ্রাহাম সাহেব নন, তাঁর হিংস্র নেকড়েটাও পায়েপায়ে চলে এসেছে আমাদের বিদায় জানাতে। এই প্রজাতির নেকড়ে যে এতখানি পোষ মানে তা আমার জানা ছিলো না, যাই হোক নেকড়েটার গায়ে মাথায় কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে অবশেষে আমরা গ্রাহাম সাহেবকে বিদায় জানাই। আমাদের দেশের বিচারে আজ ঠান্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে

পড়েছে। গাড়িতে উঠে মাইক রিমোট টিপে সবার আগে জানলার কাঁচগুলো বন্ধ করে দেয়, এখন আমাদের গন্তব্য Newquay. মানে যেখানে বিমান থেকে নেমে আমি এখানে এসেছিলাম। অবশেষে এক্সেলেটারে পা রাখে মাইক। রাতের জনহীন রাস্তায় স্পিডমিটারের কাঁটা এগোচ্ছে তিরতির করে।

"মাইক, আমি যেন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভিতর ধীরেধীরে জড়িয়ে পড়ছি।"

“তাতে তোমার সমস্যাটা কি হচ্ছে ?” নিজের মনে গাড়ি চালাতে চালাতে মাইক আমাকে প্রশ্নটা ছুড়ে দেয়।

“হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে ? আমার কর্মজীবন, আমার পরিবার সবকিছু বিসর্জন দিতে হচ্ছে শুধুমাত্র একটা কারণে" ঈষৎ উত্তেজিত ভাবেই আমি জবাব দিই।

"নেপলস বিমানবন্দরে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম তোমার মনে আছে ?"

"আমি মনে করতে পারছি না, তুমি আসলে ঠিক কোন কথাটার বিষয় নিয়ে আমাকে বলতে চাইছ।"

"আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম তুমি কি কোন এন্টিক জিনিস ইতালি থেকে সংগ্রহ করেছ কিনা, বাট সাথেসাথেই তুমি অস্বীকার করেছিলে God Angitia-র মূর্তি তুমি সেখান থেকে কালেক্ট করেছিলে, তোমার মনে পড়ে ?" সত্যি বলতে মাইকের এই কথার উপর আর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, এই বিষয়টা আমার জীবনে এতখানি গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠতে পারে সেটা আমি কখনোই ভাবি নি।

"তাহলে এখন আমার কি করা উচিত তুমি বলে দাও, গ্রাহাম সাহেব Parish Church of St Winwaloe থেকে সেই বটল মেলের মতোই এক রোল প্যাপিরাস লিপি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। আনি বনি নাকি সুলেমানি গুপ্তধনের সংকেত আরও বিশদ ভাবে ওখানে লিখে রেখে গেছেন।"

"আমি জানতাম ইন্দ্র, তিনি এগুলো তোমার হাতেই তুলে দেবেন।"

"কিন্তু এগুলো নিয়ে আমি কি করব ?"

"এইসব সংকেত গুলো পাঠোদ্ধার করে তুমি সুলেমানি গুপ্তধন আবিস্কার করবে।"

“আমি!” বিস্ময়ে আমার হাত-পা কাঁপতে থাকে।

হ্যাঁ, সুলেমানি গুপ্তধন আবিস্কার করে তুমি God Angitia র মন্দির নির্মাণ করবে, এতগুলো মানুষ জন্মজন্মান্তর যেই অভিশাপ বয়ে নিয়ে চলেছে, তার থেকে তুমি তাদের মুক্তি দেবে।"

“কিন্তু আমি কিভাবে ইসরায়েলে যাব? আর সেখানকার সরকার কেনই বা আমাকে সুলেমানি গুপ্তধনের হদিস করতে দেবে ?”

“সে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তোমার এদেশের সাথে ইসরায়েল পৌছাবার স্টাডি ভিসাও একই সাথে তৈরী হয়ে আছে।” মাইক ডান হাতে স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বাম হাতটা আমার কাঁধে রাখে। শুনশান রাস্তায় গাড়ি একই ভাবে ফোর্থ গিয়ারে ছুটছে।

“তুমি হয়তো জানো না যে সেই গুপ্তধনের সংকেতের অনেকখানি জর্ডনের The Jordan Museum-এ রাখা আছে। জর্ডন সরকার কাউকে সেই কপার স্ক্রলের নকশা দেখায় না, বিশেষ করে কোন ইসরায়েলি কে তো নয়ই।”

“তুমি ভীষণভাবে চিন্তান্বিত হয়ে পরছো ইন্দ্র, দেখো ঈশ্বর চাইলে কোন বাধাই কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।”

মাইকের এই কথার পর কি বলব ঠিক ভেবে উঠতে পারছিলাম না, সারাদিনের ক্লান্তিতে আমার চোখদুটো বুজে আসছিল বারবার। শেষবার ঘুমটা হয়তো একটু গভীর হয়ে গেছিল, অবশেষে মাইকের ডাকে যখন আমার ঘুম ভাঙল গাড়ি কোন এক বিল্ডিং এর বেসমেন্টে দাঁড়ানো। চারিদিকে খানিকটা ব্যস্ততা, বুঝলাম আমরা হোটেলে পোঁছে গেছি। হোটেল বয় গাড়ির ডিকি থেকে লাগেজগুলো বের করে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট রুমে নিয়ে যায়। অবশেষে আমরা হাইড্রোলিক ক্যাপসুল লিফটে করে পোঁছে যাই ছয় তলায়। রুমে ঢোকার কিছুক্ষনের মধ্যেই গরম গরম ডিনার চলে আসে, বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে ঘুম ঘুম চোখে ডিনার সেরে এসে আমি শুয়ে পড়ি। পাশের বেডে মাইক চিরাচরিত ভাবে ল্যাপটপ নিয়ে কাউকে মেল করেই চলেছে।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যায় আমার। আমার এই এক সমস্যা, খুব বেশি ক্লান্ত থাকলে ঘুম সেভাবে হয় না। ঘরে মৃদু একটা আলো জ্বলছে, বাতাসে মিষ্টি ল্যাভেন্ডারের গন্ধ, পাশের বেডে মাইক নেই। হয়তো বাথরুমে গেছে, জানালার পর্দার রিংগুলো পেলমেটের চ্যানেল স্পর্শ করে মাঝেমাঝে মৃদু একটা আওয়াজ তুলছে। ঠিক যেমনটা হয়

বাতাসে পর্দাগুলো আন্দোলিত হলে, কিন্তু এখন বেশ ঠান্ডা, কাজেই ফ্যান চালাবার প্রশ্নই নেই। তাহলে এই শব্দটা কেন আসছে! তবে কি ভারী পর্দার পিছনে কেউ লুকিয়ে আছে? কিন্তু কেন ? আর কোনরকম অস্বাভাবিকত্ব নেই চারিদিকে। তাও বুকের ভিতরে একটা আজানা ভয়ের স্রোত বয়ে চলেছে। কেন এমন হচ্ছে? মাইক এতক্ষন ধরে টয়লেটেই বা কি করছে আর ঠিক তখন ই...! আধা অন্ধকারের মধ্যে কি ওটা ? একজোড়া সবুজ চোখ। লোমশ একটা প্রাণী ঠিক যেন আমার দিকেই চেয়ে আছে একদৃষ্টে, মৃদু সবুজ আলোতে প্রাণীটাকে সেভাবে চেনা যাচ্ছে না, কিন্তু ! “মা..ই..ক” নিজের অজান্তেই আমার বুক চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। ঠিক সেই মুহূর্তেই আলো জ্বলে ওঠে। মাইক মিটিমিটি হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

"কি হলো, কোন ভয়ের স্বপ্ন দেখেছ?" মাইকের গলার স্বর খুবই আন্তরিক।

“স্বপ্ন না, আমি পরিস্কার দেখেছি হিংস্র একটা প্রাণী এখানটায় দাঁড়িয়ে আছে, তুমি বিশ্বাস কর” মাইক মৃদু হেসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ওর হাতটা বড় ঠান্ডা। টয়লেটে জল ঘেটে এসেছে বলেই হয়তো।

“তুমি স্বপ্ন দেখেছ ইন্দ্র, আমি তো ওই চেয়ারটায় বসে স্মোক করছিলাম। দেখো, এখনো ওই এস্ট্রেটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে" সত্যিই তাই। মাইকের কথা তো ভুল নয়। এস্ট্রে থেকে কখনো সরলরেখায়, কখনো এঁকেবেঁকে ধোঁয়ার রেখা উঠে চলেছে।

"ঈষদুষ্ণ জলের সাথে এক পেগ ব্রান্ডি মারবে ? দেখবে ঘুমটা ভালো হবে। সকাল থেকে কিন্তু অনেক কাজ।"

মাইক ওয়ার্ম ওয়াটারের সাথে চাইনিস পেগে কড়া করে এক গ্লাস ব্রান্ডি আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। সত্যি কি অপরূপ জাদু ব্রান্ডিটার মধ্যে, ওটা খেয়ে আর আমি তাকিয়ে থাকতে পারি না। চোখে গভীর ঘুম নেমে আসে মুহূর্তের মধ্যেই।

টিং টং টিং টং টিং টং ঘড়ির আওয়াজ জানান দেয় সাতটা বেজে গেছে। মাইক ডাকছে আমাকে বেড টি খেতে, আমি চট করে বাথরুম থেকে ফিরে এসে ব্রাশ করে নিই। জানলাটা একবার খুলে মনে হয় আমাদের ঘরটা মেঘের মধ্যে ভাসছে। লন্ডন ফগের কথা আগেও শুনেছিলাম এবার চাক্ষুষ দেখলাম। মনে হচ্ছে চারিদিকটা ঢেকে আছে।

ঝাপসা মেঘে, জানালা বেয়ে টপটপ করে জল ঝরছে, খোলা জানলা দিয়ে হুঁ হুঁ করে কুয়াশা ঢুকছে ঘরের ভিতরে।

"জানলাটা বন্ধ করে দাও ইন্দ্র, এই অচেনা আবহাওয়ায় তোমার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।" অভিভাবকত্বের সুর মাইকের গলায়, ফ্রেশ হয়ে আমি চেয়ারে এসে বসি। মাইক ফ্লাস্ক থেকে দুটো পেয়ালায় চা ঢালে। "কাল ভোরে ফ্লাইটে তোমাকে তেল-আবিব পৌঁছাতে হবে তার আগে ইসরায়েল আম্ব্যাসিতে অফিসিয়াল কিছু ফর্মালিটিস আছে" আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। বর্তমানে আমার স্বাধীন সত্তার কিই বা অবশিষ্ট আছে।

"তুমি আমার সাথে তেল-আবিব যাচ্ছ তো ?" মাইকের কাছে জানতে চাই।

“নো ডিয়ার, তবে এটুকু জেনে রাখ, আমি তোমার সাথে সাথেই থাকব, কোন সমস্যাই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না শুধু একটা কথা, নার্ভের উপর কোন চাপ নিয়ো না। তোমার অফুরন্ত সাফল্য কামনা করি।"

কিন্তু...!।

“কোন কিন্তু নয়, God Angitia-র উপর তুমি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পার। ভালো কথা, এই ওয়ালেটটা তুমি রাখ, এর ভিতরের সব পেপার্সগুলোই তোমার পক্ষে মূল্যবান। আর সেই সাথে এতে ফাইভ থাউজেন্ড সেকেল আছে। আমার বিশ্বাস এগুলো তোমার খরচ করার দরকার পড়বে না, তাও মানি ইস অলওয়েজ হানি।"

'সেকেল' ইসরায়েলি কারেন্সি। ভারতীয় মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

"এতগুলো টাকা তুমি কেন আমার জন্য খরচ করছ মাইক ?” আর তাছাড়া...’।

“আজ যখন আমরা ইসরায়েলি এম্বেসীর কাছে পৌঁছাব, আমি এম্বেসীর থেকে মোর অর লেস দুশো মিটার দূরে দাঁড়িয়ে স্মোক করবো, ঠিক তখনই নেভিব্লু শুট এন্ড ডার্ক প্যান্ট পরে বছর পঞ্চাশের একজন লোক তোমার কাছে এসে দাঁড়াবে।" মাইক আমার কথার মাঝেই বলতে থাকে, আমি অতখানি গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো সত্যি বলতে শুনেছিলাম না। আমার এই ব্যবহারে মাইক বোধ হয় খানিকটা অসন্তুষ্ট হয় "ইন্দ্র বি সিরিয়াস, আমি যা যা বলছি তার একটা পয়েন্ট

এদিক ওদিক হলে তোমার বিপদ হতে পারে, কাজেই আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন।"

"হ্যাঁ, বল, আমি শুনছি"

"সেই মানুষটা তোমার কাছে এসে বলবে TK156. আর তুমি তার উত্তরে বলবে KB45, ঠিক এর পর ওই মানুষটা তোমার কাছে হাত বাড়িয়ে কিছু একটা চাইবেন, তুমি তাঁর হাতে তোমার মোবাইল ফোনটা তুলে দেবে। বিনিময়ে তিনি তোমাকে একটা ব্র্যান্ড নিউ মোবাইল ফোন ও সেই সাথে একটা ল্যাপটপ দেবেন। উইদিন হাফ আওয়ারে তোমার নাম্বারে ওই মোবাইলটা একটিভেট হয়ে যাবে। আর জিনিসগুলো হাতে নিয়ে তুমি ওয়ালেটের ভিতর থেকে ব্লু কার্ডটা বের করে তাঁর হাতে দিলে মানুষটা সেখান থেকে বিদায় নেবেন।"

আমি চমকে উঠি মাইকের কথাগুলো শুনে, তবে কি মাইক কোন গুপ্তচর সংস্থার স্পাই? আমাকে কি কোন অসৎ কাজে লাগানো ওর উদ্দেশ্য ? হে ঈশ্বর তুমি আমাকে রক্ষা করো। নিজের মনেই হয়তো কথাগুলো বলি আমি, এরপর মাইক আবার আমার সাথে চিরাচরিত খুনসুটিতে মেতে ওঠে। দুপুর দুটোর আশেপাশে আমরা বিমান ধরে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে এসে নামি।

আমরা ইসরায়েলি এম্বেসিতে সব রকম ফর্মালিটিস কমপ্লিট করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর মাইক ঠিক যেমনটা বলেছিল, একে একে সেই ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। অবশেষে সেই রহস্যময় মানুষটা আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। খানিকটা আনমনা ছিলাম আমি, হয়তো এ দেশ ছাড়ার আগে শেষবারের মতো লন্ডন মহানগরীটাকে প্রাণভরে দেখছিলাম আর ঠিক তখন ই...'TK 156' চমকে গিয়ে খানিকটা পিছিয়ে যাই। আমি আপাদমস্তক পর্যবেক্ষন করি মানুষটাকে। সন্ধ্যে নেমে এসেছে লন্ডন শহরে। রাতের ঝলমলে আলোতে ফুটপাতের একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমি। সেই মানুষটা দাঁড়িয়ে আমার দশ হাতের ভিতরে। গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে লোকটার গায়ে, মাথার ঢাউস হ্যাটের মধ্যে দিয়ে মুখটা ভালো করে বোঝা যায় না। তবু যেন মনে হয় রহস্যময় এক দৃষ্ঠটিতে সে আমাকে মেপে চলেছে।

"KB 45"

একরাশ দ্বিধা, সংশয় নিয়ে কাঁপাকাঁপা গলায় আমি মাইকের

কথামত সেই সাঙ্কেতিক সংখ্যাটা উচ্চারণ করি। তারপর ঠিক সেই ঘটনাগুলো ঘটে যেমনটা মাইক আমাকে বলেছিল। নিজেকে এবার খুব অসহায়, নিরাপত্তাহীন বলে মনে হয় আমার। মনে হয় একদল মানুষ বা অশরীরি প্রাণী প্রতিনিয়ত আমার দিকে নজর রেখে চলেছে, আমি তাদের হাতের পুতুল, অথবা বলির বলদ ! হয়তো তারা নিষ্ঠুরভাবে তিলেতিলে আমাকে শেষ করে পাশবিক এক আনন্দে ফেটে পড়ছে মনেমনে, কিন্তু কেন? আমি তো কারোর কোন ক্ষতি করি নি। এরপর হয়তো বা একদিন এই চাপ নিতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়ব চলন্ত রেলগাড়ির সামনে, অথবা আমার মৃতদেহটা দুলবে কোন সিলিং ফ্যানের সাথে। জীবনের এই সায়াহ্নে এসে বাবা মার সাথে আনন্দঘন মুহূর্তগুলো বড় বেশি করে মনে পড়ছিল। হৃদয়ে জমে থাকা বাষ্পগুলো হয়তো ফুটে বেরোচ্ছিল আমার দুচোখ দিয়ে। দুগাল বেয়ে নামছিল অশ্রুর ধারা। আর তখনই একটা বন্ধুত্বের হাত যেন আমার কাঁধটাকে স্পর্শ করে। মাইক এসে দাঁড়িয়েছে আমার পিছনে।

“তোমার কষ্টটা আমি বুঝতে পারছি বন্ধু, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস কর। ব্রিটিশরা কখনো কাউকে বন্ধু বলে ডেকে পিছন থেকে সেই মানুষটার ক্ষতি করে না, বরং তার বিপদে নিজের সবকিছু ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

“মাইক, আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে চাই, কিন্তু আমার এই অভিশপ্ত জীবনের শেষ কোথায় তুমি বলতে পারো ? কোন পাপে আমি আমার মা কে হারালাম ? কেন আজ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে একবার বলো না প্লিজ।"

"সবকিছুকে কেন নেগেটিভ ওয়েতে দেখছো বলতো, আমি তো বলতে পারি, ''বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়/ দুঃখ তাপে ব্যথিতচিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা, দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।" চমকে উঠি আমি। এতদিন পর্যন্ত মাইক আমার সাথে কখনো শুদ্ধ ইংরেজিতে, কখনো বা বাংলায় কথা বলে এসেছে। মাঝেমধ্যে দু-একটা ভুলভাল বাংলা বাক্য বলে ব্রিটিশ সুলভ তাচ্ছিল্যে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসেছে, সেই মাইক কবিগুরুর একটা কবিতার লাইন এত নিখুঁত ভাবে কি করে বলতে পারে! তবুও মাইকের মুখে কবিগুরুর কবিতা শুনে আমি যেন মনে খানিকটা জোর পাই, অথবা নিজের বাঙালীয়ানাটাকে জাহির করার একটা প্রবণতা আমার ভিতরে ভর করে।

"সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে, সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা, নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।" মাইকের দিকে চেয়ে আমি ভরাট গলায় আবৃত্তি করি।

"আমি জানি বন্ধু, তোমার খুব হেঁয়ালি মনে হয় আমাকে দেখে, কিন্তু একদিন তুমি তোমার সব হেঁয়ালির উত্তর পেয়ে যাবে, হয়তো সেদিন আমাকে চাইবে সবসময়, তবে আমি সেদিন থাকবো না" সত্যি বলতে এতসব রহস্যময় কথার চাপ আমি আর নিতে পারছিলাম না। বাধ্য হয়ে মাইকের সাথে আলোচনার বিষয়টা পরিবর্তন করি।

হিথরো থেকে ইসরাইলের Ben Gurion Airport গামী বিমান ছাড়ার কথা ছিল রাত দুটোয়। কুয়াশার জন্য বিমানটা প্রায় তিন ঘন্টা বিলম্বে চলবে। কিছুক্ষন আগে একসাথে নৈশভোজ করার পর গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজের জন্য মাইক আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেয়। ইমিগ্রেশন চেকিং ফর্মালিটিস কমপ্লিট হবার পরেও আমাকে বহুক্ষন অপেক্ষা করে থাকতে হবে বিমানের জন্য। আমার পাশেই এক সহযাত্রী ক্যাজুয়াল ভাবে লোকাল একটা ম্যাগাজিনে চোখ বোলাচ্ছিলেন। কোন কারনে সেই সহযাত্রী পরিচিত কারো ডাকে সিট চেঞ্জ করার জন্য উঠে দাঁড়ান। "এক্সকিউজ মি, প্লিজ টেক ইওর ম্যাগাজিন।" পত্রিকাটা উনি সিটে ফেলে যাচ্ছেন দেখে আমি বলি।

“ইটস অলরাইট"

"ক্যান আই রিড দি ম্যাগজিন ফর ফিউ টাইমস ?"

"শিওর, এন্ড ইউ অলসো মে টেক ইট" ওনার কথায় আমি হাতে স্বর্গ পাই।

যাত্রাপথে অপেক্ষার একঘেয়েমি হয়তো এবার খানিকটা কাটবে। পাতলা মাঝারিমানের ম্যাগাজিন। প্রায় পাতায় নানান রকমের প্রসাধনী সামগ্রী তথা হোটেল, ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞাপনে ভরা। পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ এক জায়গায় আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। কি দেখছি আমি ! পাঁচ-ছপাতার একটা আর্টিকেল প্যারানরমাল বিষয়ের উপর লেখা। তারমধ্যে একটা পৃষ্ঠা ছেঁড়া, তবে আশ্চর্য হয়ে যাই লেখকের নামটা দেখে। ডক্টর সমর কুমার গুপ্তা ! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অতিপ্রাকৃত বিজ্ঞানের উপর ওনার পান্ডিত্বকে বিশ্বের কেউ কোনদিন অস্বীকার করতে পারে নি। সেই ডক্তর গুপ্তা প্রায় দশ বছর আগে একবার কোন এক জটিল বিষয়ের উপর রিসার্চের কারণে ইসরায়েলে গিয়ে আর ফিরে

আসেন নি। শোনা যায় ইসরায়েল সরকারের আমন্ত্রণেই তিনি সেদেশে গিয়েছিলেন। এই বিষয় নিয়ে তখন ভারত ও ইসরায়েল দুই দেশের মধ্যে খানিকটা ভুলবোঝাবুঝিও হয়েছিল। কিন্তু মোসাদের দেওয়া বিবৃতি নাকি সেই সময় আমাদের দেশের সরকার মেনে নিতে বাধ্য হয় শেষমেষ। কি লেখা ছিল মোসাদের সেই বিবৃতিতে ? বিদেশ দপ্তরের জনৈক পদস্থ অফিসারের সাথে সুসম্পর্কের কারণে জেনেছিলাম যে তাঁকে নিয়ে মোসাদ শুধুমাত্র তিনটি শব্দ মেল করেছিলো 'Mysterious supernatural disappearance,' এমনকি মোসাদ নাকি ভারতীয় দূতাবাসকে এমন কথাও বলেছিল যে যদি R.A.W. সেদেশে গিয়ে এই বিষয়ে তদন্ত করতে চায় তাহলে সেদেশের সরকার তাঁদের এই বিষয়ে সাহায্য করতে সম্পূর্নভাবে রাজি আছে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে ভারত সরকার এই নিয়ে সেদেশে কোন তদন্তকারী দল পাঠায় নি, কিন্তু কেন ? সেটা আজও অনেকের কাছেই প্রশ্ন।

একমনে আমি পড়ে ফেলি ইংরেজি ভাষায় লেখা সেই আর্টিকেলটা যার গুরুত্বপূর্ণ অংশের বঙ্গানুবাদ করলে তার সারাংশ দাঁড়ায় :- ভ্যাম্পায়ার ও ওয়ারউলফ দুই ভয়ঙ্কর প্রজাতিকে নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। অনেকে মনে করেন উহারা প্রায় একই প্রজাতিভুক্ত। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ আব্রাহামিক ধর্মগুলোর মতে শয়তান এমন এক সত্তা যা মানুষকে পাপ ও মিথ্যেবাদে বিভ্রান্ত করে। খ্রিস্টিয় ও ইসলামীয় মতে তাকে পতিত দেবদুত বা জীন বলে মনে করা হয়, যিনি মহান ব্যাক্তি ও সৌন্দর্য অর্জন করতেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। Apocryphal Book of Jubilees গ্রন্থে লেখা আছে লাল ড্রাগন হিসেবে আত্মপ্রকাশিত শয়তান মহাযাজক মাইকেলের দ্বারা পরাজিত হয় ও স্বর্গ থেকে এক আগুনের লেকের মধ্যে নিক্ষেপিত হয়... এর পরের পৃষ্ঠাটা না থাকায় বিষয়টা অজানাই রয়ে যায়।

এর ঠিক পরে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন শয়তানকে কখনোই বিনাশ করা সম্ভব নয়, ঈশ্বর যেমন দেবদূতদের মধ্য দিয়ে মানুষকে কল্যাণের বার্তা দিতে চেয়েছেন, ঠিক তেমনটাই শয়তানও একই ভাবে ভ্যাম্পায়ারকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন পৃথিবীকে অভিশপ্ত করে তুলতে। কিন্তু ঈশ্বর কখনো পবিত্র এঞ্জেলদের দ্বারা ভাম্পায়ারকে বিনাশ করতে চান নি, কারণ তাহলে তাঁদের পঙ্কে নামতে হতো। দেবদূতদের

সেকারণে তিনি সেই অনুমতি প্রদান করেন নি বরং ঈশ্বর তাঁর কাছে অভিশাপপ্রাপ্ত কিছু মর্ত্যবাসীর দ্বারা শয়তানের দাস ভাম্পায়ারকে ধ্বংস করতে মনস্থির করেন। যাঁরা ঈশ্বরের নিকট অভিশাপপ্রাপ্ত হলেও কোনভাবেই শয়তানের দাসে পরিণত হয় নি, এদেরকেই বলা হয় ওয়ারউলফ। ঈশ্বর জানতেন এদের দ্বারা মর্তবাসীর কখনো কখনো ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু পরম শক্তিমানের এই বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনের জন্য এই সামান্য ক্ষতি মর্তবাসীকে কোনভাবেই বিব্রত করতে পারবে না। তিনি ওয়ারউলফ এর দেখভাল করার জন্য চন্দ্রের দেবী Selene কে আদেশ করেন, সে কারণে পূর্ণিমার রাতে ওয়ারউলফ সবচাইতে বেশি শক্তি অর্জন করে। তবু ওয়ার-উলফ একবার দেবী Selene এর রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। তখন দেবী Selene তাদের এই অভিশাপ দেন যে এই রৌপ্যের কাছেই ওয়ারউলফের সব শক্তি খর্ব হয়ে যাবে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কারোর শরীরে রৌপ্য নির্মিত গহনা থাকলে ওয়ার-উলফ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

আর্টিকেলের আরেক জায়গায় বলা হয়েছে যে আমরা জানি ভ্যাম্পায়ার ও ওয়ার-উলফ দুই প্রজাতিই ভীষণ রকম হিংস্র, কিন্তু সেই হিংস্রতার মধ্যে অনেক তফাত আছে। ভ্যাম্পায়ারের মধ্যে কোনরকম দয়ামায়ার চিহ্ন মাত্র থাকে না। তারা শুধুই শয়তানের রক্তললুপ অনুচর ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু ওরার উলফের মধ্যে ঠিক মানুষের মতোই দয়া মায়া, ভালোবাসা সব অনুভূতিগুলোই বর্তমান। শত্রুর ক্ষতিসাধন করতে তারা যতটা নিষ্ঠুর, ঠিক ততখানি বন্ধুবৎসল তারা প্রিয়জনকে রক্ষা করতে। আর্টিকেলের এই জায়গাটা রঙ্গিন কালিতে আন্ডারলাইন করা। কিন্তু কেন ? তা কে বলতে পারে!

আর্টিকেলটা একমনে পড়তে পড়তে বিমানের পথে পা বারবার সময় হয়ে যাওয়ায় আমি কার্গো প্যান্টের পিছনের পকেটে ম্যাগাজিনটা রোল করে ঢুকিয়ে রাখি। যদিও বিমানে ওঠার পর প্যান্টের প্রতিটা পকেট তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমি আর ম্যাগাজিনতার হদিস পাই নি। পকেটের ভিতর থেকে কোথায় উবে গেলো ম্যাগাজিনটা ? সেই রহস্যের উত্তর জীবনে আমি আর পাই নি।

ক্লান্তি আমাকে এতটাই গ্রাস করে ফেলেছিল যে বিমানে ওঠার পর আমার আর এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকাটা সম্ভবপর ছিল না। তার

উপর আমার জন্য নির্ধারিত টিকিট বিলাসবহুল একজিকিউটিভ ক্লাসে হওয়ায় আমি এরার হোস্টেসদের ওয়েলকাম ড্রিংক্স ও স্নাক্সগুলোকেও ডিনাই করি, তারপর সিট বাটন প্রেস করে সেটাকে যতখানি সম্ভব এলিয়ে দিয়ে ঘুমের জগতে পাড়ি দিই। এই বিমান যাত্রাপথে কোন এক বিমানবন্দরে থেমেছিল এটুকু শুধু মনে আছে, তবু প্রায় চারঘন্টায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে একবার ইউরিনালে যাওয়া ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণ যাত্রাপথটা ঘুমিয়ে কাটাই আমি। বিমান গন্তব্যে পৌঁছে গেলে সুন্দরী এরার হোস্টেসদের ডাকে আমার ঘুম ভাঙ্গে। আমার নতুন মোবাইলে তখন বিরামহীন ভাবে ম্যাসেজ ঢুকেই চলেছে। এয়ারপোর্টে নেমে আমি আমার লাগেজ বুঝে নিয়ে ম্যাসেজ চেক করতে শুরু করি। "Hi Indra, Welcome to Ben Gurion Airport after your happy journey." প্রথমে বেশ কয়েকটা ম্যাসেজ জুড়ে শুধু ফর্মালিটিস। অবশেষে কিছু কাজের কথা বলা আছে। এয়ারপোর্টের বাইরে এসে আমাকে যেই গাড়িতে উঠতে হবে তার নাম্বার, গাড়ির কালার, গাড়িটা ঠিক কোথায় পার্কিং করা আছে, সেই বিষয়গুলো, একটা ম্যাসেজে বিস্তারিতভাবে বলা আছে। তারপর একসময় সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তগুলোর মুখোমুখি হই আমি, যেই মুহূর্তগুলো আমার জীবনের সবচাইতে অভিশপ্ত সময় হয়ে ছিল বহুদিন পর্যন্ত। পারেপারে হেটে আমি পৌঁছে যাই সেই নির্দিষ্ট গাড়ির সামনে।

"আর ইউ ইন্দ্রনীল ?” আমাকে গাড়ির সামনে আসতে দেখে আমার সমবয়স্ক এক যুবক দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আমাকে প্রশ্ন করে। আমি সম্মতি জানাবার পর তিনি ইশারায় আমাকে গাড়িতে উঠতে বলেন আট সিটের গাড়ি, গাড়িতে ড্রাইভার, ওই ব্যক্তি ছাড়াও আরও দুজন অপেক্ষা করেছিলেন আমার জন্য। আমি গাড়িতে ওঠার পর গাড়ির A.C.চালিয়ে জানলার নিকষ কালো কাঁচগুলো তুলে দেন গাড়ির চালক। মুহূর্তের মধ্যেই গাড়ি ছুটতে শুরু করে।

“সরি ডোন্ট মাইন্ড, এই মুহূর্তে আপনার চোখ বেঁধে দেওয়া ছাড়া সত্যি আমাদের কিছু করার নেই" গাড়ির ভিতরে আরেক ব্যক্তি বলেন। আমি সম্মতি দেবার পর তারা আমার চোখ দুটো একটা রুমাল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়ে তাদের অনুমতি ছাড়া সেটা না খোলার জন্য অনুরোধ করে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে বুঝতে পারি সেটা বেশ দ্রুতগতিতেই চলছে, অবশেষে...।

।। বিভীষিকা যখন মোসাদ।।

প্রায় আধ ঘণ্টার যাত্রাপথ পেরিয়ে কোন এক স্থানে গাড়ি এসে মৃদু ঝাকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আমাকে একই ভাবে চোখদুটো বন্ধ রাখতে বলে গাড়ির এক সহযাত্রী আমার চোখের রুমাল খুলে বিশেষ একধরনের চশমা পরিয়ে দেয়। এই চশমার থেকে বাইরের সামান্য ঝাপসা আলো ছাড়া অন্য কিছু বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এরপর এক ব্যক্তি আমাকে একটা লিফ্টে এনে তোলে। স্থানটা অস্বাভাবিক রকম নীরব। বেশ কয়েক সেকেন্ড পর লিফ্ট থামলে সে একই ভাবে আমাকে লিফ্টের থেকে নামিয়ে হাঁটাতে থাকে। সম্ভবত এখানকার মেঝেটা দামি টাইলসে নির্মিত। সেকারণে হাঁটতে গিয়ে বারবার আমার পা পিছলে যাচ্ছিল। আমার পথপ্রদর্শক তা বুঝে হাঁটার গতি খানিকটা ধীর করে। আমরা কোন এক কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করি। সেই মানুষটা আমাকে এক বিলাসবহুল চেয়ারে বসিয়ে অবশেষে আমার চোখের থেকে চশমাটা খুলে দেয়। এটা বোধ হয় একটা হলঘর। চারিদিকে অন্ধকার, তারমধ্যে থেকে চারটি জোরালো স্পটলাইট আমার মুখমন্ডলে এসে পড়েছে। সারা ঘরে মৃদু একটা গন্ধের মাদকতায় যেন মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে ওঠে। কিসের গন্ধ এটা ? গন্ধটা সামান্য হলেও চেনা মনে হয় আমার। বড় হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে বোধ হয় এরকম একটা গন্ধ পাওয়া যায়, আচ্ছা এটা ইথারের গন্ধ নয় তো ? তবে গন্ধটা ঠিক এতটাই মৃদু, যা আমার চেতনাশক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে বিনাশ করার জন্য হয়তো যথেষ্ট নয়। কোথা থেকে মৃদু একটা আওয়াজ শুনতে পাই। অন্ধকারের মধ্যে এক ব্যক্তি আমার মাথায় একটা হেডফোন লাগিয়ে চেয়ারের সিটবেল্ট গুলো শক্ত করে আটকে দিয়ে যায়। কাউকেই আমি দেখতে পাচ্ছি না, তবু কেন জানি মনে হয়, বড় নিষ্ঠুর এরা, মানবতার লেশমাত্র এদের ভিতরে নেই।

"আপনি কি তৈরী মিস্টার ইন্দ্রনীল ? তাহলে আমরা আমাদের প্রশ্নগুলো শুরু করতে পারি।" সম্ভবত কাঁচের দেয়ালের বাইরে থেকে ঝকঝকে ইংরাজিতে আমার কাছে জানতে চায় জনৈক প্রশ্নকর্তা।

"সিওর" আমি সম্মতি জানাই।

"আপনি কোন দেশের স্পাই হয়ে এখানে প্রবেশ করেছেন ?"

"আমি কোন দেশের স্পাই নই, আমি একজন আইনজীবী, ইন্ডিয়ার

অন্তর্গত কোলকাতা মেট্রোপলিটন সিটিতে আমি বাস করি।” মাইকের কথাগুলো হঠাৎ আমার মনে পড়ে যায়। নিজের স্নায়ুকে যতখানি সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রেখে আমি উত্তর দিই।

“ভেরি ফাইন, তাহলে আপনি এদেশে কি কারণে আসার আগ্রহ দেখালেন ?”

“একটা পুরাতাত্বিক রহস্যের সমাধানের জন্য আমি এদেশে আসতে চেয়েছিলাম।"

“ইতালি বা ইংলন্ডে ও কি আপনি এই ধরণের কোন কাজের জন্য গিয়েছিলেন মিস্টার ইন্দ্রনীল ?"

"ইতালিতে আমি গিয়েছিলাম একটা আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখতে, আর ইংলন্ডে গিয়েছিলাম একজন ঐতিহাসিকের সাথে দেখা করতে।"

“কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে ইতালি ও ইংল্যান্ড থেকে আপনি কিছু হিস্টোরিক্যাল এ্যান্টিক মেটিরিয়াল চুরি করে এনেছেন। আপনি আন্তর্জাতিক স্মাগলিং চক্রের সাথে যুক্ত।" প্রশ্নকর্তার কথার তীব্র প্রতিবাদ জানাই আমি। আমার গলার আওয়াজটা হয়তো খানিকটা উচ্চ লেগেছিল প্রশ্নকর্তাদের।

"আপনি দয়া করে আমাদের সাথে গলা নামিয়ে কথা বলুন" শীতল স্বরে আমাকে সমঝে দেয় জনৈক প্রশ্নকর্তা"

"আপনি কিন্তু আমাদের কথার সঠিক উত্তর না দিয়ে অনেক কিছু এড়িয়ে যাচ্ছেন।"

"আপনি যেই চেয়ারে বসে আছেন, তার সাথে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ করা আছে। আমরা আর ঠিক দশ মিনিট আপনাকে ওয়াচ করব, তারপর ছোট্ট একটা বোতাম প্রেস করব। তার ঠিক দশ মিনিট পর আপনার দেহটা একটা সুন্দর কফিনের মধ্যে শোভা পাবে" হাড়হিম করা একের পর এক সতর্কবার্তা ধেয়ে আসে আমার দিকে, চমকে উঠি আমি।

"এখনো সময় আছে ইন্দ্রনীল, আমাদের সবকিছু ক্লিয়ার করে বলুন, আপনি যে স্পাই হিসেবে এদেশে প্রবেশ করেছেন সেটা আমাদের কাছে স্বীকার করে নিলে বড়োজোর আপনার পাঁচ বছরের জেল হবে, আর সেটা না করলে কি হবে দেখবেন ? এ কথার আমি কোন উত্তর দিই না। হঠাৎ আমার চেয়ারটা খানিকটা রিভলভ করে, আমার

মুখের উপর স্পটলাইটের আলোগুলো ক্ষনিকের জন্য মৃদু হয়ে আসে। আমার সামনে প্রজেক্টারে ভেসে ওঠে একের পর এক ফাঁসিতে লটকানো মানুষের মুখ। "মিস্টার ইন্দ্রনীল, এখানে যাদের ছবিগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তাদের সকলেই হয় কোন দেশের স্পাই, নাহলে স্মাগলিং এর জন্য এদেশে প্রবেশ করেছিলেন। এখনো সময় আছে, আপনি সবকিছু আমাদের ক্লিয়ার করে বলুন।" ভয়ের হিমেল স্রোত আমার সারা শরীরে বইতে শুরু করলেও আমি নিজেকে যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করি।

"হ্যাঁ, অবশ্যই আপনারা আমাকে হত্যা করতে পারেন। তবে মোসাদের মত এক শক্তিশালী ডিকেটিভ ডিপার্টমেন্ট সম্পূর্ণ কল্পনার ভিত্তিতে একজন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করতে পারে, এই ধারনাটা সত্যি আমার ছিল না। আমি হলপ করে বলতে পারি কিছু পুরাতাত্ত্বিক রহস্যের উত্তর খোঁজা ছাড়া এদেশে পা রাখার পিছনে আমার দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নেই।"

এখানে আসার পর থেকে সময় বোঝার কোন সুযোগ আমার ছিল না, তবু বুঝতে পারি বেশ কয়েকঘন্টা ধরে চলে তাদের এই প্রশ্নপর্ব। "মিস্টার ইন্দ্রনীল, যেই এডভেঞ্চার এন্ড ডিস্কভারির লোভে আপনি এদেশে পা রেখেছেন আপনি কি জানেন তাতে আপনার কতখানি বিপদের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে? আমরা আপনাকে অনুরোধ করব আপনি দেশে ফিরে যান" আমার উত্তরে সম্ভবত খানিকটা সন্তুষ্ট হয়ে এই প্রথম বন্ধুত্বপূর্ন ভাবে আমার সাথে কথা বলেন ওদের একজন।

"সরি স্যার, সুলেমানি গুপ্তধনের হদিস আবিষ্কার করার আগে আমি দেশে ফিরে যেতে চাই না, সেই সাথে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর আমি নিয়ে যেতে চাই এদেশ থেকে।"

"কি সেই প্রশ্ন ?"

"রিসার্চের কাজে এদেশে এসে মিস্টার সমর কুমার গুপ্তা কোথায় হারিয়ে গেলেন ? কেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া নিয়ে এদেশের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্টকে জাস্ট তিনটি শব্দের একটা মেল পাঠালো...'Mysterious supernatural disappearance,' মোসাদের মতো শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থার কাছে বিষয়টিকে কেন 'Mysterious supernatural' বলে মনে হয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরটাও আমি জানতে চাই' কিছুক্ষন নীরব প্রশ্নকর্তারা। আমার ভিতরে আবার ভয়টা

বাড়তে শুরু করেছে। সোজাসাপ্টা এই কথাগুলো আমার পক্ষে আবার বিপদজনক হয়ে দাঁড়াবে না তো! হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে রক্ষা কর।

"মিস্টার ইন্দ্রনীল, আপনি হয়তো এই মুহূর্তে ক্লান্ত। লাঞ্চ সেরে আপনি বিশ্রাম করুন, আজ সন্ধ্যায় আপনাকে নিয়ে আমাদের উচ্চপর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তারপর আপনাকে আমাদের পরবর্তী চিন্তাভাবনা জানাতে পারব।"

ধীরেধীরে আমার মুখের উপর এসে পরা স্পটলাইট গুলো অফ হয়ে ঘরের আলোগুলো জ্বলে ওঠে। কিন্তু এতক্ষন চোখের উপর পরা স্পটলাইটের প্রভাবে কোন কিছুই আমি সঠিক ভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না, চোখের ভিতরে একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছে। আমি কিছুক্ষণের জন্য দুচোখ বন্ধ করি। প্রশ্নকর্তা ও আমার মাঝের কাঁচের দেয়ালটা উঠে যায়, প্রশ্নকর্তারা প্রত্যেকে এসে আমার সাথে করমর্দন করেন।

"সরি মিস্টার ইন্দ্রনীল, আপনাকে এতখানি কষ্ট দিতে হবার জন্য। ভাল থাকবেন, আবার দেখা হবে।" বিদায় নেবার আগে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন জনৈক প্রশ্নকর্তা।

প্রশ্নকর্তারা চলে যাবার আগে হাতের ইশারায় আমাকে এই ঘরে বসতে বলেন। ধীরে ধীরে চোখ ঘরের আলোর সাথে মানিয়ে নেয়। বিশাল হলঘর। চারিদিকে নানা ধরণের যন্ত্রপাতি। আমার সামনের দেয়ালে রাখা জায়ান্ট স্ক্রিনে আমার মুখটা ভেসে উঠেছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকি আমি। ঘড়ির সময় শো করছে বেলা তিনটের কিছু বেশি। এভাবে আরো আধা ঘন্টা খানিক কেটে যায়। অবশেষে ডোর ক্লোজারে মৃদু একটা আওয়াজ শোনা যায়। বাইরে থেকে দরজা ঠেলে এক মহিলা ঘরে প্রবেশ করে। সুটেড বুটেড, স্মার্ট এবং সেই সাথে সুন্দরী ও বলা যায়। বয়সে আমার থেকে খানিকটা ছোট বলেই মনে হয়, আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসে মেয়েটি। "স্যার, আপনার রুম রেডি, আমার সাথে আসুন, সকাল থেকে তো কিছু খাওয়া দাওয়া হয় নি আপনার" চমকে যাই ওর কথায়, পরিস্কার বাংলায় কথা বলছে সে।

"আপনি বাঙালি ?"

“না স্যার, আমি ব্রিটিশ, আমার নাম সারা। আসলে আমি বেশ কয়েকটা ভাষা জানি, বাংলাও তার মধ্যে একটা। আসুন দাদা আমার সাথে।"

দাদা ! মুগ্ধ হই মেয়েটার কথায়। বাঙালিরা যখন এরাজ্যের বাইরে

কোথাও যায়, তখন এই 'দাদা' বা 'দিদি' ডাকটা তাদের মনে কি অপার্থিব আনন্দ এনে দেয় তা বলে বোঝাবার দরকার নেই, সেখানে এরকম বিদেশবিভুঁই এ বড় আপন লাগে সত্যি বলতে সারার কথাগুলো। ওর সাথে আমি বিশাল এক লন ধরে এগিয়ে চলি। এখানে আসার সময় স্থানটাকে যতখানি ঝাঁ চকচকে বলে আশা করেছিলাম বস্তুত জায়গাটা ঠিক ততখানি নয়। মাথার উপর ফলস সিলিং এর ফ্রেম জায়গায় জায়গায় ভেঙে ঝুলে পড়েছে, লনের বাম দিকের ব্যালকনি কালো কাঁচে ঢাকা। ডানদিকে একের পর এক বিশাল বিশাল বন্ধ দরজা। বহুদিন পেইন্ট না হওয়ায় প্লাস্টিক কোটিং এর ভিতর থেকে প্যারিস উঁকি মারছে স্থানে স্থানে। ছাদ সংলগ্ন ভেন্টিলেটরের বাইরে থেকে এক নাগাড়ে পাখির ডাক ভেসে আসছে মাঝেমধ্যে। টবে অর্ধমৃত কিছু পাতাবাহার গাছ। সারার সাথে এতবড় একটা লন পেরোবার মধ্যে তৃতীয় কোন জনপ্রাণীর হদিস পেলাম না। লনের একপাশে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচের ফ্লোরে নেমে আসি আমরা। এই ফ্লোরের ঘরগুলোও উপরের মতোই, তিনটে দরজা পার হয়ে চতুর্থ দরজাটা টেনে খুলে ফেলে সারা, প্রায় দশ ফুট উচ্চতার কাঠের শার্শি দরজা, সারার সাথে আমি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করি।

"বিল্ডিংটা অনেক পুরানো তাই না ?"

"সম্ভবত ১৯৩০ সলে এই বিল্ডিংটা তৈরী হয়েছিল" সারা জানায়।

বিশাল হলঘর, তার মাঝে একটা মাঝারি উচ্চতার ক্যাম্প খাট পাতা। ঘরের জানালাগুলো সব বন্ধ। ছাদের থেকে বিশাল বিশাল ধাতব রডের সাথে ঝোলানো বেশ কয়েকটা পাখা। এতবড় ঘরের চারিদিকে মাত্র দুইখানা বৈদ্যুতিক আলো তাও তার ঔজ্জ্বল্য বেশি না, কাজেই ঘরের পরিবেশটা এককথায় আলোআঁধারী বলা চলে। ঘরের একপাশে এটাচ্ড বাথ। বহুক্ষন বাথরুমে যাবার জন্য আমি ছটফট করছিলাম, সারার অনুমতি নিয়ে আমি বাথরুমে ঢুকি। বাথরুমটাও আকারে আমাদের সাধারণ ১২ X ১০ মাপের ঘরের থেকেও অনেকটাই বড়। আজ ঠান্ডাটা বড় বেশি বলে স্নান করার আবশ্যক ছিল না, অবশেষে হাতমুখ ধুয়ে আমি বেরিয়ে আসি।

"একটু পানীয় জল পাওয়া যাবে ?" আমার কথায় সারা ওর ব্যাগ থেকে একটা জলের বোতল ও শুকনো খাবারের প্যাকেট আমার হাতে দেয়।

“দাদা, আজ আপনাকে এখানে থাকতে হবে, আমি চলে যাবার পর দরজার হ্যাসবোল্ট বন্ধ করে রাখবেন, কোন অবস্থায় ভুলেও ঘরের বাইরে যাবেন না।”

“এখানে কি আর কোন লোকজন থাকে না ?"

"বেসমেন্টে সিকিউরিটির লোকজন থাকেন, তবে তাদের উপরে আসার অনুমতি নেই, কাজেই আমি চলে যাবার পর এই সাততলা বিল্ডিং এ ইউ আর দি আনলিয়েস্ট পারসন।"

"ওহ,” সারার কথায় একটু চমকে উঠি।

“ভয় পেলেন দাদা ? দেবী Angitia কে স্মরণ করুন, কোন বিপদ আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না, চলি বাই।"

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সারা। ওর কথামত বিশাল দরজাটা-র হ্যাসবোল্ট ভিতর থেকে আটকে দিই। সাততলা এত বড় এই সুপ্রাচীন রহস্যময় অট্টালিকায় আমি একমাত্র প্রাণী, জানি না ঈশ্বর আর কতো বিপদের মধ্যে আমাকে ফেলবেন। তবু এই ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজের মধ্যে একটা জেদ চেপে গেছে আমার। এর শেষ কোথায় আমাকে জানতেই হবে। আমি ক্যাম্প খাটে বসে বোতল থেকে বেশ কয়েক ঢোক জলপান করি, তারপর খাবারগুলোর দিকে নজর দিই। এর মধ্যে ছিল এক প্যাকেট Bamba. এটা মূলত চিনাবাদাম আর puffed corn দিয়ে তৈরী মুচমুচে একধরণের স্নাক্স, সেই সাথে এক প্যাকেট ক্রোমো। ক্রোমো চকলেট ও ক্রিমের সংমিশ্রণে তৈরি এক ধরনের মিষ্টি খাবার। সত্যি বলতে দারুন লাগে আমার ওটা খেয়ে। সারার সাথে আসার আগে আমার লাগেজগুলো কেউ এই রুমে পৌঁছে দিয়ে গেছে। আমি সেগুলোকে ক্যাম্প খাটের কাছে টেনে নিয়ে একটা চাদর বের করে গায়ে টেনে শুয়ে পড়ি। যদিও আলোর মধ্যে আমার ঘুম আসতে চায় না, তবু এই রহস্যজনক ঘরে আলো অফ করে শোবার মত সাহস আমার অবশিষ্ট ছিল না।

কতক্ষন ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ যেন মনে হয় সারা ঘরটা দুলছে। দরজার কাঠের ফ্রেম, ছাদের করি বার্গগুলো কাঁপছে ভীষণভাবে। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি ! ছাদের থেকে খানিকটা প্যালেস্তরা খসে পড়ে। প্রাণভয়ে আমি সারার নিষেধ অগ্রাহ্য করে ঘরের দরজাটা খুলে ফেলি। ভূমিকম্পের হাত থেকে তো সবার আগে বাঁচি। ঠিক তখন ই... কি এটা? ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে নিকষ কালো একটা প্রাণী এঘরে

প্রবেশ করে। দরজা দিয়ে ওটা ঘরে ঢোকার সময় আমি প্রাণভয়ে খানিকটা পিছিয়ে আসি। এবার বেশ বুঝতে পারি প্রাণীটার লক্ষ আমিই, তবে এটাই কি ভ্যাম্পায়ার? শয়তানের অনুগত দাস। প্রাণীটা যে আমার দিকেই উড়ে আসছে, বাধ্য হয়ে আমি আমার ব্যাগটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরি। হঠাৎ! কি দেখছি আমি! আমার হাতে ধরা ব্যাগটা অসম্ভব রকম দুলছে। ব্যাগের চেনের ফাঁক থেকে কিছু একটা মাথা বাড়াচ্ছে, কি ওটা ! আবছা আলোয় বুঝতে পারি সাংঘাতিক একটা বিষধর ভাইপার আমার ব্যাগের ভিতর থেকে মেঝেতে লাফ মেরে পড়েছে। প্রাণপনে সে ছোবল মারতে চাইছে সেই বাদুড়টাকে, ঠিক তখনই দপদপ করতে করতে ঘরের আলোগুলো বন্ধ হয়ে যায়। সত্যি বলতে আমি ভীতু নই, তবু এই মানসিক চাপ নিতে না পেরে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি।

যখন আমার চেতনা ফেরে তখন সকাল হয়ে গেছে। একজন বলিষ্ঠকায় পুরুষ দাঁড়িয়ে আমার সামনে "সরি মিস্টার ইন্দ্রনীল, আপনার কালকের উত্তরে অমরা সন্তুষ্ট হতে পারি নি, তাই বাধ্য হয়ে শত্রুদেশের চর হিসেবে আজ রাত আটটায় আপনাকে আমরা ফাঁসিতে ঝোলাব"।

আমি চমকে উঠি মানুষটার কথায়, হয়তো এতখানি মানসিক চাপের পর আমারও বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা দিনেদিনে হারিয়ে গিয়েছিল তাই মৃদু হাসি আমি, হয়তো বা মাইক অথবা দেবী Angitia-র প্রতি অভিমানেও! যারা আমাকে বাঁচতে দিতে চাইল না, তারা সুখী হোক আমার ফাঁসী কাঠে ঝুলে পড়া নিথর দেহটা দেখে।

"ওকে, আমি তৈরী। আপনার ফাঁসুড়ে যদি তৈরী থাকে, তাহলে এই মুহূর্তে আমি মরতে প্রস্তুত। একরাশ ঘৃণা, তাচ্ছিল্য নিয়ে মানুষটার চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলি।

অবশেষে লোকটা আমার চোখের উপর একটা কাপড় বেঁধে দেয়। ওর হাত ধরে আমি চলি আমার মৃত্যু কক্ষে। লোকটা আমার চোখের বাঁধন খুলে দেবার পর বুঝতে পারি এটা একটা কনডেম্ড সেল। বড়জোর ৫X৭ বর্গফুটের একটা ঘর, তারমধ্যে ছোট্ট একটা টয়লেট। আমার জন্য বেশ কিছু খাবার রাখা ছিল এখানে, কিন্তু সবার প্রতি ঘৃনা আমার এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল, যে খাবারগুলো মুখে দেবার মত নূন্যতম রুচি আমার অবশিষ্ট ছিল না। ফাঁসির দড়ি গলায় চেপে বসার পর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ না করে কত স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি, সেটাই ছিল আমার একমাত্র স্বপ্ন,...

হায় রে নিয়তি।

জেলের ভিতর পেন্ডুলাম দোলানো একটা ঘড়ি আমার মৃত্যু পরোয়ানার বার্তা বয়ে নিয়ে চলেছে। সময়টা বড় তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে আজকে, অবশেষে ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা। অচেনা একজন মানুষ একপ্রস্থ নতুন পোশাক নিয়ে আমার সেলে প্রবেশ করে।

"স্যার, আপনি স্নান করে এগুলো পড়ে নিন, আর ঠিক আধঘন্টার মধ্যে আমরা আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাব।" আমি বিনা বাক্যব্যয়ে অর্ধনগ্ন হয়ে স্নান সেরে পোশাকগুলো পড়ে নিই। "দেখুন তো কেমন মানিয়েছে আমাকে ?" প্রবল ব্যঙ্গের সাথেই আমি কথাগুলো বলি।

"স্যার, আমাকে ক্ষমা করবেন, একটা কথা বলবো ?"

"ক্ষমা" তীব্র শ্লেষে হাসতে থাকি আমি, হয়তো খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে যায় সেই ব্যক্তি "হ্যাঁ, বলুন, কি বলতে চান।"

"সারাদিন তো আপনি কিছুই খেলেন না, আমাদের উপর কেন অকারণে রাগ করছেন? আমরা তো শুধু আমাদের কর্তব্যই করতে এসেছি, আর... আপনার মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছেটা যদি একটু বলেন।"

"যেই খিরবেত কুমরানের রহস্যভেদ করতে গিয়ে আজ আমাকে মরতে হচ্ছে, মরার আগে সেই জায়গাটা একবার দেখতে চাই, হ্যাঁ আমি জানি, এই সামান্য সময়ের মধ্যে সেখান থেকে আমাকে আপনারা ঘুরিয়ে আনতে পারবেন না, কিন্তু নিদেন পক্ষে জায়গাটার কোনো ফটো বা ভিডিও... কি অফিসার, আপনাদের মোমের প্রলেপ দেওয়া দাড়িটা গলায় পরার আগে কি খুব বেশি কিছু চেয়ে ফেললাম আপনাদের কাছে ?"

"সিওর, সময় হলে ঠিকই দেখতে পারবেন। এখন না হয় শুধু ফাঁসিকাঠটাকেই দেখুন"

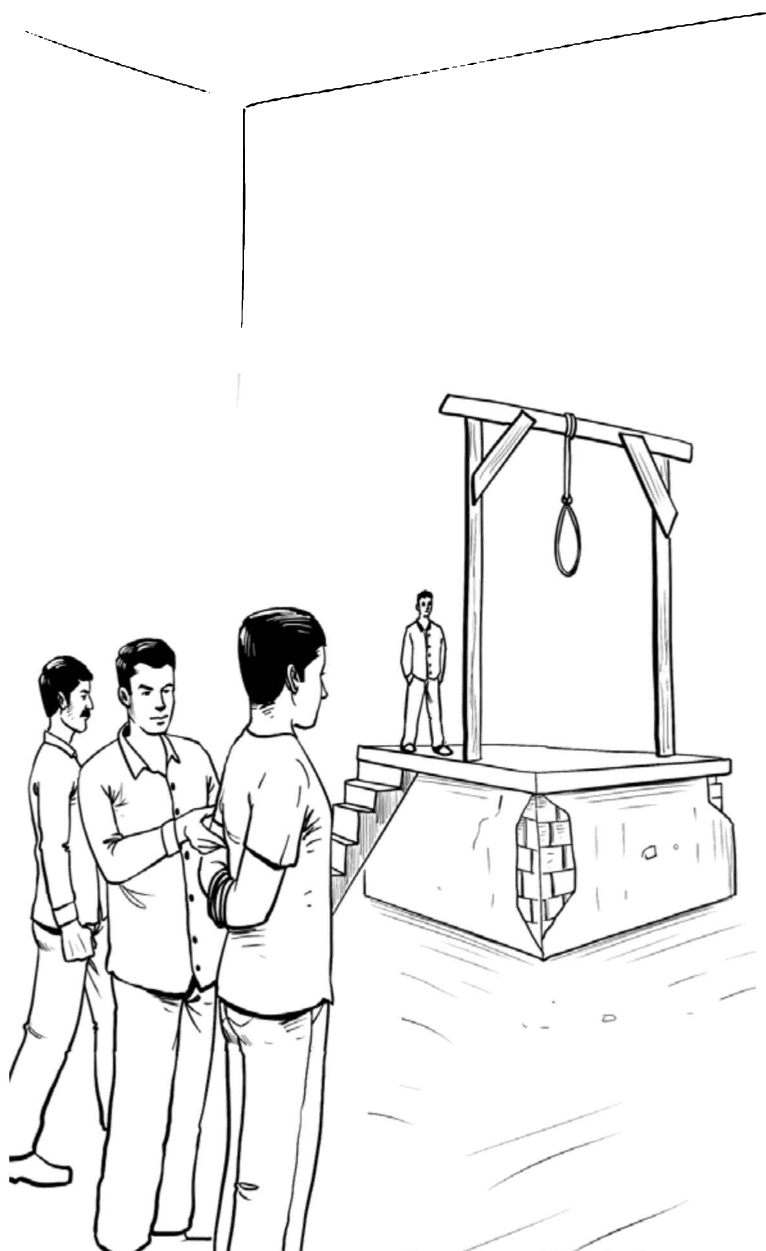
আমার কথায় একটা বাঁকা হাসি ছড়িয়ে পড়ে মানুষটার চোখেমুখে। কিন্তু কেন? ঘড়ির কাঁটায় এখন আটটা বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিট বাকি। দুজন মানুষ আমার দুটো হাত ধরে নিয়ে চলেছে ফাঁসিকাঠের দিকে, হাতদুটো পিচমড়া করে বাঁধা, ফাঁসিকাঠটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমার ভিতরে কোনরকম ভয়, জড়তা অবশিষ্ট নেই। আমি এগিয়ে চলেছি ফাঁসিকাঠের দিকে, আর তখনই অজানা একটা ডাকে পিছন ফিরে তাকাই আমি।

"ইন্দ্রনীল, এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে আমরা আপনাকে সিলেক্ট করলাম, সত্যি বলতে আপনার তরফ থেকে যখন এ দেশে সুলেমানি গুপ্তধনের

সন্ধানে আসার জন্য আগ্রহ দেখানো হয়েছিল তার পরেই আপনার সম্বন্ধে সব তথ্য আমাদের কাছে চলে আসে, আর কাল সকাল থেকে আপনার সাথে যা যা হয়েছে, তার সম্পূর্ণটাই ছিলো এক বৃহৎ কাউন্সেলিংয়ের অঙ্গ, আর সেখানে আপনি খুব সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই আমার বিশ্বাস খিরবেত কুমরানের গুপ্তধনের হদিস আপনি আমাদের দিতে পারবেন।"

"স্যার, আপনার পরিচয়টা যদি..." আমি চমকে যাই মানুষটার কথা শুনে! আমাকে ফাঁসিকাঠের দিকে নিয়ে আসা মানুষ দুজন তখন মৃদু হেসে আমার হাতের বাঁধন গুলো খুলে দিয়েছে।

"আমি বর্তমানে মোসাদের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। আমার নাম Efraim Halevy। আজ রাতে এই বিষয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা দুজন একসাথে নৈশভোজে মিলিত হব।"



দুজন মানুষ আমার দুটো হাত ধরে নিয়ে চলেছে ফাঁসিকাঠের দিকে।

।। মোসাদের সাথে পথ চলা।।

মৃদু হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেন Efraim Halevy। বয়স ওনার ষাটের কিছু বেশি হবে। লম্বা মেদহীন ছিপছিপে চেহারা, মাথায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো লুপ্তপ্রায় রুপালি কিছু চুল। চারকোনা রোলগোল্ডের চশমার ভিতরে ধূসর চোখদুটোয় অপরিসীম এক ব্যক্তিত্ব বিরাজ করছে। প্রত্যুত্তরে আমি ডানহাতটা বাড়িয়ে দিই।

'আমি আপনার সাফল্য কামনা করি।" তাঁর নরম হাতটা দিয়ে আমার হাতটাকে চেপে ধরে বলেন তিনি। "আপনি ড্রেস করে নিন, এখান থেকে আমরা এক সাথেই বেরোব।"

তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে আমি স্বাচ্ছন্দবোধ করছিলাম না, সম্ভবত সেটা বুঝতে পেরেই স্নেহসুলভ একটা চাহুনিতে তিনি আমার দিকে তাকান।

আমার জন্য নতুন পোশাক নিয়ে এক ব্যক্তি অপেক্ষা করছিল। হ্যালভে স্যারের নির্দেশে সে সেগুলো আমার হাতে দিয়ে আমাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দেয়। এদেশের মাটিতে পা রাখার পর থেকে যেই টেনশনগুলো আমাকে চেপে ধরেছিল সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে আমার নিজেকে অনেকটাই হালকা লাগে। তার উপর মোসাদ আধিকারিকের ব্যবহার আমার মনে দাগ কেটে যায়। সুগন্ধি লিকুইড সোপে গিজারের তলায় ভালো করে স্নান করে পোশাকগুলো আমি পড়ে নিই। শার্ট, শুট-প্যান্ট, জুতো সবগুলোই বেশ দামি ও আরামদায়ক, আর পোশাকগুলো নিখুঁতভাবে আমার মাপেই বানানো। ড্রেস করে এসে আমি ভারতীয় কায়দায় পায়ে হাত রেখে তাঁকে নমস্কার করি। তিনি পরম মমতায় আমার মাথায় হাত রাখেন, তারপর তার সাথে লিফ্টে করে বেরিয়ে আসি "স্যার, আমার লাগেজ গুলো ?" তাঁর সাথে গাড়িতে ওঠার আগে আমি জানতে চাই।

"ওসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, আমাদের লোক ওগুলো আপনার নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে যাবে।"

এখানে আসার পর নিজের চোখে তেল-আভিভ শহরটাকে এই প্রথম দেখলাম, যেই বিল্ডিং এ আমাকে রাখা হয়েছিল সেটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাইরে সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী। রাস্তার চারপাশে স্বল্প ব্যবধানে বিশালাকার সব গাছের সারি। সমুদ্রের ঝড়ো বাতাসে গাছের ডালপাতা একনাগাড়ে দুলছে। এই পথে বাতিস্তম্ভ আশ্চর্যজনক ভাবে

কম। তাই রাস্তাঘাটগুলো অন্ধকারই বলা যায়। নানান আকৃতির পুরানো সব বিল্ডিং এর মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা বিশাল এক বন্ধ দরজার কাছে এসে শেষ হয়েছে। গাড়িটা সেখানে এসে দাঁড়াতে এক উর্দিধারী নিরাপত্তাকর্মী এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দেয়। বুঝতে পারি স্থানটা সংরক্ষিত ও সাধারণ মানুষের এখানে প্রবেশ নিষেধ। প্রাচীরের বাইরে কিছুটা পথ পার হয়ে অবশেষে গাড়িটা একটা ফ্লাইওভারে এসে ওঠে।

"আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি ?" আমি জানতে চাই।

"জেরুজালেম" হ্যালভে স্যার গাড়ির ভিতরে আমার পাশে বসে স্টিরিওতে মৃদু স্বরে আঞ্চলিক ভাষায় গান শুনছিলেন, আমার কথায় রিমোটে গানের আওয়াজটা খানিকটা কমিয়ে দিয়ে বলেন তিনি। আমি রোমাঞ্চিত হই তাঁর কথায়, জেরুজালেম শহরের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা কারো অজানা নয়।

"আমাকে কি এখন থেকে জেরুজালেমেই থাকতে হবে ?"

"ওহ ইয়া"

"স্যার, আমি কি একটা কথা বলতে পারি ?"

"সিওর, হোয়াই নট ?"

"আমি জানি জেরুজালেম পৃথিবীর এক অন্যতম পুরানো শহর। এই শহরটাকে নিয়ে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।"

"ইউ আর রাইট। এই শহরটার গোড়াপত্তন জিসাস ক্রাইস্টের জন্মের প্রায় চারশো বছর আগে। শহরটাকে বাহান্নবার আক্রমন করা হয়েছে, তেইশ বার অবরোধ করা হয়েছে, আর দুবার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু তাও কোন শক্তি এই শহরটাকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে পারে নি।"

গাড়িটা দীর্ঘ ফ্লাই ওভার শেষ করে আয়ালন হাইওয়েতে এসে ওঠে। রাস্তাটা আয়ালন নদীর সমান্তরালে কিছুদূর এসে শহরের প্রাণকেন্দ্র পেরিয়ে যায়। প্রথমে আমার ধারণা ছিল নির্দিষ্ট একটা গাড়িতেই আমরা গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি। হাইরোডে এসে বুঝতে পারি একটা গাড়ির কনভয়ে বেশ কয়েকটা গাড়ির মাঝে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়িটা। নিজেকে এবার সত্যি ভাগ্যবান বলে মনে হয় এত বড়মাপের একজন মানুষের সাথে পরিচিত হয়ে। অবশেষে স্থানীয় সময় রাত নটা দশে আমরা গন্তব্যে এসে পৌঁছাই। ঝাঁ চকচকে সাজানো গোছানো এক বহুতল বিল্ডিং এর সামনে এসে আমাদের গাড়ি থেমে যায়। ড্রাইভার

রিমোটে দুদিকের দরজা খুলে দেয়, “কাম অন ইয়ং ম্যান” আমরা গাড়ি থেকে নেমে সেই বিল্ডিং এ প্রবেশ করি।

সতেরো তলায় এসে লিফ্ট থেমে যায়। পকেট থেকে চাবি বের করে লনের পাশের রুমের দরজা খুলে ফেলেন মিস্টার হ্যালভে, আমরা সেখানে প্রবেশ করি। বিলাসবহুল কক্ষ, একপাশের দেয়ালের ধারে দামি সোফা পাতা, অপরদিকে সেল্ফে নানান ধরণের রেকসিন বাঁধাই করা বই। ঘরে মৃদু ওয়ার্ম লাইট জ্বলছে। আমাকে সোফায় বসতে বলে তিনি সেলফের পাশের আলমারি থেকে একটা ফাইল বের করে আমার হাতে দেন।

"ইটস কল কোড অফ কনটাক্ট।"

আমি ওনার কথা বুঝতে না পেরে ওনার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। অবশেষে ভেঙে বলেন তিনি, মোসাদের একজন এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে গেলে সবার আগে আমাকে এই নিয়মাবলীগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। এর কোন শর্ত আমি লঙ্ঘন করলে মোসাদ আমাকে শত্রু বা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিগণিত করতে পারে। শর্তগুলো ঠিক কি ছিল তা বাইরের কাউকে জানাবার অধিকার আমাকে দেওয়া হয় নি, কাজেই সেগুলো তোমাদের আমি কিছুতেই বলতে পারব না। আমি মনোযোগ দিয়ে পাঁচ পাতার সেই কোড অফ কন্ডাক্টটা পড়ে ফেলি।

"ইয়েস স্যার, আমি রাজী" অবশেষে আমি সম্মতি জানাই। তিনি টেবিল থেকে একটা কলম তুলে নিয়ে নিদৃষ্ট জায়গায় আমাকে সই করতে বললে আমি সেখানে সই করে দিই। অবশেষে আমার জীবনের আরেকটা অধ্যায় শুরু হয়, সেদিন থেকে আমি ইসরায়েলের ভয়ংকর সিক্রেট সার্ভিস মোসাদের বিশ্বব্যাপী এজেন্টদের মধ্যে একজন। আমার কোড নাম্বার F3-702k। হ্যালভে স্যার জানান ঠিক দুদিন পর থেকে আমার ট্রেনিং শুরু হবে এবং যা চলবে প্রায় দশ মাস ধরে। ট্রেনিং এ ঠিক কি কি বিষয়গুলো নিয়ে আমাকে তালিম দেওয়া হয়েছিল, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে গোপনীয়তাজনিত কারণে অবশ্যই তোমাদের বলতে পারব না। তবে ট্রেনিং-এ মূলত যে বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো হলো কয়েকটা বিদেশী ভাষায় কথা বলা, শর্ট হ্যান্ড নেওয়া, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, ভূগোল, পিনাল কোড ও ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড, মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন, ট্রেকিং, সুইমিং, ফায়ারিং এবং সেই সাথে সেনাবাহিনীর কিছু বেসিক ট্রেনিং। এই প্রশিক্ষণপর্বটা

অত্যন্ত কষ্টকর হলেও আমি ধীরে ধীরে তার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলাম একসময়।

“চলুন ইন্দ্রনীল, আজ আমরা একসাথে ডিনার করব।” আমি সম্মতি জানিয়ে উঠে দাঁড়াই।

হ্যালভে স্যার ওয়াকিটকিতে কারোর সাথে কথা বলেন, খানিক্ষণের মধ্যে ডাইনিং টেবিলে ডিনার পৌঁছে যায়। আমার ডিনারের আইটেম ছিল ব্রেড, মিডবল বাবাগ্যানুস ও স্যালাড। ক্ষিদের মুখে খুব তৃপ্তি করে খেলাম খাবারগুলো। তিনি পরম মমতার সাথে পাশে বসে আমাকে খাওয়ালেন। যদিও তিনি সামান্য ভেজিটেবল সুপ আর স্যালাড ছাড়া এসবের কিছুই খেলেন না, এই বিষয়ে আমি প্রশ্ন করলে মিস্টার হ্যালভে জানান তিনি বহুদিন ধরে ডায়বেটিস রোগে আক্রান্ত, তাই খাবারের বিষয়ে তিনি খুব নিয়ম মেনে চলেন।

“স্যার, আমি কি আপনার সাথে কিছু বিষয় শেয়ার করতে পারি ?"

"ও সিওর, ফর এভার ইউ মে, আমি সেটাই চাই।"

আমি একে একে সব ঘটনাগুলো তাঁকে জানাই। কেন আমাকে এদেশে খিরবেত কুমরানের রহস্যভেদ করতে আসতে হয়েছে সেগুলো তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলি, আমি জানাই এই বিশাল ধনসম্পত্তি আবিষ্কার করতে পারলে আমি খুব সামান্য মূল্যবান বস্তু তার থেকে নিয়ে যেতে চাই Angitia-র মন্দির নির্মাণের জন্য, এর বাইরে আমার আর কোন চাহিদা নেই। আমার কথায় মনে হয় খানিকটা আশ্চর্য হন হ্যালভে স্যার।

"সত্যি সামান্য এই কারণে আপনি এতবড় বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এই কাজে এগোতে চাইছেন !"

"ইয়েস স্যার, প্লিজ বিলিভ মি, তবে আমি আমার পেশা ছেড়ে দিয়ে একাজে ছুটে এসেছি, তাই আমার রুটিরুজির বিষয়টা যদি..."।

"ওসব নিয়ে আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না এই অপারেশন সাকসেসফুল হোক বা নাই হোক আপনি থ্রু আউট দ্য লাইফ আমাদের কাছ থেকে যে অর্থ প্রতিবছর পাবেন, তাতে আপনার লাইফ স্মুথলি রান করবে বলেই আমার বিশ্বাস। তবে আপনার আগে আরো একজন ইন্ডিয়ান খিরবেত কুমরানের রহস্যভেদ করতে এসে চিরতরে হারিয়ে গেছেন। আমাদের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো তাঁকে এই বিষয়ে সামান্যতম প্রটেকশন দিতে পারে নি, তাই আপনাকে বলব আরেকবার চিন্তা করে

এই কাজে পা বাড়াতে।"

"হু ইস হি?"

"ডক্টর সমর কুমার গুপ্তা, আপনি তাঁর নাম শুনেছেন নাকি ?"

“হ্যাঁ স্যার, প্যারানরমাল বিষয়ের উপর রিসার্চের জন্য সারা বিশ্ব তাঁকে চেনে, আর একজন ইন্ডিয়ান হয়ে আমি তাঁর নাম শুনব না।" তাঁর সাথে আমাদের এগ্রিমেন্ট ছিল সুলেমানি গুপ্তধনের হদিস তিনি দিতে পারলে মোট ধনরাশির কুড়ি ভাগের এক ভাগ তিনি পাবেন, বর্তমান বাজারে যার মূল্য কয়েক হাজার কোটি টাকা আর বাকি উনিশ ভাগ পাবে আমাদের দেশের সরকার, যা দিয়ে তারা ইসরায়েলকে সামরিক দিক থেকে বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী দেশে পরিণত করবে। ডক্টর গুপ্তা কপার স্ক্রল ইভেন জর্ডনের মিউজিয়ামে সুলেমানি গুপ্তধনের যে সমস্ত সংকেতগুলো রাখা আছে, তারও নাকি পাঠোদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু খিরবেত কুমরানে যাবার পথে তিনি চরম রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে যান এতদিনেও যে রহস্যের হদিস আমরা করতে পারি নি।"

"আমি জানি না, তিনি কোথায় হারিয়ে গেছেন, তবে তাঁর পক্ষে সফল হওয়াটা সম্ভব ছিল না সেটা আমি বুঝতে পারছি।"

"হোয়াট ডু ইউ মিন?” আমার কথায় বিস্ময়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান মিস্টার হ্যালভে।

“কারণ কোন লোভের বশবর্তী হয়ে কেউ কোনদিন সুলেমানি গুপ্তধনের হদিস করতে পারে নি, আর আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতেও তা পারবে না।" মিস্টার হ্যালভে আবার কিছুক্ষণ নীরবে স্নেহের চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর আমার পিঠ চাপড়ে দেন পরম মমতায়।

"ইয়েস মাই সান, আমার বিশ্বাস এ কাজে তুমিই সফল হবে।"

ওনার সাথে কথায় কথায় প্রায় রাত দেড়টা বেজে যায়, অবশেষে তিনি ওয়াকিটকিতে কাউকে ডাকেন, খানিক পরে তাঁর সম্মতি নিয়ে ঘরে এসে ঢোকে সারা। সারাকে দেখে আমি মৃদু হাসি। হ্যালভে স্যারের নির্দেশে এখন সারা আমাকে আমার জন্য নির্ধারিত ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবে ও ট্রেনিং সম্পূর্ন হওয়া পর্যন্ত আমার সব বিষয়ে দেখভাল করবে। এদেশে এসে সারার মত একজন বোন পেয়ে আমিও মানসিক ভাবে অনেকখানি হালকা বোধ করি।

সারার সাথে আমি লিফটে করে নিচে নেমে আসি। লিফট পর্যন্ত

আমাকে এগিয়ে দিয়ে যান হ্যালভে স্যার। সারা বেসমেন্টের নির্ধারিত গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসে। আমি ওর পাশে বসে সিটবেল্ট আটকে নিই। মাঝরাতে জেরুজালেম শহর তখন শান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন। ফাঁকা রাস্তায় তাই সারা বেশ জোরেই ড্রাইভ করছিল। সত্যি মানুষের চরিত্র কত জটিল গাড়িতে বসে আমি ভাবছিলাম সেকথা। এখানে আসার আগে মাইক আমাকে বলেছিল মোসাদের আধিকারিক একজন চরম নিষ্ঠুর মনের মানুষ। শত্রু বা বিশ্বাসঘাতকের প্রতি তাঁর মত নির্দয় খুব কম মানুষই হতে পারেন। আমার নিজেকে আজ খুব ভাগ্যবান বলে মনে হয়, তাঁর মানবিক রূপটাকে কাছ থেকে গভীর ভাবে প্রত্যক্ষ করে। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই আমরা গন্তব্যে পৌঁছে যাই। সারা আমার জন্য নির্দিষ্ট রুমের চাবিটা খুলে দেয়, পরিপাটি করে বিছানা পাতা এখানে। বিছানার এক পাশে আমার লাগেজগুলো কেউ রেখে গেছে। পাশের টেবিলে পানীয় জলের বোতল, তার পাশে উল্টে রাখা সুদৃশ্য একটা কাঁচের গ্লাস।

"দাদা, রাত অনেক হয়েছে, এবার শুয়ে পড়ুন, আমি পাশের ঘরেই আছি। যদি রাতে কোন প্রয়োজন হয়, তাহলে বেডের পাশে থাকা ইন্টারকমে আমাকে কল করতে পারেন।"

"ওকে, গুডনাইট" আমি সম্মতি জানিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসি। সারা দরজার বাইরে গিয়েও আবার ফিরে আসে।

"দাদা, আপনাকে একটা কথা বলছি, আপনার কালো ব্যাগটা ভুলেও বাথরুমের দিকে বা ডাইনিং টেবিলে রাখবেন না, ওকে এবার আপনি বিশ্রাম নিন।"

সারা চলে গেলে আমি দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে ভাবতে থাকি, সারার এই রহস্যজনক কথার মানে কি হতে পারে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে সবে বাথরুম সেরে আবার বিছানার শুয়েছি, আচমকাই অদ্ভুত একটা স্বপ্নে আমার ঘুমটা ভেঙে যায়। এ কি স্বপ্ন দেখলাম আমি! এক নারীমূর্তির যেন দাঁড়িয়ে আমার শিয়রে। মাথায় তাঁর কিলবিল করছে বিষাক্ত নাগরাশি। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, চমকে উঠে বসে আমি। দেয়ালে ঝোলানো ছোট ফ্রেমের একটা ছবি আমার কালো ব্যাগটার উপরে গিয়ে পড়ে। তবে কি ওই ব্যাগের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সব রহস্য ? কেন সারা বলেছিল কালো ব্যাগটা বাথরুমের দিকে বা ডাইনিং টেবিলে না রাখতে ? বেডের পাশে

সুইচে হাত দিয়ে টিউব লাইটটা জ্বালিয়ে আমি বিছানা থেকে নেমে পড়ি। বাথরুম থেকে এসে একটা স্যান্ডেল ঘুমের চোখে ওই ব্যাগটার কাছে রেখেই আমি বিছানায় উঠে পড়েছি। কিন্তু কি থাকতে পারে ওই ব্যাগে ? একবার মনে হলো ইন্টারকমে সারাকে ডাকি, কিন্তু এতরাতে ওকে বিরক্ত করতে আমার মন চাইল না। চরম এক কৌতূহলে আমি ব্যাগটা খুলে ফেলি। মনে পড়ে যায় এখানে আসার পর অভিশপ্ত প্রথম রাতে যখন বাদুড়টা আমাকে আক্রমন করতে ছুটে এসেছিল, তখন ওই কালো ব্যাগটা থেকেই ভাইপার সাপটা বেরিয়ে বাদুড়টাকে আক্রমন করে। এ কি দেখছি আমি ! আমার শিরদাঁড়া বেয়ে এক হিমেল স্রোত বইতে শুরু করেছে ততক্ষনে। ব্যাগের জিনিসপত্র গুলো একেএকে বিছানায় নামতে থাকি। ব্যাগে সবার উপরে রাখা পিচবোর্ডের একটা বাক্স...এটা কোথা থেকে এলো।! ঠিক মনে করতে পারছিলাম না প্রথমে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কলকাতা এয়ারপোর্টে পৌঁছাবার আগে ঠিক যখন ট্যাক্সির টায়ার পাংচার হয়েছিল তখন ইহুদি পূজারী আব্রাহাম রহস্যজনক ভাবে সেখানে এসে এই বাক্সটা আমাকে দিয়েছিলেন। বাকি জিনিসগুলো আবার গুছিয়ে ব্যাগে ভরে নিয়ে অবশেষে প্যাক করা বাক্সটা আমি খুলে ফেলি। নিজের অজান্তেই হঠাৎ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে আমার গলা চিরে।

সকালে ঘুম ভাঙে সারার ডাকে, আমার জন্য জলখাবার নিয়ে এসেছে ও। ব্রেড-বাটার, স্টিমড বিনস আর ব্ল্যাক কফি। কালকের কোন হিসাব আমি মেলাতে পারি না। নিয়তির টানে বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছিলাম দেবী Angitia-র মুর্তিটা তখন আমার বেডরুমেই রাখা ছিল। সেই মুর্তিটা অব্রাহামের কাছে কি করে পৌছাল? আর লাইম স্ট্রিটের সেই নির্জন রাস্তায় তিনি কি আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন? তারমানে টায়ার ওখানে পাংচার হবে বা আমি ওই সময় ওই পথ দিয়েই যাব এগুলো কি জানতেন তিনি ? কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব?

দুদিন অফুরন্ত অবকাশে কাটাবার পর অবশেষে আমার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এই পর্বটা ছিল আমার জীবনের চরম কঠিন ও নিয়মানুবর্তীতাপূর্ণ একটা সময়। ভোর পাঁচটায় ওঠার পর ফ্রেশ হয়ে নেবার জন্য আমার হাতে সময় থাকতো বড়োজোর আধ ঘন্টা। এরপর গাড়ি আসত আমাকে নিয়ে যেতে। সেখানে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, স্টাডি সবকিছুর পর ঠিক রাত সাড়ে এগারোটায় গাড়ি আমাকে ড্রপ করে দিয়ে যেত। তারপর

মাঝেমাঝে ক্লান্তির কারণে পোশাক না বদলেই ঘুমিয়ে পড়তাম আমি। রবিবার বাসায় ফিরতাম বিকেল পাঁচটার আশেপাশে। ওই দিনটা ছিল আমার কাছে আশীর্বাদ। সারা সপ্তাহের ঘুমের ঘাটতিটা খানিকটা পূরণ হতো রবিবার দিনটায়। এরকম একটা রবিবার পাঁচটার একটু আগেই ফিরে আসি। আমার ফ্ল্যাটের দরজা তখন ভেজানো, আমি ঘরে পৌঁছে একটা কারনে অবাক হয়ে যাই। ক্যাজুয়াল পোশাকে দেয়ালের তাকে রাখা দেবী Angitia-র মূর্তিটার কাছে দাঁড়িয়ে সারা। চোখ বুজে দুহাত বুকের কাছে নিয়ে একমনে দেবীর আরাধনা করছে সে। আমার পায়ের আওয়াজে খানিক বাদে চোখ খোলে ও। সারা কাঁদছে, কিন্তু ওর এভাবে কাঁদার কারন কি ? "তুমি ও কি দেবী Angitia র ভক্ত ?" আমি জানতে চাই।

"সে অনেক কথা দাদা, সব আপনাকে বলব। আপনি ক্লান্ত, এখন সবার আগে আমি আপনার জলখাবারের ব্যবস্থা করি।" সারা এড়িয়ে যাচ্ছে দেখে আমি আর সেইদিন কথা বাড়াই নি।

তবে সেই রহস্যের সমাধান হয় বহুদিন পরে, সে কথায় পরে আসছি। আমার প্রশিক্ষণপর্ব শেষ হবার পর কপার স্ক্রলের রহস্য নিয়ে সে দেশের হাতে যে সকল তথ্য আছে তা আমাকে বুঝিয়ে দেন এ দেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিস্টার দানিয়েল। আমি এটা জেনে অবাক হয়ে যাই যে উনি এত বড় মাপের একজন ঐতিহাসিক হলেও আদতে কিন্তু মোসাদের একজন এজেন্ট। তিনিও একটা বিষয়ে আমার সাথে সহমত হন যে কপারস্ক্রলের যেই অংশ The Jordan Museum-এ আছে, তার নকশা উদ্ধার করতে না পারলে ওই গুপ্তধনের হদিস খুঁজে পাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয় এবং জর্ডন সরকার কোনভাবেই একজন মোসাদের এজেন্ট কে এই কাজের অনুমতি দেবে না। Efraim Halevy-ও নাকি এই বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। এবার আমার মনটা সত্যি বলতে খারাপ হয়ে যায়। এতকিছুর পর আমাকে খালি হাতে দেশে ফিরতে হবে নাকি!

ঠিক দুদিন পর হ্যালভে সাহেবের চেম্বার থেকে আমার ডাক পরে। তিনি আমার সাথে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হতে চান। ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা, জনৈক মোসাদের অফিসারের সাথে আমি স্যারের কক্ষে প্রবেশ করি।

"কাম অন মিস্টার ইন্দ্রনীল," আমাকে আসতে দেখে তিনি বলে

ওঠেন। আমার সঙ্গী অফিসারকে ইশারায় চলে যেতে বলেন তিনি।

"আমাদের সরকার এবার সুলেমানি গুপ্তধন ডিসকভারের প্রসিডিওর স্টার্ট করতে চায়, আমরা এই অপারেশনের নাম রাখছি 'দ্য অপারেশান স্পাইডার এক্স' আর তোমাকে আমরা এই অপারেশনের লিডার হিসেবে নিয়োগ করছি।"

"থ্যাংক ইউ স্যার, বাট একটা বিষয়ে আমি ভেরি মাচ কনফিউসড।"

"হোয়াটস দ্যাট ম্যাটার ?"

"কপার স্ক্রলের নকশার যেই পার্টটা জর্ডন মিউজিয়ামে আছে, সেটা না দেখতে পেলে কি করে আমরা সুলেমানি গুপ্তধন ডিসকভার করতে পারি ?"

"আই নো দ্যাট, আর জর্ডনে যাবার জন্য ইন্ডিয়া থেকে তোমার টুরিস্ট ভিসা রেডি হয়ে যাবে, এ কাজে আমাদের এক দক্ষ সহকর্মী তোমাকে সবরকম ভাবে সাহায্য করবে। আজ তার সাথে আমি তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। আমার বিশ্বাস তাকে তুমি বেশ কিছুদিন ধরেই চেন, মে বি নাও হি ইস ওয়ান অফ ইওর গুড ফ্রেন্ড।"

আমি অবাক হয়ে যাই স্যারের কথায়। এমন কে হতে পারে যে আমার বন্ধু! স্যার ওয়াকি টকিতে কারোর সাথে কথা বলেন। মিনিট তিনেক পর এমন একজন এই রুমে প্রবেশ করে যে সত্যি আমার খুব ভালো বন্ধু... সে মাইক।

"মাইক তুমি ?" আমি বিস্ময় বিহ্বল হয়ে উঠে দাঁড়াই। হ্যালভে স্যার তখন আমার এই অবস্থাটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন আর মুচকি হেসে চলেছেন। প্রায় একবছর পর মাইকের সাথে দেখা, ওকে দেখে যেন এই কাজে আমার উৎসাহ আরও অনেকখানি বেড়ে যায়।

"মিস্টার ইন্দ্রনীল, এদেশে এসে তুমি তোমার পাছা মোটা দুম্বার মতো ফিগারটাকে কিছুটা হালকা করতে পেরেছ বলে মনে হচ্ছে।"

বহুদিন বাদে মাইকের চিরাচরিত কৌতুকের স্বাদ উপভোগ করলাম আমি। হ্যালভে স্যার ও শিশুর মতো হাসছেন তখন মাইকের কথায়।

"মাইক, তোমার বিচ্ছিরি রকম জোক করার স্বভাবটা পাশে সরিয়ে রেখে এবার কাজের কথায় এস।" হাসতে হাসতে বলেন মিস্টার হ্যালভে।

"অ্যাটেনশন প্লিজ, ঠিক তিনদিন পর ইন্ডিয়া থেকে একজন এক্স এয়ারফোর্স অফিসার এদেশে আসছেন। হ্যাঁ, তাঁর নামও ইন্দ্রনীল

দাসগুপ্ত। তিনি ইসরায়েল ও জর্ডনে ট্রাভেল করার জন্য প্রথমে বেন গুরিয়ান এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছাবেন। তারপর থেকে তুমি হয়ে যাবে দ্যাট সেইড ইন্দ্রনীল। আর তাঁকে ইসরায়েল থেকে দেশে ফেরার সব ব্যবস্থা মোসাদই করে দেবে।"

"কিন্তু অন্যের ডকুমেন্টস নিয়ে জর্ডনে গিয়ে যদি আমি ধরা পড়ে যাই তাহলে" আমি চমকে উঠি মাইকের কথায়।

“সেই টেনশন তোমাকে নিতে হবে না ইয়ার। দুজনের পেপারস এর মধ্যে সামান্য দু-একটা বিষয় ছাড়া মোর অর লেস তেমন কোনো চেঞ্জেস নেই যা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আর তাছাড়া..."

"তাছাড়া ?” ভয়ে ভয়ে আমি জানতে চাই।

"Chief immigration officer of Amman also the spy of Mossad” খুব নিচু গলায় কথাগুলো বলে তীব্র হাসিতে ফেটে পড়ে মাইক।

“ইন্দ্র, লড়াই এ জয়ী হয়ে ফিরে এসো। আমরা সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব" আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন মিস্টার হ্যালভে।

নিজেকে এবার মানসিকভাবে তৈরী করি আরেকটা কঠিন কাজের জন্য, ঈশ্বর জানেন, সেখানে গিয়ে আমাকে আবার কোন সমস্যায় পড়তে হবে।

"তোমাকে এই বিষয়ে আরেকটা ছোট ইনফরমেশন-ও দিয়ে রাখি, এই মুহূর্তে জর্ডনের দ্যাট সেইড মিউজিয়ামের ভারপ্রাপ্ত সাম্মানিক প্রধান একজন ভারতীয় মহিলা। যাঁর নাম অর্পিতা গুপ্তা। যিনি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর সমর কুমার গুপ্তার একমাত্র মেয়ে, যেই ডক্টর গুপ্তার অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে তুমি এতখানি চিন্তিত।" জানায় মাইক।

অর্পিতা গুপ্তা ! নামটা কেন যেন বড় চেনাচেনা লাগে আমার। যেই অর্পিতা L.L.B.তে আমার সহপাঠিনী ছিল সে নয় তো! কিন্তু মাইক কিভাবে জানল ডক্টর গুপ্তার অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে আমার কৌতূহলের কথা। যতদূর মনে পড়ে সেই রাতে হিথরো এয়ারপোর্টে জনৈক সহযাত্রীর থেকে ম্যাগাজিনটা চেয়ে যখন ডক্টর গুপ্তার আর্টিকেলটা পড়ছিলাম তার আগেই মাইক আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল, তারপর থেকে তো এই বিষয়ে ওর সাথে আমার কোন কথা হয় নি, তাহলে...।

।। স্বপ্নপূরণের লক্ষে ।।

বেন গুরিয়ান থেকে জর্ডনের রাজধানী আম্মানের আলিয়া এয়ারপোর্ট মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের যাত্রাপথ। রানওয়েকে বিদায় জানিয়ে বিমান আকাশে উঠে তেরছা করে Mediterranean Sea র উপর একটা পাক খেয়ে অবশেষে ব্যস্ততম তেলআবিব শহরের কংক্রিটের জঙ্গলের উপর ডানা মেলে। তেলআবিব ছাড়ার পর অনুর্বর উষর পার্বত্য স্থানে ছোটছোট কিছু শহর ছাড়া জনবসতি সেভাবে নেই, তবু ইসরায়েলের মাটিতে খানিকটা সবুজ আভা চোখে পড়ে, ডেড সি পার হয়ে জর্ডনের সীমায় প্রবেশ করার পর পায়ের তলায় দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির মাঝে শিরা, ধমনির মতো সুক্ষ রাস্তায় দু-একটা দাগ ছাড়া নজরে কিছু আসে না। জর্ডনের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান খুবই কম, এই সময় তাপমাত্রা ত্রিশের কিছু উপরে ঘোরাফেরা করে। তবে পরিবেশ ভীষণ শুকনো এখানে, সন্ধ্যের পর ধীরে ধীরে তাপমাত্রা প্রায় কুড়ি ডিগ্রির আশেপাশে নেমে যায় - আসার আগে মাইক আমাকে সেখানকার নাড়ি নক্ষত্র জলের মত করে বুঝিয়ে দিয়েছে। অবশেষে বিমান নামতে শুরু করে। পায়ের নিচে সবকিছু স্পষ্ট হচ্ছে ধীরে ধীরে। তবু তামাটে কার্পেটের মত ভূমিস্তরে সামান্য কিছু তৈলকূপ, গোডাউন ছাড়া সভ্যতার চিহ্ন সেভাবে নজরে আসে না। আম্মান শহরের ব্যস্ততম স্থানগুলো বিমানবন্দরের থেকে আরও খানিকটা উত্তরপূর্বে।

কুইন আলিয়া বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে সেই অর্থে খুব একটা ব্যস্ত বলা যায় না। মরুভূমির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রায় গোটা বিমানবন্দরটাই কপার ইয়েলো টাইলসে সাজানো। বিমানবন্দরের লাউঞ্জ থেকে ওয়েটিং হল সব জায়গায় মাথার উপরটা নির্মিত হয়েছে বিশাল বিশাল স্তম্ভের উপর বেদুইনদের তাঁবুর আদলে। শুষ্ক মরুভূমির বাতাস থেকে পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে দেয়ালগুলো মোটা ট্যান্সফারেন্ট গ্লাসে বানানো, বিমানবন্দরের মূল হলের বাইরে আরেকটা বিশাল হল জুড়ে নানান ধরনের পসরার সুদৃশ্য স্টল, তবে ক্রেতার ভিড় সেভাবে নজরে পড়ল না। স্থানীয় সময় এখন বেলা সাড়ে এগারোটা। এতক্ষনে ক্রুদ্ধ মরুভুমি হয়তো কাঁচের দেয়ালের বাইরে তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। বিমানবন্দরের চৌহদ্দির বাইরে শহরে পৌছাবার গাড়ি পাওয়া যায়। মাইক আমাকে আসার সময়

পইপই করে বলে দিয়েছে শহরে পৌছাবার জন্য আমি যেন ভুলেও মন্টে কার্লো ছাড়া অন্য কোন বেসরকারী গাড়ি ভাড়া না করি, কারণ সেক্ষেত্রে আতঙ্কবাদীদের হাতে পড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। কাজেই আমি খানিকটা হেঁটে মন্টেকার্লোর অফিসে এসে গাড়ি বুক করে নিদৃষ্ট গাড়িতে চেপে বসি।

অবশেষে এয়ারপোর্ট পার হয়ে আল সাবেকি গ্যাস স্টেশনের পাশ দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলে। এই পথে আম্মান ন্যাশনাল পার্কের সামনে দিয়ে আসার সময় এদেশে প্রথম সবুজের দেখা পেলাম কিন্তু আবু বকর মসজিদ পার হবার সাথে সাথেই আবার শুনশান মরুভূমি। চারিদিকে রৌদ্রজ্জ্বল রাস্তায় ছলাত ছলাত করে বয়ে চলেছে মরিচিকার জলরাশি, সেদিক পানে তাকালে মাথার ভিতর কেমন যেন চক্কর মেরে যায়। এভাবে মরুভূমি আর জনবসতির লুকোচুরি খেলা চলে প্রায় সম্পূর্ণ যাত্রাপথ জুড়েই। ফ্রাইডে মার্কেটের পর গাড়ি কোনাকুনি ঈষৎ ডানদিকে খানিকটা এগিয়ে এসে আল বিন আবু তালিব স্ট্রিটের মুখে দাঁড়িয়ে যায়। 'সাঈদী লাকাত ওয়াসালাত উল্লাহ উইঝাতিক' তরুণ গাড়ি চালক মৃদু হেসে আরবি ভাষায় জানায় আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। গাড়ি থেকে লাগেজগুলো নামিয়ে আমি পৌঁছে যাই মিউজিয়ামের গেটে। মিউজিয়ামে প্রবেশ করার মাসুল জর্ডনের নাগরিকদের জন্য মাথাপিছু এক জর্ডনিয়ান দিনার ধার্য থাকলেও বিদেশিদের জন্য সেই মাশুল পাঁচ গুণ অর্থাৎ মাথাপিছু পাঁচ দিনার। আমি আমার সকল নথি অফিসে জমা দিয়ে সবেমাত্র টিকিট কাটার লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, ঠিক তখনই একজন সিকিউরিটি স্টাফ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। অজানা আতঙ্কে আমার বুকটা কেঁপে ওঠে, আমার পরিচয়পত্র যে সাজানো সেটা কি এরা জেনে ফেলেছে।

"Sir, are you Mr Indraneel?" ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ি। "Please come with me" আমি হয়তো ওদের কাছে ধরে পড়ে গেছি। হয়তো এবার সত্যি আমাকে জেলের অন্ধকারে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে, এসব ভাবতে ভাবতে আমি সিকিউরিটি অফিসারের পিছন পিছন হাঁটতে থাকি, মানুষটা আমাকে একটা রুমে নিয়ে বসান।

"Any problem Sir ?"

"No, No, actually you are the guest of our Hon Director Miss Arpita Gupta. So there is no need to book

your ticket” ওনার কথায় এবার আমি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলি। তবু একটা কৌতূহল আমাকে এবার পেয়ে বসে। আমি এখানে আসব সেটা অর্পিতা গুপ্তাকে কে জানাতে পারে ? আর তিনি কি আমার সহপাঠিনী সেই অর্পিতা ? আমি ওনার কাছে জানতে চাই তিনি এখন কোথায়? ভদ্রলোক জানান আধঘণ্টার মধ্যেই অর্পিতা গুপ্তা চলে আসবেন, এই সময়টা আমি যেন এখানে অপেক্ষা করি। খানিকবাদে তিনি এক বোতল পানীয় জল ও সামান্য কিছু ম্যাগাজিন দিয়ে যান এই সময়টা কাটাবার জন্য।

আমি চিরাচরিত ঘুমকাতুরে বলেই হয়তো ভোর রাতে বিমানযাত্রার ধকলটা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এক সময়। অবশেষে সেই সিকিউরিটি অফিসারের ডাকে আমার ঘুম ভাঙে। তিনি জানান, মিস অর্পিতা গুপ্তা এসে গেছেন, তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। একরাশ দ্বিধা নিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই। উনি কি আমার সহপাঠিনী সেই অর্পিতা ! কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে কোর্টের প্রাকটিস ছেড়ে কেন তিনি এই বিদেশ বিভুঁই এ পড়ে আছেন? আর যদি তিনি আমার সেই বান্ধবী না হন, তবে কেন তিনি আমার মিউজিয়ামে প্রবেশ করার মাসুল থেকে আমাকে ছাড় দিয়েছেন? কেনই বা আমাকে তিনি অপেক্ষা করতে বলেছেন তাঁর জন্য ! এরকম বেশ কিছু চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তখন, সেগুলোকে বয়ে নিয়েই আমি সিকিউরিটি অফিসারের সাথে লিফটে উঠে তিনতলায় তাঁর ঘরের সামনে পৌঁছে যাই। ভদ্রলোক কলিং বেল বাজালে ভিতর থেকে আসার অনুমতি দেন তিনি। তাঁর ঘরে ঢুকেই আমি চমকে উঠি, আমার ছাত্রজীবনের সেই বান্ধবী আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসছে তখন, এ কি সত্যি!

সিকিউরিটি অফিসার চলে গেলে আমি আমার বান্ধবীর ঈশারায় ওর বিপরীতে রাখা চেয়ারটায় বসি। “ইন্দ্রনীল, আমি ঠিক দেখছি তো? উনি যখন বলেছিলেন একজন ভারতীয় আমার সাথে দেখা করতে আসবেন, আমি মোস্ট ক্যাজুয়ালি বিষয়টা নিয়েছিলাম, বিশ্বাস কর, তখনও বুঝতেই পারি নি যে এতদিন পর তোর সাথে আমার দেখা হতে চলেছে, ঈশ্বর নিশ্চই আছেন, তাই না বল ?"

"কার কথা বলছিস ? কে তোকে জানিয়েছিল যে আমি আসবো ?" আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাই।

"আরে বল না ওনার নামটা, ওনার বাবা Gerald Lankester

Harding কে আমার বাবা খুব রেস্পেক্ট করতেন বাট ওনার নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না।"

"তুই কি লিজার্ট পয়েন্ট এর গ্রাহাম সাহেবের কথা বলছিস?" আমার কথায় সম্মতি জানায় অর্পিতা।

গ্রাহাম সাহেবের সাথে আমার দেখা হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে, তিনি কি করে জানলেন আমি এখন জর্ডনে আসতে চাইছি সেটাই মাথায় ঢুকল না, তবে কি মাইক ওনাকে দিয়ে অর্পিতাকে কল করিয়েছিল ?

"গ্রাহাম সাহেবকে তুই চিনিস ? রিয়ালি এ ওয়াইস পার্সন।"

"আচ্ছা অর্পিতা, আমার একটা কথার উত্তর দিবি ?"

"হোয়াই নট ? হ্যাঁ, বল না কি বলবি"

"আচ্ছা, ডক্টর সমর কুমার গুপ্তা কে হয় তোর ?"

"উনি আমার বাবা, কেন, তুই জানতিস না ?"

"ওনার নিখোঁজ রহস্য নিয়ে তুই কিছু জানিস ?" আমার কথায় ওর দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, আমি জানতাম অর্পিতা মা কে হারিয়েছে সেই ছোটবেলায়, তারপর থেকে বাবার কাছেই মানুষ ও।

"বিশ্বাস কর ইন্দ্র, আমি ল প্রাকটিস ছেড়ে জর্ডনে পড়ে আছি শুধু আমার বাবার নিখোঁজের কিনারা করার জন্যই। জীবনে আমি সংসার পর্যন্ত করলাম না শুধু ওই একটা কারণেই, বাট এখন আমি হেরে যাচ্ছি রে ডে বাই ডে। মন বলছে আমি আমার বাবাকে কোনদিনও খুঁজে পাব না।"

অর্পিতার চোখে জল, আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে বন্ধুর মত ওর গাল বেয়ে নেমে আসা জলটা রুমাল দিয়ে মুছে দিই। আমার হাতটা চেপে ধরে অর্পিতা, আমার দিকে চেয়ে ও যেন কতকিছু বলতে চায়, কিন্তু পারে না। ওর ঠোঁটদুটো ভীষন ভাবে কাঁপছে। ঠিক যেমন আমার সহপাঠিনী হয়ে কোন সমস্যায় আমার কাছে নিজেকে সঁপে দিত।

"বিশ্বাস কর, এখন কেউ নেইরে আমার পাশে, যার কাছে একটু মনের কথা বলতে পারি, যার বুকে মাথা রেখে কেঁদে একটু হালকা হতে পারি, ভালোকথা, বিয়ে করেছিস তো ? তোর ছেলেমেয়ে কটা?"

ম্লান হাসি ওর কথায়, "পাত্রী জুটল না রে, এমন অভাগা বাউন্ডুলের গলায় কেই বা মালা দেবে বল তো ?" আমার কথায় মৃদু হাসে অর্পিতা। ও যেন আজ বড় বেশি করে আমাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। সত্যি বলতে বেপরোয়া বাউন্ডুলে জীবনটাকেই আমি বেছে নিতে চেয়েছিলাম

সারাজীবনের মত। আজ অর্পিতার কাছে দুর্বল হয়ে যাচ্ছি, জানি না আজ ওই অসহায় মেয়েটাকে আমি ফেরাব কেমন করে।

"এই ইন্দ্র" -বোধ হয় নানান চিন্তার ভিড়ে খানিকটা ডুবে গিয়েছিলাম, আচমকা অর্পিতার ডাকে সম্মতি ফেরে।

"হুম বল"

"আমার বাবা কোথায় যেতে পারে বল তো ? উনি জর্ডন হয়ে ইসরায়েলে যাবে বলেই বেরিয়েছিলেন, এখানেও তিনি এসেছিলেন তার প্রমান আমার কাছে আছে, তারপর ইসরায়েলে গিয়ে আচমকা একটা মানুষ কোথায় মিলিয়ে গেল।"

"আমি যতটা শুনেছি খিরবেত কুমরানে তিনি সুলেমানি গুপ্তধনের সন্ধানে গিয়েছিলেন, তারপর মোসাদের কাছে কোন তথ্য নেই এই বিষয়ে।" আমার মুখে মোসাদের নাম শুনে খানিকটা যেন চমকে ওঠে অর্পিতা।

"মোসাদের কাছে কি তথ্য আছে তা তুই কি করে জানলি ? তুই জানিস, মোসাদ কত ভয়ংকর, আমার তো মনে হয় মোসাদ আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে।

"না !" আমি প্রতিবাদ জানাই, "অর্পিতা, এসব নিয়ে তোর সাথে আমার অনেক কথা আছে, কিন্তু এখানে কি সেগুলো বলাটা নিরাপদ হবে ?"

বানভাসি মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, তেমনই অর্পিতাও আমার কথায় আশার আলো দেখতে শুরু করেছে। ওর চোখদুটো চকচক করে ওঠে "তুই আমার সাথে দুটো দিন থাকবি?" আপত্তি আমার তেমন ছিল না, কারণ তেল আবিব ফেরার টিকিট আমার করা নেই, মাইক বলেছিল এদেশে আমার কাজ শেষ হলে কোন অনুমোদিত এজেন্সির মাধ্যমে আমি যেন ফিরতি বিমানের টিকিট করে নিই। কাজেই রাজি হয়ে যাই অর্পিতার কথায়। ছাত্রজীবন থেকেই অর্পিতাকে আমার ভালো লাগত তবে সেই ভালোলাগাটা বন্ধুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এতকাল পরে বিদেশবিভুঁই এ দুই অসহায় নারী-পুরুষের এভাবে দেখা হয়ে গেলে যে তাদের সেই বন্ধুত্ব অন্য পথে ডানা মেলতে চাইবে, তাতে আশ্চর্যের কি আছে। অর্পিতার সামান্য কিছু গুরুত্বপূর্ন কাজ বাকি ছিল, সেগুলো আমাকে বসিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি সেরে আসে। এর মধ্যেই এক ব্যক্তি অর্পিতার রুমের ভিতরে একপাশে রাখা

ডাইনিং টেবিলে সম্ভবত দুজনের লাঞ্চ মিল রেখে যায়, আমার বেশ খানিকটা তন্দ্রা এসে গেছিল, অর্পিতার হাতের স্পর্শে এবার আমার ঘুম ভাঙে। ও কাজ শেষ করে চলে এসেছে, আমার সাথে লাঞ্চ করার জন্য। আমার হাতটা ধরে সে ডাইনিং চেয়ারের দিকে এগোয়। হয়তো ছাত্রাবস্থায় সিনেমা হলে যেভাবে পাশাপাশি সিটে বসে ওর হাতের স্পর্শ পেয়ে রোমাঞ্চিত হতাম আমি, এতবছর পরও তার অন্যথা হলো না।

খাবার টেবিলেও খানিকটা চমকের উপকরণ তৈরি রেখেছিল অর্পিতা আমার জন্য। Rakoon Indian Restaurant-এ অর্ডার দিয়ে ও ভারতীয় খাবারের ব্যবস্থা করেছিল। যদিও ছাত্রাবস্থার মত ও তেমনটা স্বল্পাহারীই আছে সেটা বুঝলাম। সামান্য কিছু খেয়েও ও আমার খাওয়া শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে "তুই আর খাবি না ?"

"বাহ রে, খেলাম তো" মৃদু হাসে অর্পিতা।

"তুই সেই আগের মতোই রয়ে গেলি, আয়, আমি তোকে একটু খাইয়ে দিই।"

"থাক, আর ন্যাকামি না করলেও চলবে মশায়, এক্ষুনি কেউ ঢুকে পড়লে লজ্জার শেষ থাকবে না।" মৃদু হাসে অর্পিতা, আমি ও হাসি ওর কথায়।

“চল খেয়েদেয়ে একটা দারুন জায়গায় তোকে ঘুরতে নিয়ে যাব” নতুন জায়গা ঘুরে দেখার লোভে আমার খাবার শেষ হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে।

তাড়াতাড়ি করে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসি, এর মধ্যে ও আজ হাফ ডে সহ আরও দুই দিনের ছুটির জন্য দরখাস্ত জমা দিয়ে এসেছে। অর্পিতার আন্তরিকতা গুলো আজ বড় হৃদয় ছুয়ে যাচ্ছে বারেবারে। যদি ছাত্রাবস্থায় আমি ওকে একবার বলতে পারতাম যে তোকে আমি ভালোবাসি, আজ যদি দেশে থাকতে পারতাম, হয়তো আমরা একসাথে প্র্যাকটিস করতাম কোন আদালতে, হয়তো সুখ শান্তির একটা সংসার পাততাম আমরা। স্বামী স্ত্রী আর দু-একটা সন্তানের সুখী একটা পরিবার। রাতে চেম্বার ফাঁকা হয়ে গেলে আমরা আলোচনায় বসতাম পরের দিনের মামলাগুলো নিয়ে, আজ যে সেই সব স্বপ্ন অতীত, শুধু অনুশোচনায় ভরা একটা বর্তমান আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে বয়ে নিয়ে চলেছি আমরা দুজনেই।

“কি রে, কোথায় যাবি বললি না তো"

"অতশত বলা যাবে না মশাই, সাসপেন্স একটু থাকা ভালো।" লিফটে করে নেমে এলাম আমরা।

বেরিয়ে এসে ও জানায় পদব্রজে দেড় কিলোমিটারের মতো রাস্তা

পেরিয়ে আমরা যাব রোমান থিয়েটারে। ১৩৮ - ১৬১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা অন্তনিয়াস পিয়াসের রাজত্বকালে তৈরী হয় এই থিয়েটার, প্রায় ছয়শ জন দর্শক এখানে বসে নানাধরণের অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পেত। ব্যস্ততম কুরেশি স্ট্রিট ধরে আমরা হাঁটতে থাকি। সূর্য খানিকটা পশ্চিমে হেলে মাঝেমাঝে বহুতল বাড়িগুলোর পিছনে আশ্রয় নিচ্ছে, আবার কখনো বা স্বমহিমায় চেয়ে দেখছে আমাদের দিকে। রাস্তায় বিদেশী পর্যটকদের আনাগোনা। পাথরে বাঁধানো সুদৃশ্য কাঠের চেয়ারে আড্ডা দিচ্ছে স্থানীয় তরুণের দল। কলকাতা শহরের মত এখানেও ফুটপাতের উপর জায়গায় জায়গায় পসরা সাজিয়ে বসেছে স্থানীয় মানুষ। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা ঠান্ডা পানীয়ের ক্যানে চুমুক মেরে আবার গন্তব্যের দিকে এগোই। আধ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করি আমরা অবশেষে চোখ মেলে দেখি সোনালি রোদ্দুর গায়ে মেখে আভিজাত্যের প্রতীক রোমান থিয়েটার আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। প্রানোচ্ছল ব্যাস্ত শহরের মাঝে নীরবে একবুক ইতিহাস বয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন এই স্থাপত্য। আমাকে দাঁড়াতে বলে অর্পিতা টিকিট কাটতে যায়, আমি তখন এক অজানা মরু গুল্মের তলায় দাঁড়িয়ে একরাশ বিস্ময়ে দেখছি ইতিহাসের সেই মূর্ত প্রতীককে। দুরে ব্যস্ত শহরের পাথুরে বহুতল বাড়িগুলোর দেয়ালে পড়ন্ত সূর্যের আলো সোনার আভায় মুড়ে দিয়েছে। তার মাঝেমাঝে খেজুর গাছের পাতাগুলো তিরতির করে আন্দোলিত হচ্ছে শুষ্ক মরু বাতাসে।

"ইন্দ্রনীল" ঠিক তখনই আমার পিছন থেকে গম্ভীর গলায় কে ডেকে ওঠে, এই অচেনা পরিবেশে কে আমার নাম ধরে ডাকতে পারে ! চমকে উঠি আমি। এ কি দেখছি! সেই ইহুদী পুরোহিত আব্রাহাম দাঁড়িয়ে আমার পাশে।

"আপনি... এখানে !" অবাক হয়ে আমি প্রশ্ন করি।

"ভুলেও কামের ফাঁদে পড়ো না ইন্দ্রনীল, তাহলে তোমার চরম বিপদ হবে।" আমি চমকে উঠি তাঁর কথায়। ঠিক কি বলতে চাইছেন উনি ? টিকিট কেটে আমার দিকেই আসছে অর্পিতা। হঠাৎই কোথায় যেন মিলিয়ে যায় আব্রাহাম। আমি ঠিক দেখলাম তো ? কিন্তু এ কি করে সম্ভব! অর্পিতা একনাগাড়ে আমাকে বোঝাতে চাইছিল এই স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। কিন্তু ততক্ষনে আমার সারা শরীরে হিমেল একটা আতঙ্কের চোরাস্রোত বইতে শুরু করেছে। তবে কি এবার আমি ও দেবী Angitia-র রোষের শিকার হতে চলেছি ? এতদিনের পর অর্পিতার সাথে দেখা হয়ে এই সামান্য সময়ের মধ্যে আমরা দুজন যে দুজনের প্রতি অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছি, সেটা তো মিথ্যে নয়।

"এই, কি ভাবছিস এত ? হাঁ করে শুধু বাইরেটাই দেখবি ? ভিতরে ঢুকবি না ?"

আগে হলে হয়তো অর্পিতার এমন বেফাঁস কথার ভিন্ন মানে খুঁজে ওর পিছনে লাগতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে আর আমার সেই ক্ষমতা অবশিষ্ট নেই। যন্ত্রের মত আমি চললাম অর্পিতার সাথে। সত্যি বলতে এখানকার শিল্পসুষমা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বেসল্ট শিলায় নির্মিত সুবিশাল মঞ্চের দুই পাশ দিয়ে ভিতরে প্রবেশের পথ। মঞ্চের ভিতরে সুউচ্চ থামের উপর দাঁড়িয়ে আছে বিশাল গগনচুম্বী ত্রিতল বিশিষ্ট পরিকাঠামো। আর মঞ্চকে ঘিরে অর্ধ চন্দ্রাকারে দর্শকের বসার সুউচ্চ গ্যালারি। স্থানটা এমন ভাবে তৈরী যাতে দিনের শেষ সূর্যরশ্মিটুকু জায়গাটাকে আলোকিত রাখতে পারে। চারিদিকটা ঘুরে দেখে গ্যালারিতে গিয়ে বসি আমরা। অর্পিতা হঠাৎ করে আমার এই পরিবর্তনে খানিকটা হয়তো আশ্চর্য হয়েছে, বারেবারে ও জানতে চাইছে এর কারণ কি। কিন্তু কি উত্তর দেব ওকে ! আমার শরীরের প্রতিটা শিরা উপশিরা এখন প্রাণভরে ওর সঙ্গ চাইছে, ওর ঘনিষ্ঠতার স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? হে ঈশ্বর, তুমি বলে দাও এখন আমি কি করব, আমিও যে রক্তমাংসের মানুষ।

রোমান থিয়েটারে যতক্ষন ছিলাম অর্পিতা নানান অছিলায় আমাকে স্পর্শ করতে চেয়েছ, কিন্তু আমি বারেবারে সরিয়ে দিয়েছি তাকে। অবশেষে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে আসি। সন্ধ্যা সাতটা সময়টা দেখে আমাদের কলকাতা মহানগরীর সাথে আম্মান শহরকে মেলানোটা ঠিক হবে না। শহরের প্রাণকেন্দ্রে আলোগুলো জ্বলে গেলেও মরুভূমির বুক থেকে অস্তগামী সূর্যের লাল আভাটা তখনো মিলিয়ে যায় নি। পায়েপায়ে খানিকটা হেঁটে আমরা একটা গ্যারেজে এসে ঢুকি। এখানে গাড়ি রেখে অর্পিতা অফিসে যায়। এই স্থানটা থেকে অর্পিতার ফ্ল্যাট খুব একটা বেশি হলে আধ ঘন্টার রাস্তা। মরুভূমির দিক থেকে তখন ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। অর্পিতার বিনা বাঁধায় কপাল অব্দি নেমে আসা ঈষৎ বড় করে ছাটা বয় কাট চুলগুলো হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বারেবারে। মাঝেমধ্যে মাথা ঝাঁকিয়ে অবিন্যস্ত কেশরাজি ঠিক করতে করতে গাড়িতে ওঠে অর্পিতা, আমি ওর পাশের সিটে গিয়ে বসি। মিনিট দশেক গাড়ি চালিয়ে এক ঝাঁ চকচকে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমাকে গাড়িতে বসতে বলে হোটেলের ভিতরে ঢুকে যায় সে, তারপর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এসে গাড়ির চাবিটা মৃদু মোচড় দিয়ে গিয়ার টেনে এক্সেলেটারে পা দেয়। আর বড়োজোর পনেরো মিনিট... তার মধ্যেই আমরা পৌঁছে

যাই গন্তব্যে, মানে অর্পিতার ফ্ল্যাটে। ঘরের দরজা বন্ধ করে বাথরুম থেকে আলুথালু রাতপোশাক পরে এসে ও লেগে যায় রাতের খাবার বানাতে। আমি তখন ফ্রেশ হয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে ভিডিওতে একটা হিন্দি সিনেমা দেখছি। হোটেল থেকে বেশ কয়েকটা ঠান্ডা নন আলকোহলিক বিয়ারক্যান এনেছে অর্পিতা, ফ্রুট স্যালাড, ওমলেট, আর স্টিমড মশলা চিকেন নিয়ে টেবিলে সাজিয়ে ও আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। ঠান্ডা বিয়ারে চুমুক দিয়ে আমার সব প্রতিরোধ ভেসে যায়। পোশাকের মধ্যে থেকে উঁকি মারছে ওর বক্ষযুগল। আজ নতুন করে আমি আবিষ্কার করি অর্পিতাকে। ঈষৎ নীলচে আলোয় মৃদুস্বরে বাংলা গানের সাথে তখন তিরতির করে কাঁপছে আমার শরীরের উত্তেজনার পারদ 'পাগল একটা, তোর মনে এই আছে আর আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছিস ! পারবি আমার কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ?' হয়ত আমার শরীরের পরিবর্তনটা লক্ষ করেই বলে ও।

যৌবনের রঙ্গিন নেশা হয়ত আমাকে খানিকটা বেসামাল করে দিয়েছে তখন, তবু আমি ভুলতে পারি নি আব্রাহামের সেই সতর্কবার্তা। আমিও তো নিজের সবটুকই দিয়ে ওকে ভালোবাসতে চাই, কিন্তু কেন এত বাঁধা আসছে তার ভিতরে! অর্পিতা, ঈশ্বর জানে, এর আগে আমি কোন নারীকে আমার মনে জায়গা দিই নি, হয়তো ভবিষ্যতেও দেব না, কিন্তু আমার এই অক্ষমতার কারণটা যদি তুই বুঝতিস...মনে মনে হয়তো এই কথাগুলি বলতে চাইছিলাম। অর্পিতা তখন এগিয়ে আসছে আমার দিকে, আমাকে ও এখন একটু ভালবাসতে চায়, একটু ভালবাসা পেতে চায় আমার কাছে, আমি ছিটকে সরে আসি, "তোকে আমি বলার সুযোগ পাই নি, বাট আমি একটা বড় দায়িত্ব নিয়ে এ দেশে পা রেখেছি। কপার স্ক্রলের যেই সংকেতটা তোদের মিউজিয়ামে আছে, সেটা আমার খুব দরকার, কাল তোর সাথে মিউজিয়ামে গেলে সেটা আমাকে দেখাতে পারবি ?"

আমার কথার পর কিছুক্ষন নীরব থাকে অর্পিতা, আমি তখন একদৃষ্টে চেয়ে আছি ওর দিকে। "ইন্দ্র তুই এমন একটা অনুরোধ আমাকে করলি যা নিয়ে আমার সত্যি বলতে কিছু করার নেই। কপার স্ক্রলের সেই সংকেতটা আমাদের মিউজিয়ামে আছে দ্যাটস ফ্যাক্ট, কিন্তু যেই ভোল্টে সেটা আছে সেখানে যে বাইরের কারোর ঢোকার অনুমতি নেই, আমি কি করে সেখানে তোকে নিয়ে যাব বল তো ?"

"তাহলে তুই আমাকে একটা কথা বল, এতদূরে পৌঁছেও কি আমি হেরে যাব ? এই বিষয়ে কিছুই কি করার নেই তোর?" আমার কথায় খানিক্ষন কি যেন ভাবে অর্পিতা।



রাতপোশাকের ভিতর থেকে ওর নরম শরীরটাকে ধীরেধীরে আমার করে নিচ্ছি।

“আমাকে একটু সময় দে, কোন একটা কারণে আমাদের মিউজিয়ামের কিছু সিক্রেট আইটেমের ফটোকপি আমার কাছে আছে, যদি তার মধ্যে ওটা থাকে তাহলে ভালো, তা না হলে সত্যি আমার কিছু করার নেই।"

অর্পিতা আলমারি খুলে হলুদ হয়ে যাওয়া কিছু ফটো বের করে হাতড়াতে থাকে। অবশেষে..."পয়েছি রে ইন্দ্র, দেখ, এটাই সেই ফটোগ্রাফ। যেই সংকেতটা তুই চাইছিলি।"

অবশেষে আমার পৌরুষ আর বাঁধা মানে না, আমি ওকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত ওর মুখমন্ডল চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছি। রাতপোশাকের ভিতর থেকে ওর নরম শরীরটাকে ধীরেধীরে আমার করে নিচ্ছি। দুজনের হিসহিসে নিশ্বাস প্রশ্বাস আর বর্ণপরিচয় বহির্ভূত আওয়াজের মধ্যে এগিয়ে চলে সময়। নীলচে আলোয় ঘড়ির কাঁটাগুলো জানান দিচ্ছে রাত এখন প্রায় একটা বাজতে যায়, আমাদের দুজনের শরীরের প্রতিটা অণু পরমাণু যখন এক মহামিলনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে, ঠিক তখনই বিকট শব্দে খুলে যায় ঘরের জানলাগুলো, থরথর করে কাঁপছে সারা ঘরটা। আমার বক্ষবন্ধনে পরম পরিতৃপ্তিতে চোখ বুজেও চমকে ওঠে অর্পিতা... এমন তো হবার কথা নয়! তবে কি দেবী রুষ্ট হয়েছেন আমাদের প্রতি? আমরাও তো রক্তমাংসের মানুষ, এই সত্যিটাকে কেন তিনি অনুভব করতে পারছেন না ?

আমি ছিটকে আসি অর্পিতার কাছ থেকে "তোকে একটা কথা আমি বলতে পারি নি কিছুতেই, বাট এখন বলছি, আমি মোসাদের একজন এজেন্ট আর সুলেমানি গুপ্তধনের হদিস করতেই আমি তোর কাছে এসেছি।" আমার কথায় অর্পিতার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে, ঠোঁটদুটো ওর কাঁপছে, ও অনেক কিছু বলতে চায় আমাকে।

"তুই যদি খুনিও হোস, তাও বলবো, তোকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যেতে পারব না। সুলেমানি গুপ্তধনের সন্ধানে আমি তোর সাথে যেতে চাই। একটাবার বল, আমাকে তুই ফিরিয়ে দিবি ?"

অর্পিতার কথায় আমি হ্যালভে স্যারকে মেল করে জানতে চাই আমার বান্ধবীকে কি আমি এই কাজে সঙ্গী করতে পারি কিনা, সম্ভবত উনি এতরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাই ওনার রিপ্লাই পাই নি, ওনার রিপ্লাই আমি পেয়েছিলাম পরের দিন, তার আগে অর্পিতা আর আমার ঘুমের ভীষণ দরকার ছিল বলে ঘুমিয়ে পড়ি, কিন্তু আলাদা আলাদা

ঘরে। হয়তো আজকের রাতটাকে আমরা আরও রঙিন করে তুলতে পারিনি দেবী Angitia র ভয়ে, কিন্তু পরের দিন সকালে উঠে হ্যালভে স্যারের রিপ্লাই মেলটা দেখে নিজেকে খানিকটা সৌভাগ্যবান মনে হয়, কি লিখেছিলেন উনি সেই মেল এ ? তা তোমাদের বলছি।

Dear Indraneel,

Mossad is very pleased to give you the responsibility of Operation Spider X. In this program, we want you to give the right to work independently. You can take someone along with your choice in this program, but you cannot discuss any internal issues with that person. During the program, Mossad took the financial responsibility of the person, but would not accept any other responsibility.

Thanking you

Yours truly

স্যারের এই মেল পাবার পর অর্পিতাকে সাথে নেবার জন্য কোন বাঁধাই ছিল না। আমি বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে দেখি অর্পিতা আমার আগেই উঠে পড়েছে। "কি রে, কাল খুব ভয় পেয়ে গেছিলি তাই না ?" আমি মৃদু হেসে জানতে চাই।

জানি না, হয়তো একরাশ অভিমান এবং লজ্জায় ও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। "জানিস, স্যারকে আমি কাল রাতে মেল্ করে জানতে চেয়েছিলাম এই অপারেশনে তোকে নিয়ে যেতে পারি কিনা, উনি অনুমতি দিয়েছেন, পড়ে দেখ মেল টা" আমি ল্যাপটপটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিই।

সেটা পড়ে অর্পিতার চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমি কপার স্ক্রলের সেই ফটোকপি অর্পিতার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের তলায় রেখে বসে যাই ওটার রহস্যের জট খুলতে। কিন্তু এত কঠিন এক রহস্যের সমাধান সত্যি আমি করতে পারব তো ?

অবশেষে সংকেতটার দিকে ভালো করে চোখ বোলাই। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ফটো একটা, ফটোটা খুব একটা স্পষ্ট নয়। তবু যেটুকু বোঝা যাচ্ছে তা হলো ফটোর উপরের দিকে মাঝামাঝি জায়গায় দুটো ভার্টিকাল

সমান্তরাল সরলরেখা। বামদিকের সরলরেখাটা ঠিক উপরে যেখানে এসে শেষ হয়েছে তার সামান্য নিচে বামপাশে একটা বৃত্ত। যার ভিতরে হিব্রু ভাষায় কিছু একটা লেখা। ভার্টিকাল সরলরেখা দুটোর নিচে শেষ প্রান্তে একটা হরাইজেন্টাল সরল রেখা দ্বারা যুক্ত এবং সেই সাথে ভার্টিকাল সরলরেখা দুটির তলা থেকে প্রায় ১৩৫ ডিগ্রি কোণে ডানদিকে সমান্তরালে আরও দুটো স্লানটিং সরলরেখা নেমে এসেছে। এই দুটো রেখা ও নিচে একটা হরায়জেন্টাল রেখায় এসে মিলিত হয়ে একটা Parallelogram এর আকার নিয়েছে। Parallelogram এর বিপরীত কোনগুলো একেকটা সরল রেখায় মিলিত হয়েছে। সরলরেখাগুলো ঠিক যেখানে এসে পরস্পরকে ছেদ করেছে, সেই স্থানটিকে একটি তির চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা আছে। এত জটিল এক রহস্যের সমাধান কি করে করব আমি ? হে ঈশ্বর তুমি আমাকে বলে দাও।

আমার জলখাবার বানিয়ে দিয়ে বেরিয়েছে অর্পিতা। বাবার আগে বলে গেছে ফিরতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। জর্ডন ছেড়ে যাবার আগে ওর অনেক ফর্মালিটিস আছে। সবার আগে সেগুলো পূরণ করা দরকার। হ্যাঁ, আমার সাথে গেলেও ওকে এই মুহূর্তে চাকরিটা ছাড়তে আমি নিষেধ করেছি। কারণ ওর সাথে ঘর করা এই মুহূর্তে আমার সম্ভব নয়, তা আমি বেশ বুঝে গেছি। জর্ডনের আইন অনুযায়ী কোন বিদেশীনি মেটারনিটি এন্ড মেটারনিটি প্রটেকশন লিভে প্রায় তিন বছর পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটি নিয়ে দেশে যেতে পারে। খাতাকলমে সে ম্যারেজ সার্টিফিকেট সাবমিট না করলেও এই ক্ষেত্রে কোন বাঁধা থাকে না। অর্পিতা গেছে ওর এক চিকিৎসক বন্ধুর সাহায্যে ফলস মেডিকেল পেপার্স তৈরী করে মিউজিয়ামে সেগুলো সাবমিট করে আইনের ফাঁক দিয়ে আমার সাথে ইসরায়েলে পৌঁছাতে, আর স্বাভাবিক ভাবেই ইসরায়েলের ভিসা পেতে ওর কোন অসুবিধা হবার কারন ছিল না।

সবরকম ফর্মালিটিস কমপ্লিট হতে প্রায় পনেরো দিন লেগে যায়। ইসরায়েলে ফিরে এসে সবার আগে আমার কাজ ছিল অর্পিতার কাছ থেকে পাওয়া হলদে হয়ে যাওয়া ফটোটাকে ভালো করে ফটোলজিকাল ল্যাবে গিয়ে রিপ্রিন্ট করা, কারণ ডিজিটাল ফটো সিস্টেমের সাথে তখনও আমরা সেভাবে পরিচিত হই নি। এবার ফটোটা আগের চেয়ে খানিকটা পরিষ্কার হয় আমাদের কাছে। ওকালতির বাইরে জিয়োলজির স্টুডেন্ট অর্পিতা, কাজেই ওর অভিজ্ঞতা আমার বেশ কাজে লেগেছিল।

তবু যেন এক জায়গায় এসে আটকে যাচ্ছিলাম আমরা। এর মধ্যে আমরা প্রায় পাঁচবার খিরবেত কুমরানে ঘুরে এসেছি। ডেড সি র তীরে টুরিস্ট গাইডদের থেকে আমরা অজানা কিছু ইতিহাস জানতে পারি। কিন্তু কোন সুত্র যেন মেলাতে পারছিলাম না। এভাবেই দেখতে দেখতে একটা বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আনি বনি কপার স্ক্রলের যেই অংশের পাঠোদ্ধার করেছিলেন সেটা হচ্ছে সুলেমানি গুপ্তধনের সম্পত্তির পরিমান, যেই মন্ত্রগুলো উচ্চারণ করে গুপ্তধনকক্ষে প্রবেশ করতে হবে সেই সকল। Gerald Lankester Harding এর লেখা থেকে আমরা নিশ্চিত হই, সুলেমানি গুপ্তধনের ভাণ্ডার ডেড সি র তীরে খিরবেত কুমরানের কোথাও লুকোনো আছে, কিন্তু সঠিক ভাবে স্থানটিকে নির্দেশ করা আছে আমাদের হাতের আলোকচিত্রটিতে। যেমন করেই হোক সেটা আমাদের উদ্ধার করতেই হবে। একদিন হঠাৎ করেই আমাদের সামনে খুলতে শুরু করে সব রহস্যের জট কি জানি হয়তো বা দেবী Angitia-র আশীর্বাদেই, এবার আসছি সেই প্রসঙ্গে।

।। গুপ্তধনের হদিস ।।

২ জানুয়ারি, ২০০১, শীতটা এবার বেশ জমিয়েই পড়েছে জেরুজালেমে। আমি আর অর্পিতা সন্ধ্যায় ফ্ল্যাটে ফিরে এসে কফির পেয়ালায় সবে চুমুক মেরেছি, আমাদের সামনে টেবিলে রাখা একটা সাদা কাগজ। হঠাৎই অর্পিতার ঠোঁট বেয়ে এক ফোঁটা কফি কাগজটায় এসে পড়ে কাগজের ওপর একটা বৃত্তের মতো ফুটে উঠেছে। কি মনে হতে আমি কাগজটা হাতে তুলে নিই। "অর্পিতা, কপার স্ক্রলের ম্যাপের ফটোটা নিয়ে আয় তো" চা খেতে খেতে আমি অস্থির হয়ে বলি। অর্পিতা আমার দিকে চেয়ে খানিকটা অবাকই হয়, তবু মুখে কিছু না বলে ও ফোটোটা নিয়ে আসে।

"নতুন কিছু ক্লু তোর মাথায় এলো নাকি ?"

"আচ্ছা, উপরে এই গোল স্পটটা কিসের বলে তোর মনে হয় ?"

"আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

"ভালো করে একবার দেখ তো ওর ভিতরে লেখাটা পড়তে পারিস কিনা" অর্পিতা আতস কাঁচের তলায় ফটোটা রেখে পড়ার চেষ্টা করে - ' ערב טוב'

“এটা হিব্রু ভাষায় লেখা রে, এই লেখাটার মানে হল শুভ সন্ধ্যা, তখনকার সময় শুভসন্ধ্যা কথাটা ছিল একটা শুভ শব্দ, তাই হয়তো এই সংকেতে এটা লেখা হয়েছে।"

“আচ্ছা, এটাও তো হতে পারে যে ওই বৃত্তটাকে সন্ধ্যার সূর্যরূপে আঁকা হয়েছে।" আমার কথায় উঠে দাঁড়ায় অর্পিতা।

“ঠিক বলেছিস, এই বিষয়টা তো আমার মাথায় আসে নি আর সেটা যদি হয়, তাহলে ওই ভার্টিকাল লাইন দুটো তো এমন কিছুকে ইন্ডিকেট করতে পারে, যার শ্যাডো ১৩৫ ডিগ্রি এঙ্গেলে স্লানটিং লাইন হয়ে নিচে নেমে এসেছে।"

"আমার মনে হচ্ছে এতদিনে আমরা এই সংকেতগুলোর মানে বুঝতে পারছি আরেকটা জিনিস তাহলে খেয়াল কর, নিচের হরাইজেন্টাল লাইনটা সমান্তরাল ভার্টিকাল লাইনদুটোকে ক্রস করে একটা সামান্তরিক ক্ষেত্র তৈরী করে কিন্তু থেমে থাকে নি বরং এন্ডলেস ভাবে ফটোর নিচের দিকে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত চলে গেছে, মানে ওই হরাইজেন্টাল লাইনটা এন্ডলেস কিছু একটা হতে পারে।"

"হ্যাঁ, হতেই পারে, আর সেটা যদি হয়, তাহলে আমি নিশ্চিৎ ওই রেখাটা ডেড সি ছাড়া আর কিছু না।"

"ইউরেকা অর্পিতা, আমি পেয়েছি, তাহলে কাল ভোরেই আমরা আবার যাচ্ছি কুমরান ন্যাশনাল পার্কে।"

আমি বলি, সেই সাথে স্পাইডার এক্স এর অন্যতম প্রতিনিধি এলেক্সকে ফোনে জানিয়ে দিই, ভোর সাড়ে চারটার মধ্যে তৈরি থাকতে। এলেক্স সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ায় ও মাপজোকের বিষয়টা ভালো বুঝত, আমার মন বলছিল এবার একটা সমাধানসূত্র মিললেও মিলতে পারে।

ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সাড়ে চারটার আমরা বেরিয়ে পড়ি, গাড়ির চালক হিসেবে সারা কতখানি দক্ষ তার প্রমান এদেশে এসে বহুবার পেয়েছি। এবারেও সারা-ই গাড়ি চালকের দায়িত্ব পালন করে। অবশ্য এর পিছনে আরও কিছু কারণ আছে। খুব বিশ্বস্ত কোন মানুষ ছাড়া এই অপারেশনে মোসাদ অফিসিয়ালরা কাউকে পাঠাতে ইচ্ছুক ছিল না, সে কারণে আমাদের টিমটা আমি, অর্পিতা, সারা আর এলেক্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা মোটামুটিভাবে বলা যায়। ঘুমন্ত জেরুজালেম শহরের ইয়ারমিয়াহু স্ট্রিট ধরে লেভিন স্কয়ার, Meinrtzhagen square-এর ক্রসিং পার হয়ে গাড়ি ছুটে চলে মরুপথে। কুয়াশায় ভোর পাঁচটায় ও কিছু নজরে পড়ে না। গাড়ির মাঝখানের দুটো ফগ লাইটের আলো ছাড়া বাকি আলো গভীর কুয়াশায় মিলেমিশে অদ্ভুত একটা পরিবেশ তৈরী করেছে। ঝাপসা উইন্ড স্ক্রিন পরিস্কার করতে উইপার চলছে জোরকদমে। গাড়ি পাঁচটা পঁচিশ নাগাদ কুমরান ন্যাশনাল পার্ক এর কাছ থেকে সামান্য টার্ন নিয়ে কালিয়া গেস্ট হাউসের সামনে থামে। এটা নামে গেস্ট হাউস হলেও মূলত মোসাদের একটা ঘাঁটি। এখানে বেড়াতে আসা রহস্যজনক বিদেশী পর্যটকদের উপর মোসাদের অফিসাররা এখান থেকেই নজর রাখে। ভোরের সূর্যটাকে দেখে আমাদের অঙ্ক করে বের করতে হবে সন্ধ্যায় সূর্যের প্রকৃত অবস্থান কেমন হতে পারে। সকালে আমাদের বেরোবার কারণ ছিল একটাই যে শীতের বিকেলে সবকিছু মাপঝোক করে অঙ্ক কষতে গিয়ে যদি সূর্যটা ডুবে যায়, তাহলে আমাদের কোন লাভ হবে না, তার থেকে সকালে ধীরেসুস্থে কাজটা করে সেই অঙ্ক ধরে আমরা অস্তগামী সূর্যের অবস্থানটা চিহ্নিত করতে পারব, আর সন্ধ্যায় আমাদের টিমের ইঞ্জিনিয়ার সেই ক্যালকুলেশনটা জাস্ট ভেরিফাই করে নেবেন। এখানে আজ সূর্যোদয়ের স্থানীয় সময় ছটা বেজে উনচল্লিশ মিনিট। কাজেই এখন নিশ্চিন্তে প্রাতকালীন চা

পানের জন্য কিছুক্ষনের বিরতি।

গাড়ি পাঁচটা পঁচিশ নাগাদ কুমরান ন্যাশনাল পার্ক এর কাছ থেকে সামান্য টার্ন নিয়ে কালিয়া গেস্ট হাউসের সামনে থামে। এটা নামে গেস্ট হাউস হলেও মূলত মোসাদের একটা ঘাঁটি। এখানে বেড়াতে আসা রহস্যজনক বিদেশী পর্যটকদের উপর মোসাদের অফিসাররা এখান থেকেই নজর রাখে। ভোরের সূর্যটাকে দেখে আমাদের অঙ্ক করে বের করতে হবে সন্ধ্যায় সূর্যের প্রকৃত অবস্থান কেমন হতে পারে। সকালে আমাদের বেড়োবার কারণ ছিল একটাই যে শীতের বিকেলে সবকিছু মাপঝোক করে অঙ্ক কষতে গিয়ে যদি সূর্যটা ডুবে যায়, তাহলে আমাদের কোন লাভ হবে না, তার থেকে সকালে ধীরেসুস্থে কাজটা করে সেই অঙ্ক ধরে আমরা অস্তগামী সূর্যের অবস্থানটা চিহ্নিত করতে পারবো। আর সন্ধ্যায় আমাদের টিমের ইঞ্জিনিয়ার সেই ক্যালকুলেশনটা জাস্ট ভেরিফাই করে নেবেন, এখানে আজ সূর্যোদয়ের স্থানীয় সময় ছটা বেজে উনচল্লিশ মিনিট। কাজেই এখন নিশ্চিন্তে প্রাতকালীন চা পানের জন্য কিছুক্ষনের বিরতি।

"আমার মনে হয় ওই ভার্টিকাল লাইন দুটো কোন মিনার ছাড়া কিছু নয়, কারণ ওই দুটো যদি কোন পাহাড়ের চূড়া হত, তাহলে তার ছায়া কখনো স্ল্যানটিং লাইনে মাটিতে পড়ত না" চা খেতে খেতে আমি বলি। এলেক্স সর্বদাই একটু কম কথা বলে, এবার কিন্তু আমার কথার পর নীরবতা ভঙ্গ করে এলেক্সই।

"ইন্দ্র, আমার ধারণা এগুলো শুধুমাত্র সাধারণ কিছু নয়, বরং পবিত্র Essenes-এর মিনার। এখন আমাদের সবার আগে জানা দরকার কিং সলোমনের আমলে ঠিক কোথায় এই ধরণের Essenes ছিল।" একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে করতে কথাগুলো বলে এলেক্স, আমি পিছন থেকে গিয়ে এলেক্সকে জড়িয়ে ধরি।

“এলেক্স, আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ এর রাইট।"

কুয়াশার মাঝেও পূব আকাশটা ধীরেধীরে লালচে হয়ে আসছে। আমাদের হাতে এখন সময় খুব কম, বাধ্য হয়ে আমার মোবাইল থেকে এই কাকভোরে বিখ্যাত ঐতিহাসিক তথা মোসাদের এজেন্ট দানিয়াল সাহেবকে ফোন করি। কিন্তু উনি সম্ভবত এত সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি, কাজেই ওনার ফোনটা দুবার রিং হয়ে থেমে যায়, কিন্তু আমাদের যে এই মুহূর্তে ওনাকে ভীষণ দরকার। অবশেষে তৃতীয়বারের

মাথায় ঘুমজড়ানো গলায় ফোন ধরেন তিনি।

"হ্যালো স্যার, গুড মর্নিং, আমি ইন্দ্রনীল বলছি"

"ও হা হা, গুড মর্নিং। বলো, বলো ইন্দ্রনীল।"

"স্যার, কিং সলোমনের আমলে খিরবেত কুমরানে কি কোন Essenes এর মিনার ছিল ?"

"হুম, ছিলো তো, কিন্তু একটা নয় দু -দুটো Essenes ছিল।" ওনার কথায় আমি হাতে স্বর্গ পাই।

"কোথায় ছিল সেগুলো ?"

দানিয়াল সাহেব অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা মেপে তখন বলে চলেছেন সেগুলোর নিখুঁত অবস্থান। কিন্তু আমার মাথায় সেগুলো ঢুকছে না বলে আমি এলেক্সকে ফোনটা দিই। এলেক্স একটা পকেট ডাইরি বের করে মিস্টার দানিয়ালের কথাগুলো শুনতে শুনতে একটা ম্যাপ এঁকে ফেলে। মোবাইলটা আমার হাতে দিয়ে এবার সবাইকে ঈশারায় গাড়িতে উঠতে বলে এলেক্স। সূর্যোদয়ের সময় যে প্রায় হয়ে এলো। গাড়িতে উঠে এলেক্স সারাকে মৃদু স্বরে কিছু একটা নির্দেশ দিলে সারা দ্রুতগতিতে গাড়ি ছোটায়, পিচ রাস্তাটা প্রায় ঢেকে আছে বালিতে, দুধারে ঝাপসা ক্যাকটাস ও খেজুর গাছের সারির মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা। সারা ঘনঘন স্টিয়ারিং এ পাক দেবার কারণে চলন্ত গাড়িতে বারবার আমরা এ ওর গায়ে ঝুঁকে পড়ি বেসামাল ভাবে। মিনিট পনেরর মধ্যে সারা আমাদের নিয়ে পৌঁছে যায় সেই গন্তব্যস্থলে। গাড়িটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। গাড়ি থেকে নেমে এলেক্সের পিছন পিছন বালুরাশির মধ্যে খানিকটা এগিয়ে যাই আমরা। হ্যাঁ, আমাদের সামনে প্রায় পাঁচশো ফুটের ব্যবধানে আঁকাবাঁকা ক্ষয়িষ্ণু ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মতো দুটো মিনার আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমাদের অনুমান যদি সত্যি হয় তবে এটাই সেই জায়গা" এলেক্স জানায়।

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? ফটোতে তো দুটো সরলরেখা দেখানো আছে, এগুলো কে কি তুমি সরলরেখা বলতে পারো ?" আমি জানতে চাই।

"ইন্দ্র, তুই একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস, এগুলো আসলে Moth mountain(ক্ষয়জাত পর্বত) কেটে বানানো, কাজেই এতবছর পর তুই এগুলোকে তখনকার রূপে খুঁজতে পারিস না" অর্পিতা আমাকে জানায়।

ভোরের সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে মিনারগুলোর গায়ে। ফটোটা লক্ষ

করতে করতে এলেক্স মিনার দুটোর গ্রাউন্ড লেভেলের দূরত্ব, ছায়া এগুলো মাপতে থাকে। সেই সাথে সন্ধ্যের সময় ছায়ার অভিমুখ ঠিক কেমন হতে পারে সেটা বুঝে নেয়। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মেপে এলেক্স নিদৃষ্ট একটা পয়েন্ট লোকেট করে। আমরাও সবাই রোমাঞ্চিত। হয়তো এই জায়গায় আমরা পেয়ে যাব সুলেমানি গুপ্তধনের হদিস -আজ রাতেই। কারণ মোসাদের নির্দেশ ছিল দিনের আলোয় আমরা যেন গুপ্তধনের সন্ধানে বেশিদূর না এগোই। অগত্যা কালিয়া গেস্ট হাউসে সারাদিনের মত বিশ্রাম।

সন্ধ্যেবেলায় চায়ের টেবিলে সারা, আমি, অর্পিতা, এলেক্স - সবাই মিলে আড্ডা মারছি এমন সময় দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি আমার পাশে এসে দাঁড়ায় "Please, if you keep your car take a little away" লোকটার কথায় গাড়ির চাবি নিয়ে সারা উঠতে গেলে ঈশারায় আমি ওকে বসতে বলি। কারণ লোকটাকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল সে আমাকে কিছু বলতে চায়, আর সেটা একান্ত ব্যাক্তিগত ভাবে, গাড়ির চাবিটা নিয়ে আমি উঠে আসি।

"Please tell me where I will park the car ?" স্টিয়ারিং এ বসে গাড়ি স্টার্ট করে আমি জানতে চাই।

"Are you F3 - 702K ?" আমি তার কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। তিনি একটা নীল কার্ড বের করে আমাকে দেখান যাতে লেখা F5 - 302R। বুঝলাম উনি মোসাদের জনৈক অফিসার এবং আমরা আমাদের কাজগুলো যাতে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই বিষয়ে তদারকি করার জন্য তিনি এখানে আছেন।

তিনি জানান আজ ঠিক সাতটার সময় আমরা আমাদের সিলেক্টেড পয়েন্টে কাজ শুরু করতে পারি, পাথরের মধ্যে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এই সময়ের মধ্যে ওই স্থানে পৌঁছে যাবে, তবে আমাদের সেখানে পৌঁছতে হবে 'হাসিদ' (ইহুদি সন্যাসী সম্প্রদায়) এর ছদ্মবেশে এবং পদব্রজে। তিনি তাঁর হাতের ব্যাগটা আমাকে দিয়ে দ্রুতপদে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। ব্যাগের মধ্যে ছিল হাসিদ এর ছদ্মবেশ ধারণ করার উপযুক্ত পোশাক ও সরঞ্জাম। আমি সেটা নিয়ে ইশারায় ওদের গেস্ট হাউসের রুমে ডাকি। জানলার বাইরে দুরে মরুভূমির বুকে সন্ধ্যে নেমে আসছে। সূর্যটা এলিয়ে পড়েছে দিগন্ত বিস্তৃত বালুরাশির মধ্যে একঝাঁক খেজুর গাছের মাথায়। তাপমাত্রাও

ধীরেধীরে নামতে শুরু করেছে। অফিসার আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন রাতে এখানকার তাপমাত্রা প্রায় শূন্য ডিগ্রীর আশেপাশে গিয়ে পৌঁছাবে, কাজেই ছদ্মবেশের তলায় সবার গরম জামাকাপড় পরে নেওয়াটা আবশ্যক।

আমরা সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই দল বেঁধে গেস্ট হাউস ছেড়ে বেরিয়ে পরি। সুর্যটা ডিমের কুসুমের মতো লালচে হয়ে দিগন্ত রেখায় ঢলে পড়েছে। আমাদের এতখানি পথ পৌঁছাতে হবে সম্পূর্ণ খালি পায়ে হেঁটে কারন জুতো পায়ে দিলে হাসিদের ছদ্মবেশ সম্পূর্ন হাস্যকর হয়ে যাবে। সারা একটু আগে আগে চলেছে আমাদের পথ দেখিয়ে। এই রাস্তা ওর হাতের তালুর মতো চেনা। তবু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারন বালির সাথে রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা নানাধরনের ক্যাকটাসের কাঁটায় পা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল বারবার। সন্ধ্যে হয়ে এলেও পাথুরে রাস্তার উত্তাপে পায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে অর্পিতাই সবচাইতে বেশি কাহিল হয়ে পড়েছিল, কারন মোসাদের কোনরকম প্রশিক্ষণ তার নেওয়া ছিল না। "তোমরা এই রাস্তা ধরে এস, আমি একটু এগোচ্ছি" বেশ কিছুটা সামনে থেকে রহস্যময় কণ্ঠে সারা বলে। মরুভূমির পাগলা বাতাসে কেমন অদ্ভুত কাঁপাকাঁপা শোনায় ওর কণ্ঠস্বরটা, আমি আশ্চর্য হই সারার ব্যবহারে। সারার এতোটা তাড়ার কি ছিল, আমাদের সাথেই তো ও যেতে পারত। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে মরুভূমির বুকে, পাথুরে গরম খানিকটা ঠান্ডা হয়ে এলেও পথ চলতে একটু সমস্যাই হয় এবার। মোসাদের অফিসারের দেওয়া ব্যাগের মধ্যে একটা মশাল ছিল। অবশেষে আমরা সেটায় অগ্নি সংযোগ করি। তীব্র হাওয়ায় মশালের আলো কোন কাজেই আসছিল না, আমাদের মাথার উপর দিয়ে রাতজাগা একটা প্রাণী উড়ে যায়... বাদুড় নয় তো।

আরো খানিকটা এগোবার পর পথের ধারে কয়েকজন মানুষের জটলা নজরে আসে। ইসরায়েলি এক যাযাবর সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁবু খাটিয়েছে এখানে। সম্ভবত এরা মরুভূমির থেকে নানাধরনের বিষাক্ত সাপ সংগ্রহ করে। "আমি এখানে দাদা" মশালের ধোঁয়া ও মৃদু কুয়াশায় আলো আঁধারি তাঁবুর পাশ থেকে সাড়া দেয় সারা। ওর হাতে একটা সাপ, আমাদের দেখে সাপটাকে মাটিতে ছুড়ে দিয়ে ও আবার আমাদের সাথে চলতে থাকে। আচ্ছা সারা কি কোন কারণে ভয় পেয়েছে ? কিন্তু

কেন ? কেনই বা ও তাড়াতাড়ি করে এখানে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ? এই প্রশ্নগুলোর জবাব কে দিতে পারে।

সিলেক্টেড পয়েন্টে আমরা যখন পৌছাই, ঘড়ির কাঁটায় তখন সাতটার কাছাকাছি। একদল মানুষ এখানে তাঁবু খাটিয়ে যাযাবরের বেশে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। এরা সবাই মোসাদের প্রশিক্ষিত কর্মী, ডেজার্ট রক এক্সকেভেশনের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে তৈরী ওরা। সকালে এলেক্সের নির্ধারণ করা পয়েন্টটা সন্ধ্যায় ওরা ভেরিফাই করে নিয়েছেন। এলেক্সের সিলেক্ট করা পয়েন্ট ও ম্যাপের নির্ধারিত স্থানের মধ্যে কোন ভুল ছিল না তা ঈশারায় ওনারা জানিয়ে দেন। বিদেশী ড্রোন বা স্যাটেলাইটের নজর এড়াতে তাবু খাটিয়ে রাখা হয়েছে। এলেক্স সবার আগে ওদের সাথে যোগ দেয়। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ভাইব্রেটারের দ্বারা তিনটে কোণা থেকে স্থানটিকে খোড়া শুরু হয়। প্রায় সাড়ে তিনঘন্টা নানান অ্যাঙ্গেল থেকে স্থানটির প্রায় কুড়ি ফুট গভীরে পৌঁছে যাই আমরা। কিন্তু গুপ্তধনের কোন হদিস আমাদের নজরে পড়ে না। "আমাদের অঙ্ক কি এতখানি ভুল হবে! এক বুক হতাশা নিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে আমি শরীরটাকে পাথরের উপরে এলিয়ে দিই। কনকনে ঠান্ডা হুল ফোটাচ্ছে তখন আমার সারা শরীরে। দুরে মরুভূমির বুকে তাপপ্রবাহ ও শীতলতার কারণে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে প্রস্তরখন্ডগুলো সশব্দে ফেটে চলেছে। আমি জানি তারমধ্যে এক টুকরো পাথর এদিকে গড়িয়ে এলে আমার ভবলীলা সাঙ্গ হতে দুমিনিট ও সময় লাগবে না, অথবা মরুভূমির বুকে rattle snake এর ছোট্ট একটা ছোবল আমাকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে। এর মধ্যে অর্পিতা বা অন্যান্যরা বহুবার আমাকে ডেকে গেছে। তাঁবুর ভিতরে যাবার জন্য। আমি শুনি নি ওদের কথা। এই ব্যর্থতায় বাঁচার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি।

"দাদা" অন্ধকারের মধ্যে সারা এসে বসেছে আমার মাথার পাশে।

"আমি এতবড় একটা ভুল করলাম সারা ! এই ভুলের জন্য শুধুমাত্র আমিই দায়ী কথা" বলতে গিয়ে আমি কেঁদে ফেলি, সারা পরম যত্নে আমার চোখের জলটা মুছিয়ে দিচ্ছে।

“ভুল করতে করতেই তো মানুষ নির্ভুলটার সন্ধান পায়, এতো ভেঙে পড়লে চলবে বল তো ? তুমি না এই অপারেশনের ক্যাপ্টেন" সারা হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে। আমি ওর হাতটা ধরে উঠে

দাঁড়িয়ে তাঁবুর ভিতরে যাই। কিন্তু দিনটা সত্যি বলতে আমাদের ছিল না সেটা বুঝতে পারি আরেকটু পরেই।

আচমকা তাঁবুটা দুলতে শুরু করেছে। আমরা তখন সবেমাত্র শুকনো খাবার, আর খেজুর দিয়ে নৈশভোজের আয়োজন শুরু করেছি। এমনটা তো হবার কথা নয় ! মুহূর্তের মধ্যে তাঁবুর স্টিলের কাঠামোগুলো ভেঙে পড়ে আচমকা, ব্যাটারির আলোটা পড়ে ভেঙে যায়। আমাদের তাঁবুর ভিতরে ছিলাম আমি, অর্পিতা আর সারা, ওরা দুজনেই ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। অন্ধকারের ভিতরে তাঁবুটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, খোলা আকাশের নিচে ভয়ংকর এক মরুঝড়ের সাক্ষী হতে চলেছি আমরা। বাকিদের অবস্থা তথৈবচ। এখন মরুভূমির বুকে ঝড়ের দাপট ঘন্টায় একশো-দেড়শো কিলোমিটারের কম হবে না। এলেক্সের চোখে বালি ঢুকে গেছে, এই মুহূর্তে ওর কষ্টটা লাঘব করা খুব দরকার। কিন্তু তাঁবুর ভিতরে পানীয় জলের বোতলগুলো ঝড়ে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে কে জানে। দমকা হাওয়ায় এখন দাঁড়ানোর ক্ষমতা কারোর নেই, বালির মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে অবশেষে একটা বোতলের নাগাল পাই। উপুড় হয়ে কোনমতে ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে খানিকটা এগিয়ে আসি এলেক্সের গলার স্বর লক্ষ করে। দমকা হাওয়ায় ওর মুখের উপর ঝাপ্টা দিতে চাওয়া জলটুকুও যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তবু ওই সামান্য জলের ঝাপ্টাতেই খানিকটা স্বাভাবিক হয় এলেক্স। এই মুহূর্তে আমাদের কোমরে গোঁজা স্যাটেলাইট ফোন থেকে মোসাদের হেড অফিসে সাহায্যের জন্য ফোন করাটা খুবই জরুরী। কিন্তু স্যাটেলাইট ফোনও কাজ করছে না। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুরতার সাক্ষী আমরা অসহায় পনেরো জন প্রাণী। বালিতে আমাদের পোশাক ছিন্নবিচ্ছিন্ন প্রায়। আমরা ছিটকে পড়ে আছি এখানে সেখানে। এদিকে ঝড় থামার কোন লক্ষণ নেই। খানিক দূর থেকে মনে হয় অর্পিতার আর্তনাদের মতো একটা আওয়াজ কানে আসে। কিন্তু কি করে আমি ওর কাছে পৌঁছাব ? মরুভূমির পাথরের আঘাতে ক্ষনিকের জন্য হয়তো আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। যেই মুহুর্তে আমার জ্ঞান ফেরে তখন মাথার উপর হেলিকপ্টার চক্কর মারছে। মরুঝড় তখন খানিকটা কমে এসেছে, অন্ধকারের মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মোসাদের ক্যাপ্টেনরা ছুটে এসেছে আমাদের রক্ষা করতে। বহুক্ষণের চেষ্টায় একসময় হেলিকপ্টার মরুভূমি স্পর্শ করে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা সবাই পাথরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলেও বেঁচে ছিলাম।

এই হেলিকপ্টারে মাত্র আট জন যাত্রীর বহন ক্ষমতা ছিল, তবু দুজন ক্যাপ্টেন জীবনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আমাদের সবাইকে হেলিকপ্টারে তুলে নেয়, এবার ভগ্নমনরথে আমাদের গন্তব্য তেল আভিভ। জীবন হয়তো আমার বাঁচলো, কিন্তু যদি গুপ্তধনের সন্ধান না দিতে পারি, তাহলে এই জীবন বয়ে নিয়েই বা কি লাভ... হেলিকপ্টারে উঠে ঠিক এটাই ছিল আমার উপলব্ধি। আর তার খানিক পরেই তেল আভিভের মাটি স্পর্শ করে আমাদের হেলিকপ্টার।

।। ভয়ংকর সেই অভিযান।।

খিরবেত কুমরান থেকে ফিরে আসার পর সত্যি বলতে আমরা এতটাই ভেঙে পড়েছিলাম যে পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে কেউ সেই হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। সারার উদ্যগে অবশেষে সেই শীতলতার অবসান ঘটে, আবার আমরা চারজন আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করতে মিলিত হই। আমরা ছাড়াও এই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন ঐতিহাসিক দানিয়েল সাহেব। পিনড্রপ সাইলেন্টের মধ্যে প্রথম নীরবতা ভাঙে সারা। সারার মনবল এখনও কতটা গভীর সেটা ওর কথাগুলো থেকেই আমরা উপলব্ধি করি। "হ্যাঁ, প্রাথমিক ভাবে আমরা ব্যর্থ হয়েছি এটা ঠিক, কিন্তু আমাদের পিছনে ফিরে আসার সময় কিন্তু আসেনি।"

"আর কি রইল আমাদের হাতে ? সবটাই তো শেষ" একরাশ হতাশার সাথে আমি বলি।

“শেষ নয় দাদা, বরং নতুন উদ্যমে আমাদের শুরু করা উচিত সবকিছু।"

“তুই কি আমাদের সাথে তামাশা করছিস?" খানিকটা ঝাঁঝের সাথেই আমি বলি, কারণ আমি জানতাম ও আমার এই শাসনটাকে সহজ ভাবেই নেবে।

“না দাদা, তামাশা আমি করি নি, আমি এবার তোমাদের কয়েকটা পয়েন্ট এক এক করে বলছি। তোমরা সেগুলো অন্যালাইসিস করে বলো এর মধ্যে কোন ভুল আছে কিনা।" আমি নীরবে সম্মতি জানালে ও শুরু করে।

"ফাস্টলি ম্যাপের তলায় হরাইজেন্টাল রেখাটা যদি ডেড সি হয়, তাহলে আমাদের সামনে সব চাইতে বড় যেই প্রশ্নটা এসে দাঁড়ায় তা হলো, ডেড সি এখন যেখানে আছে, কিং সলোমনের সময়েও কি ঠিক সেখানেই ছিল ? যদি তা না থাকে তাহলে ডেড সি র সেই সময়কার অবস্থানটা কোথায় ছিল" আমরা সবাই চমকে উঠি সারার কথায়, এই বিষয়টা সত্যি আমাদের কারোর মাথায় আসে নি।

"আমার কাছে যেই তথ্য আছে, তা হল ডেড সি প্রতি বছর প্রায় চার সেন্টিমিটার করে পূর্বে সরে যাচ্ছে।" দানিয়েল সাহেব জানান।

"সেই সাথে এটা ধরে নেওয়াই যায় যে কিং সলোমন জীবনের একদম শেষ প্রান্তে এসে এই গুপ্তধনের নকশাটা তৈরী করেছিলেন।"

"অফকোর্স ইউ আর রাইট মাই ডটার" দানিয়েল সাহেব খুশি হন সারার যুক্তিতে।

"কিং সলোমন মারা গেছিলেন 931 বিফোর ক্রাইস্ট, অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্মের নয়শো একত্রিশ বছর আগে, তাহলে 2001 + 931 মানে কত হচ্ছে ?

"2932" এলেক্স ক্যালকুলেটার টিপে জানায়।

"একদম ঠিক, আর তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এই সময়ের মধ্যে ডেড সি কতটা পূর্বে সরে যেতে পারে ? 2932 x 4 সেন্টিমিটার, মানে 11728 সেন্টিমিটার মানে 117.28 মিটার। এবার বলব নিচের হরাইজেন্টাল লাইনটা যদি 117.28 মিটার নিচে নেমে আসে, তাহলে কি তোমাদের মাপঝোক একই থাকবে ?"

"একেবারেই না, অনেক চেঞ্জ হবে ফিগারে, আমি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি" এলেক্স নতুন করে ল্যাপটপ এ ডিজাইন করতে বসলেও বাধা দেয় সারা।

"আমার কথা কিন্তু এখনো শেষ হয় নি, এবার আমার পয়েন্ট হলো ওল্ড টেস্টামেন্ট গ্রন্থে এক জায়গায় বলা হয়েছে তিনি যখন মারা গেছেন, তখন মরুভূমি ছিল ভীষণ উত্তপ্ত। মৃত্যুর সাতদিন পরে তাঁর বিদেহী আত্মা মরুভূমির বুকে মরীচিকায় পথভ্রষ্ট একদল পথিককে পথ দেখিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়, চরম উত্তপ্ত মানে আমরা ধরে নিতে পারি সময়টা ছিল জুন মাস। সূর্যরশ্মি তখন কর্কটক্রান্তি রেখার অভিমুখী, আর এখন জানুয়ারি মাস, মানে সূর্য সম্পূর্ন মকরক্রান্তি রেখার উপর কিরণ দিচ্ছে। জানুয়ারি আর জুন মাসে নিশ্চয় Essenes এর মিনারের ছায়া একই ভাবে মরুভূমির বুকে পড়বে না। কি ঠিক বলছি তো আমি ?"

"হুম"

আমি ঘাড় নাড়ি, আমরা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম সারার কথাগুলো। এতো সুন্দর ভাবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ও কথাগুলো বলে চলেছে যাকে খন্ডন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

"এবার আমার তৃতীয় প্রশ্ন, আমরা যে Essenes এর মিনারের ছায়ার মাপ ধরে হিসাব কষছি, সেই Essenes এর মিনারটার আকৃতি কেমন ? জাস্ট এজ টু ভার্টিকাল লাইন। কিন্তু এখন মিনার দুটো কি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ? আঁকাবাঁকা ভাবে ? আচ্ছা তোমাদের সবার মনে এই প্রশ্নটা আসছে না যে এর কারণটা কি ?

"হ্যাঁ," কারণটা খুব পরিস্কার। তা হলো এগুলো Moth mountain খোদাই করে তৈরী। সেকারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে মিনারগুলো এখন এরকম আকৃতি নিয়েছে।" সারার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই আমি বলি।

"তাই যদি হয় তাহলে কি তোমরা বলতে চাইছ ক্ষয় শুধুমাত্র ওর চারপাশে হয়েছে, ওর উচ্চতা একই রয়ে গেছে ? এটা হয়তো ঠিক যে ক্ষয়জাত পর্বতের ক্ষয়ের পরিমান প্রকৃতির উপর খানিকটা নির্ভর করে। কিন্তু তাহলেও মোটামুটি আমরা ধরে নিতে পারি দশ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত এই ধরণের পাহাড়ের প্রতিবছর ক্ষয়ের পরিমান ১৫ সেন্টিমিটার।"

"ইউ এর রাইট" দানিয়েল সাহেব এবারেও সারাকে সমর্থন জানান।

"এবার তাহলে মানচিত্র অনুযায়ী আমরা আবার অঙ্ক শুরু করি। ২৯৩২ বছরে এই Essenes এর মিনারের ক্ষয়ের পরিমান ২৯৩২ x ১৫ সেন্টিমিটার মানে ৪৩৯৮ সেন্টিমিটার। এখন এলেক্সকে সবার আগে দেখতে হবে এই ৪৩৯৮ সেন্টিমিটার উচ্চতার জন্য Essenes এর মিনারের ছায়া আরও কতখানি দীর্ঘ্য হতে পারতো। ডেড সি-র তখনকার অবস্থান ও গ্রীষ্মকালীন মিনারের তখনকার ছায়ার সঠিক অবস্থানগুলো সনাক্ত করার পর আমার মনে হয় আমরা আমাদের সঠিক জায়গাটা খুঁজে পাবো।"

কথা শেষ করে সারা বোতল থেকে জলপান করে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে পরম স্নেহে পিঠ চাপড়ে ওকে অভিনন্দন জানাই। আবার আমাদের নতুন করে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে সারা।

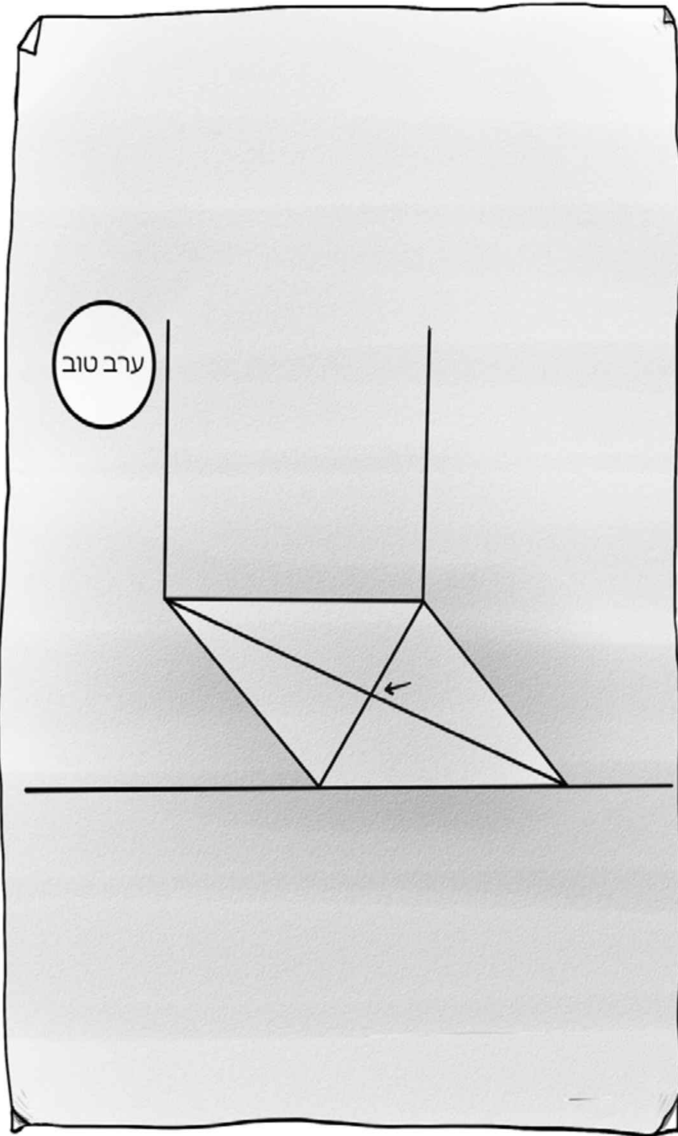
এলেক্স আমার কাছে কয়েকটা দিন সময় চেয়ে নেয়, কারণ আমরা কেউই আর পুরানো ভুলের পুনরাবৃত্তি চাইছিলাম না, আর সেটা হলে মোসাদের কাছে আমাদের গ্রহনযোগ্যতা অনেকটাই কমে আসবে তা বলাই বাহুল্য।

"সারা, এবার অপারেশন স্পাইডার এক্স তোকেই লিড করতে হবে, সত্যি বলছি, তোর মত এত নিখুত চিন্তাভাবনা আমাদের কারোর মাথাতেই আসে নি" আমি অভিযানের দায়িত্বভার সারার হাতে তুলে দিতে চাই।

"না দাদা, এই অভিযানে আমাদের কারোর গুরুত্বই কম নয়, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার মতো যোগ্য অধিনায়কই একমাত্র আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারবে। তবে একটা কথা..."

"বল, কি বলবি"

"অভিযানটা পূর্ণিমার রাতে করতে পারলে সবচাইতে ভালো হয়। আমার মন বলছে সুলেমানি সম্পত্তির সাথে বহু অভিশাপ লুকিয়ে আছে আর গুপ্তধনের সন্ধান আমাদের কাছে খুব একটা সুখকর নাও হতে পারে। জানি না এই অভিযান শেষ করে আমরা সবাই অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পারব কিনা, তবে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব সবাইকে আগলে রাখতে।"



এবার তাহলে মানচিত্র অনুযায়ী আমরা আবার অঙ্ক শুরু করি।

আমরা সবাই চমকে উঠি ওর কথায়, কি বলতে চাইছে সারা! তবে এলেক্স তার কাজ শেষ করার আগে আমরা কেউ এই বিষয়গুলো নিয়ে সেভাবে ভাবতে চাইছিলাম না। আমাদের মিটিং সেখানেই আমরা মুলতুবি করি।

৯ জানুয়ারি, ২০০১, আজ আমরা চলেছি সুলেমানি গুপ্তধনের খোঁজে। তবে আগের বারের মতো চটজলদি নয়, এবারে আমরা ধীরেধীরে সব বিষয়ে তৈরী হয়েই অভিযানে পা ফেলতে চলেছি। দুদিন আগে এলেক্স ওর নতুন ক্যালকুলেশন অনুযায়ী খিরবেত কুমরানের Essenes এর মিনারের ছায়া ও ডেড সি র অবস্থান নিয়ে স্পটে গিয়ে মাপঝোক করে এসেছে। এবার ওর চোখেমুখেও আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া। গতবারে মেজারমেন্ট কিছু কিছু জায়গা নিখুত ভাবে মেলেনি, সেগুলো কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করে ম্যাপ তৈরী করতে হয়েছিল ওকে এবারে মিনারের ছায়া, ডেড সি র অবস্থান, গ্রীষ্মের সূর্যের অবস্থান কোন বিষয়ে গরমিল নজরে পড়ে নি রুকশ্যাকে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস নিয়ে আমরা রওনা হব, তার মধ্যে আছে পর্যাপ্ত পানীয় জল, হেলমেট, টর্চ, শুকনো খাবার ও কিছু গুরুত্বপূর্ন মেডিসিন। আজ সন্ধ্যের আমরা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হবো, তার আগে আমরা আমার ফ্ল্যাটে মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হয়েছি।

"সারা, তুমি সেদিন মিটিং এর শেষে অভিযান নিয়ে একটা বিপদের ইঙ্গিত দিয়েছিলে, কিন্তু বিষয়টা আর শোনা হল না।" লাঞ্চের টেবিলে বসে অর্পিতা সারার দিকে তাকায়। অর্পিতার কথায় সারার হাসিখুশি মুখটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায় ক্ষনিকের জন্য।

"অর্পিতা, তুমি হয়তো জানো না, কিং সলোমন ছিলেন শক্তির উপাসক আর তাঁর দুটো Essenes এ দুজন পূজারী ছিলেন, যাঁদের একজনের নাম ছিল আব্রাহাম, অপরজনের নাম অ্যারণ। আব্রাহাম ছিলেন একজন সৎ, ধার্মিক ও আদর্শপরায়ণ মানুষ আর অ্যারণ ছিলেন অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। কিং সলোমনের মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল ধনভাণ্ডারের হদিস জানতো শুধু এই দুই পূজারী। এক ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে তাঁরা দুজনেই অমরত্ব লাভ করেন, সেই বিষয়ে একটু পরে আসছি। কিন্তু ধীরে ধীরে অ্যারণ শয়তানের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়। রাজা সলোমনের স্বপ্ন ছিল তাঁর জীবদ্দশায় দেবী Angitia-র মন্দির নির্মাণ করা, কিন্তু ঠিক যখন তিনি মন্দির নির্মাণে হাত দেবেন

তখনই হঠাৎ এক যুদ্ধযাত্রায় জড়িয়ে পড়েন। এই যুদ্ধ সেরে আসার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শোনা যায় দেবী Angitia তাঁকে এই অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তাঁর ধনসম্পত্তি দিয়ে যতক্ষন ইন্দো এরিয়ান বংশোদ্ভূত কেউ দেবী Angitia র মন্দির নির্মাণ না করছেন ততক্ষণ তিনি স্বর্গের বাগানে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবেন না।"

"এই কথাগুলো তো আমি মাইকের কাছে শুনেছি তুই এসব কথা জানলি কি করে ?"

আমি বিস্ময়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। কে এই সারা ? ও কি শুধুমাত্র একজন মোসাদের এজেন্ট নাকি তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু।

"বা রে ! তোমার বন্ধু জানলে আমি জানতে পারি না ? ইতিহাস কে কি একেকজন একেক রকম ভাবে জানবে নাকি ? মৃদু হাসে সারা।

"তা নয় কিন্তু... আচ্ছা মোসাদের এজেন্ট হিসেবে জয়েন করার আগে তুই কোথায় থাকতি সেটা একটু বলবি ?"

"দাদা, মোসাদের কোড অফ কনটাক্ট পড়ো নি ? কারোর প্রতি এতটা কৌতূহলী হওয়াটা বোধ হয় তোমার ঠিক হচ্ছে না" কৌতুকের স্বরে বলে সারা। আমি বেশ বুঝে যাই সারা এই বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি নয়। আমার মনে এবার আরেকটা চিন্তা উঁকি মারতে শুরু করেছে কে এই আব্রাহাম ! আমার দেখা সমাধিক্ষেত্রের সেই পুরোহিত নয় তো ?

আমাদের মধ্যান্নভোজ শেষ হবার পর সারা আমাদের অনুরোধ করে এই অভিযানে যাবার আগে আমরা সবাই যেন একে একে বাথরুমে গিয়ে ভালো করে স্নান করে নতুন পোশাক পড়ে নিই। জেরুজালেমে এখন তাপমাত্রা প্রায় ৬ ডিগ্রি সেন্টিগেটের আশেপাশে, তার উপর আজ আকাশের মুখ ভার হওয়ায় কনকনে ঠান্ডা একটা বাতাস কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। তারমধ্যে সারার এই শাসনে আমরা একটু বিরক্তই হচ্ছিলাম। আমাদের বিরক্ত হবার আরেকটা কারণ হলো কোন এক যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আজ সারাদিন জেরুজালেমে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন, সেকারণে বাথরুমে গিয়ে গিজারের তলায় আশ্রয় নেবার সুযোগ আমাদের ছিল না তা বলাই বাহুল্য। কাজেই সারার জেদের কারণে হিমশীতল জলে স্নান করা ছাড়া আমাদের কিছু করার ছিল না। অবশেষে আমাদের সবার স্নান শেষ হবার কিছুক্ষনের মধ্যে সারা পেয়ালা ভর্তি ধুমায়িত ব্ল্যাক কফি বানিয়ে ফেলে। আরো অবাক

লাগে আমাদের সবার জন্য নতুন পোশাক ও আগে থেকেই তৈরী করে রেখেছিল। সবার টি শার্টের রং ছিল সাদা, তার ঠিক মাঝখানে একটা তারা আঁকা, আর ব্রাউন প্যান্ট। সাদার উপর নীল রঙের তারা ইহুদি জাতির কাছে এক মঙ্গল চিহ্ন। এরপর সারা আমাদের সবার ব্যাগে বেশ কিছু রসুন ভরে দেয়।

"আমাকে নিয়ে তোমরা যতই মজা কর না কেন, আমার অনুরোধ এই রসুনগুলো তোমরা কেউ ব্যাগ থেকে ফেলবে না।"

আমি অবাক হই সারার ব্যবহারে, এদেশে আসার পর থেকে ওর সাথেই আমার সম্পর্ক সব চাইতে গভীর। কখনো তো ওর মধ্যে কোনরকম কুসংস্কার দেখি নি, তবে আজ কেন সারা এরকম অদ্ভুত আচরন করছে।

"কুমরান পার্কে গিয়ে কি আমাদের গারলিক চিকেন বানিয়ে খেতে হবে ?" এলেক্সের কথায় সারা বাদে আমরা সবাই হেসে ফেলি।

"এ কি! তোমার আঙুলে সিলভার রিং! খুলে ফেল বলছি, আগে তুমি ওটা খুলে ফেল" এলেক্সের দিকে চেয়ে হুকুম করে সারা। এলেক্স বিজ্ঞানের ছাত্র আর সবরকম কুসংস্কারের চরম বিরোধী। ও মৃদু ঘাড় নেড়ে জানায় রিংটা ও কিছুতেই খুলতে পারবে না। অবশ্য ওর রিংটা না খোলার কারণ অন্য কেউ না জানলেও আমি জানি, এই রিংটা ওর প্রেমিকা ওকে উপহার দিয়েছিল। আজ সে এই পৃথিবীতে নেই, তার স্মৃতি বুকে আঁকড়ে ধরেই এলেক্স তারপর দশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে, কাজেই এই রিংটা আঙ্গুল থেকে খোলাটা ওর পক্ষে অসম্ভব।

"আচ্ছা সারা, তুই এত পাগলামি করছিস কেন একটু বলবি ?" আমি মৃদু ভৎসনা করি ওকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও মাথা নামিয়ে নেয়।

"তোমরা যা ভালো বোঝ" এরপর সারা একটু থম মেরে যায়। আমরা তখন নিজেদের মধ্যে মৃদু খুনসুটি করছি, সারা জানায় গাড়ি এসে গেছে। গাড়ির ড্রাইভার গাড়িতে অপেক্ষা করছে।

"তার মানে ? তুই আমাদের সাথে যাবি না ?" আমি চরম আশ্চর্য হই সারার কথায়।

"আমি নিশ্চই যাব দাদা কিন্তু প্লিজ আমাকে তোমাদের সাথে আজ যেতে বলো না, সেটা আমি পারব না।"

"কিন্তু কেন ?" আমার বিস্ময় বেড়েই চলেছে।

"আজ পূর্ণিমা সেটা তোমার খেয়াল আছে ?"

"খেয়াল আছে, কিন্তু কি হয়েছে তাতে ?"

"আমাকে ক্ষমা কর, এভাবে সব কথা তোমাদের আমি কিছুতেই বলতে পারব না, তোমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পর, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে।"

আমার আরো অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সারার কথার মধ্যে এমন একটা ক্ষমতা ছিল তাকে অগ্রাহ্য করাটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। মেঘলা সন্ধ্যায় ঘরের ভিতরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বহু আগেই। বিদ্যুৎ সংযোগ এখনো আসে নি। ইনভার্টারের আলোগুলো ক্ষীণ হতে হতে নিভে গেছে এক সময়, এখন সম্বল তিনখানা মোমের আলো। ডাইনিং টেবিলে কাঁপা কাঁপা মোমের আলোয় আমাদের ছায়াগুলো দুলছে অদ্ভুত ভাবে। সারা দরজাটা খুলতেই এক দমকা হাওয়ায় আচমকা মোমটা নিভে যায়। এটা কোন অশুভ সংকেত নয় তো ! আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। লিফট বন্ধ থাকায় সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। সারা টর্চ নিয়ে আমাদের সাথে সদর দরজা অব্দি এসে আবার দ্রুতপদে উপরে উঠে যায়। বাইরে তখন মেঘলা আকাশটা ধীরেধীরে কালচে হতে শুরু করেছে। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করে এক্সেলেটারে পা রাখে। আমরা ছুটে চলি এবার খিরবেত কুমরানের উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ যখন কালিয়া গেস্ট হাউসের সামনে এসে গাড়ি থামে তখন আকাশে ঘোলাটে মেঘের মধ্যে থেকে পূর্ণিমার চাঁদটা উঁকি মারছে। সবার কাছেই আজ গরম পোশাক ছিল। ব্যাগের ভিতর থেকে আমরা সেগুলো বের করে পড়ে নিই, তারপর পায়েপায়ে আমরা রওনা হই কুমরান ন্যাশনাল পার্কের দিকে। আজ মোসাদের এক অফিসার রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে জানিয়েই দিয়েছিল যে আমাদের ছদ্মবেশ ধারণ করার কোন আবশ্যক নেই, কারণ এক ছদ্মবেশে স্বল্প সময়ের মধ্যে দুবার গেলেই বরং সেটা সন্দেহজনক হতে পারে, আজ তাই আমাদের আদব কায়দা ছিল সাদা পোশাকে প্রহরারত নিরাপত্তা রক্ষীদের মতই। আমি আর অর্পিতা কাঁধে রুকশ্যাক নিয়ে নিলেও এলেক্স ওর রুকশ্যাকটা গেস্ট হাউসে রেখে আসে। গেস্ট হাউস থেকে বেরোবার পর অন্ধকারটা যতটা গভীর ছিল, কিছুক্ষনের মধ্যেই সেটা কেটে যায়। মেঘটা চাঁদের থেকে বেশ কিছুদুর সরে গেছে। এখন একটা ঝাপসা বলয় চাঁদের চারপাশটাকে ঘিরে আছে। সেটা দেখে

ইহুদি পুরোহিত অব্রাহামের একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার, --"যেদিন সুলেমানি গুপ্তধন আবিস্কার হবে, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদটাকে সেদিন একটা বলয় ঘিরে রাখবে। তবে আকাশের বুকে যদি কখনো দেখ হলুদ আলোয় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তাহলে সাবধান ! বুঝবে বিপদ তোমাদের ছোবল মারার জন্য অপেক্ষা করে আছে।" আমাদের জুতোর ভিতরে বারবার নুড়িপাথর ঢুকে যাওয়ায় দাঁড়িয়ে সেগুলো বের করতে গিয়ে বারবার চলার গতি শ্লথ হচ্ছিল। ডেড সি-র দিক থেকে ভেসে আসা কনকনে নোনা হাওয়ায় চট চট করছে সারা মুখটা। অবশেষে এলেক্স মৃদু কুয়াশায় মধ্যে চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চের আলো ফেলে আমাদের জানায় সামনেই আমাদের নতুন লক্ষ্যবিন্দু।

একটু অবাকই হই আমরা সবাই। এটাই যদি আমাদের লক্ষ্যবিন্দু হয়, তাহলে বাকি লোকজন কোথায় ? হ্যাঁ, একটু দূরে একটা বড় পাথরের আড়ালে দুটো বুল ডোজার মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু তার ভিতরে কোন লোকজন নজরে আসছে না। বুলডোজার দুটো পার হয়ে একপাশে পরপর তিন-তিনটে তাঁবু, কিন্তু কোথাও কোন জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকাই, মানুষগুলো তাহলে কোথায় যেতে পারে ! “আমার মনে হয় শেষ মুহূর্তে কোন কারনে স্পাইডার এক্স অপারেশন থেকে এই টিমটাকে বাদ দিয়ে হেড কোয়ার্টার অন্য টিম পাঠাচ্ছে।” এলেক্সের কথার সাথে আমি কিছুতেই সহমত হতে পারি না। এই টিমে যারা ছিল তাদের কেউ আনকোরা নয়, তাছাড়া এভাবে হঠাৎ করে টিম লিডারকে না জানিয়ে মোসাদ কিছুতেই এটা করতে পারে না। ওদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে প্রায় দু ঘন্টা কেটে গেছে, আমার রেডিয়াম জ্বলা হাতঘড়িতে এখন সময় শো করছে প্রায় দশটা। এর মধ্যে আকাশ কালো করে দু পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, বৃষ্টির সময় তাঁবুর ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমরা। তারপর আবার তাঁবুর বাইরে এসে ওদের পথ চেয়ে দাঁড়াই। সারা কিন্তু আর আমাদের সাথে এসে যোগ দেয় নি, এভাবে ও কেন পিছিয়ে গেল সেটা কিছুতেই মাথায় আনতে পারছি না আমরা।

“ওদের জন্য আর অপেক্ষা না করে আমাদের তিনজনের অভিযানে এগিয়ে যাওয়া উচিত।"

আমি আমার মতামত জানাই এলেক্স আর অর্পিতাকে। ওরাও সহমত হয় আমার সাথে। মেঘ কেটে যাবার পর জোছনা উঁকি মারছে

আকাশে। এক লাফে বুলডোজার উঠে ওটাকে স্টার্ট করে এলেক্স। এলেক্সের কথা অনুযায়ী গ্রাউন্ড জিরো পয়েন্টের থেকে আমরা বড়োজোর পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে আছি। এলেক্স ধীরেধীরে বুলডোজার ড্রাইভ করে নামছে একটা খাতে। আমরা হেঁটে এগোচ্ছি পিছন পিছন। মেঘ কেটে সারা আকাশ ভরে উঠেছে পূর্ণিমার ঝলমলে আলোয় আর ঠিক তখনই! বুলডোজারটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়, বোঝা যাচ্ছে কেবিনের ভিতর থেকে এলেক্স প্রানপনে চেচিয়ে কিছু একটা বলতে চাইছে আমাদের। বুলডোজারের কেবিন ডোর কোন অজ্ঞাত কারণে লক হয়ে গেছে। এলেক্স প্রানপনে ভিতর থেকে দরজাটা ধাক্কাচ্ছে বাইরে আসার জন্য। বুলডোজারের ইঞ্জিন থেকে কোন শব্দ আসছে না, মানে ওর কেবিনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আর কিছুক্ষন থাকলেই সাফোকেশন শুরু হবে ওর। অগত্যা কোমরের থেকে পিস্তল বের করে আমি কেবিনের ছাদ লক্ষ করে ফায়ার করি, ঝনঝন করে খসে পড়ে কেবিনের একদিকের মোটা কাঁচ। আমি এবার বুলডোজারের উপর লাফিয়ে উঠে এলেক্সকে বের করে আনি, ও ভয়ে কাঁপছে, এই সামান্য সময়ের ভিতরে গরমে ওর চুলগুলো ভিজে গেছে।

“আচ্ছা ইন্দ্র, আমাকে তুমি একটা কথার উত্তর দিতে পারবে ?"

"হ্যাঁ, বল তুমি কি বলতে চাইছ"

"বুলডোজারের কেবিনের ভিতরে এত রক্ত কেন !"

"রক্ত! কিভাবে এটা সম্ভব !” অর্পিতা চমকে ওঠে এলেক্সের কথায়।

আমি আবার লাফিয়ে উঠি বুলডোজারের কেবিনে। হ্যাঁ, এলেক্স তো কিছু ভুল বলে নি, টর্চের আলোয় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বুলডোজারের কেবিনে চাপ চাপ শুকনো রক্ত জমাট বেঁধে আছে। অজানা এক আতঙ্কে আমার সারা শরীরটাও কেঁপে ওঠে। কিন্তু এই অভিযানের সাফল্যের জন্য নিজেকে শক্ত রাখাটা অত্যন্ত জরুরি আমার কাছে।

"আমরা বোধ হয় লক্ষ্য বস্তুর খুব কাছাকাছি চলে এসেছি, চলো এবার হেঁটেই এগোনো যাক, এত কাছাকাছি পৌঁছে আমি কিছুতেই ফিরে যেতে চাই না।" দৃঢ় স্বরে আমি বলি।

অর্পিতা আমার হাতটা শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে, আমার পিছনে এলেক্স। আর ঠিক তখনই দলেদলে আমাদের মাথার উপর চক্কর কেটে চলেছে রাতজাগা উড়ন্ত কোন প্রাণী। বাদুড় নাকি ? কিন্তু এই মরুভূমির বুকে বাদুড় কোথা থেকে আসবে! বাদুড়গুলোর লক্ষ্য যে আমরা সেটা

বেশ বোঝা যাচ্ছে। ওগুলো এবার আমাদের একদম সামনে চলে এসেছে। দাঁত নখ বের করে ওরা আমাদের আক্রমণ করতে উদ্যত। ঠিক তখনই সামনের দিকে চেয়ে চমকে যাই আমরা। জ্যোৎস্নার মধ্যে মরুভূমির ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে এক জোড়া চতুষ্পদ, তাদের সবুজ চোখজোড়া জ্বলছে।

"ইন্দ্র, তুই এক্ষুনি ফায়ার কর।" ভয়ে অর্পিতা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। পিস্তল হাতে নিয়েও হাত কাঁপছে আমার! নেকড়েগুলো আমাদের কোন ক্ষতি করল না, বেশ বুঝতে পারছি ওদের লক্ষ উড়ন্ত বাদুড়গুলো। হয়তো আমাদের বাঁচাবার জন্যই ওরা ছুটে এসেছে কিন্তু তা কি করে সম্ভব ! নেকড়েগুলোকে দেখে বাদুড়ের পাল এবার খানিকটা দমে যায়, সেই অবকাশে অনুচ্চ টিলার পাদদেশে আমরা এক গভীর পরিখায় নামতে থাকি। পাথরের খাঁজ আঁকড়ে প্রায় একশো ফুট নামতে হয় আমাদের। ডেড সি-র দমকা হাওয়া তখন বারেবারে আমাদের বেসামাল করে দিচ্ছে, আর এখান থেকে হাত ছেড়ে যাবার একটাই অর্থ - মৃত্যু! কারণ আমাদের কাছে ট্রেকিং এর উপযুক্ত রোপ বা অন্যান্য কোন সরঞ্জাম মজুত নেই। পরিখার মধ্যে নিরাপদে আমরা তিনজন নামার পর এলেক্স নাইটভিশন বাইনোকুলার বের করে উপরটা দেখতে থাকে। আকাশের বুকে এখন রাতজাগা বাদুড়গুলোকে উড়তে দেখা যাচ্ছে না, তবে দূর থেকে নেকড়ের ডাক ভেসে আসছে বারবার।

"ইন্দ্র...! আমরা পৌঁছে গেছি, সামনের দিকে দেখ।" পরিখার মধ্যে প্রায় একশো মিটার দূরত্বে দুটো জেসিবি মেশিন দাঁড়িয়ে আছে "আমাদের অঙ্ক যদি ভুল না হয়, তাহলে এই সেই জায়গা" আমাদের হাতের টর্চগুলো এবার জ্বলে ওঠে। পাশাপাশি দুটো টিলার মাঝখান দিয়ে সুড়ঙ্গের মত খানিকটা জায়গা, তার ভিতর থেকে মৃদু একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। তবে কি এটাই আমাদের গন্তব্য ! আমার শরীরের প্রতিটি লোমকূপ জেগে ওঠে, তবে কি আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে আর ঠিক তখনই...!

আচমকা মেঘে ঢেকে ফেলে সারা আকাশ, মরুভূমির বুকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আগের দিনের মতো বিধ্বংসী মরুঝড়ের মুখে আজ আমাদের পড়তে হয় নি। কিন্তু যেন কোন নরকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি আমরা। পূর্ণিমা রাতের জ্যোৎস্না সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছে মেঘে, তারমধ্যে এঁকেবেঁকে গোটা আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে।

হিসহিসে একটা অজানা শব্দ মাঝেমাঝে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে টিলায় টিলায়। হাতঘড়িতে সময় এখন প্রায় সাড়ে এগারোটা, সেই মুহূর্তেই চমকে উঠি আমরা! হলদে আভা ছড়িয়ে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে গোটা আকাশ জুড়ে... পরপর তিনবার। অর্পিতা আমাকে মৃদু ঠ্যালা দেয়, ও ভয় পেয়েছে একটা অজানা আওয়াজ শুনে- নেকড়ে বাঘের কান্নার আওয়াজ এটা। তবে কি এরাই রহস্যময় ওয়ার উল্ফ- যারা জ্যোৎস্নায় মহাশক্তিশালী হয়ে ওঠে? জ্যোৎস্নার আলো মেঘে ঢেকে ফেলায় কি কাঁদছে ওরা? আমাদের তিনজনের হাতের টর্চগুলোর আলোই কমে এসেছে। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে এক টিলার দেয়ালে প্রাকৃতিক ক্যান্টিলিভার ধাঁচের পাথরের নিচে দাঁড়িয়ে আমরা। দমকা বাতাসে মাথার উপরের পাথরে মুষলধারে বৃষ্টির ছাঁটগুলো আছড়ে পড়ছে। সেই জলের ঝাপটায় বারেবারে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আমাদের। কোথাও সামান্যতম প্রাণের স্পর্শ নজরে আসে না। শুধু চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া হলদে বিদ্যুতের ঝলকে দেখা যায় যেন এক রহস্যময় প্রেতলোকের অলিন্দে জীবন্ত প্রাণী আমরা তিনজন। হঠাৎ করেই আমাদের পায়ের তলার মাটি কাঁপতে শুরু করে। ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, টিলার উপর থেকে ভারি এক প্রস্তরখন্ড গড়িয়ে পড়েছে আমাদের বাম পাশে। খুব বেশি হলে পঞ্চাশ গজ দূরত্বের মধ্যেই। আমরা প্রাণের ভয়ে তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে থাকি। সামনে অর্পিতা, মাঝে আমি আর আমার পিছনে এলেক্স। কনকনে ঠান্ডা বৃষ্টির ফোঁটাগুলো কাঁটার মত যেন আমাদের হৃদপিন্ডগুলোকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছে। হঠাৎ আমার কাঁধে এসে পড়ে একটা হাতের স্পর্শ। তবে কি এলেক্স পিছন থেকে আমার কাঁধে হাত রেখেছে ? সহসা হাড় হিম করা একটা আর্তনাদের ধ্বনি ভেসে আসে। পায়ের তলার মাটি আমাদের একই ভাবে কেঁপে চলেছে। মাথা ঘুরতে শুরু হয়েছে আমার, তার মধ্যে টলতে টলতে আমি পিছন ফিরে তাকাই। মেঘের তলা থেকে ছড়িয়ে পড়া মরা জ্যোৎস্নার আলোয় আমার নজরে পড়ে এলেক্সের একটা কাটা হাত গড়িয়ে পড়ছে আমার কাঁধের উপর থেকে। দম ফাটানো আওয়াজে চিৎকার করে ওঠে অর্পিতা। টর্চের মৃদু আলোয় আমরা চমকে উঠি। আমাদের ঠিক পিছনে পরিখার মাঝে একটা ছোট পুস্করিণী, তারমধ্যে কালো জল টগবগ করে ফুটছে, অবাক লাগে আমার, খানিক আগে এখানে তো কোন জলের চিহ্ন ছিল না ! পুকুরের ভিতর থেকে এলেক্স

একটা হাত বাড়িয়ে আমাদের সাহায্য চাইছে, আমি সব ভয় ঝেড়ে ফেলে ছুটে যাই ওর কাছে।

"এলেক্স, আমার হাতটা ধরো একটু কষ্ট করে, আমি তোমাকে টেনে তুলে নিচ্ছি।"

আমার হাতটা স্পর্শ করার ঠিক আগেই ধীরেধীরে এলেক্স হারিয়ে যাচ্ছে পুষ্করিণীর ভিতরে। আকাশের বুকে এবার হলুদ আলোয় বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, তবে আমরা ঠিক যেভাবে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে অভ্যস্থ, এটা ঠিক তেমনটা নয়, প্রায় মিনিট খানেক একনাগাড়ে আকাশের বুকে কখনো এমাথায় কখনো ওমাথায় বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। সেই রহস্যময় আলোতে চমকে উঠি আমরা। সারাটা শরীর আমাদের ঠকঠক করে কাঁপছে, হৃদপিন্ডটা স্তব্ধ হয়ে যায় যেন ক্ষনিকের জন্য! যেটাকে সাধারণ পুস্করিণী বলে আমরা ভেবেছিলাম তার ভিতরে লাল রক্ত টগবগ করে ফুটছে। এলেক্সের হাতটা মিলিয়ে যায় সেই রক্তের ভিতরে। ভূমিকম্পের তীব্রতা এবার খানিকটা কমে এসেছে, আমি অর্পিতার হাতটা শক্ত করে ধরে ছুটতে থাকি, কিন্তু কোথায় যাব ! সামনে থেকে সেই বাদুড়ের দল আবার আমাদের ঘিরে ফেলেছে।

"ইন্দ্র চল, ওই সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকি, এছাড়া আমাদের বাঁচার কোন পথ নেই" অর্পিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওকে শান্তনা দেবার ভাষাও আমি হারিয়ে ফেলেছি। একটা অপরাধবোধ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, না জেনেবুঝে এরকম এক ভয়ংকর বিপদের মধ্যে আমি কেন ওকে টেনে আনতে চাইলাম ! বাদুড় গুলোর থেকে আমাদের দূরত্ব তখন খুব সামান্য, আমরা প্রাণভয়ে সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে পড়ি। ক্ষীণ আলোর রেখা ধরে এগিয়ে চলি আমরা, খানিক যাবার পর সুড়ঙ্গটা একটু একটু করে মাটির গভীরে প্রবেশ করেছে ঢালু পথে খানিক এগোবার পর তা বেশ বুঝতে পারি। আমাদের দুজনের হাতঘড়ি বন্ধ। সময় হয়তো এখানে এসে থেমে গেছে। ভিতরের আলো স্পষ্ট হচ্ছে একটু একটু করে। সুড়ঙ্গের পাথুরে দেয়ালের বুক থেকে আলোর দ্যুতি ঠিকরে বেড়োচ্ছে। কিন্তু এ তো কোন সাবেকি মশালের আলো নয়, তবে এ কিসের আলো ? তবে কি এই সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে গেলেই আমরা পাব সেই গুপ্তধনের সন্ধান ! হয়তো দুর্মূল্য কোন রত্নের আলোর ছটায় আলোকিত এই সুড়ঙ্গ পথ।

এখানেও কোন প্রানের স্পর্শ নজরে পড়ে না, ভয়ে ভয়ে আমরা

এগিয়ে চলি এক পা এক পা করে। সুড়ঙ্গ পথ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সুবিশাল এক অলিন্দ। আমরা চমকে উঠি সেখানে এসে, স্বর্পদেবী Angitia-র এক মূর্তি বসানো সেখানে। নানা অজানা রত্নের আলোয় ঝলমল করছে অলিন্দটা, অলিন্দের এক পাশে এক প্রস্তর নির্মিত দরজা। হঠাৎ পিছন ফিরে আমাদের বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে। এক অজানা মানুষ অলিন্দের প্রবেশ পথে সুড়ঙ্গের শেষে বসে আছে ! আমরা অলিন্দে প্রবেশের সময় তো মানুষটাকে দেখি নি ! তবে কে ইনি ! তাঁকে দেখে আমার হাত ছিটকে সেদিকে ছুটে যায় অর্পিতা।

"বাবা ! তুমি এখানে ? তুমি জানো না, তোমাকে আমি কত খোঁজা খুঁজেছি এতদিন ধরে, বলো বাবা, তুমি এখানে কি করে এলে !”

ইনি-ই কি তাহলে বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিস্টার গুপ্তা ? তাই যদি হয় তবে এত বছর ধরে তিনি কি ভাবে এই সুড়ঙ্গের ভিতরে রয়েছেন ? আচমকা মাতালের মতো টলতে টলতে উঠে দাঁড়ান ঐতিহাসিক সমর কুমার গুপ্তা। ভীষণ সেই মূর্তি, উচ্চতা তাঁর সুড়ঙ্গের ছাদ স্পর্শ করতে চাইছে, সারা শরীরে লোমে ঢাকা, ঠোঁটের দুইপাশ দিয়ে দাঁত গুলো বেরিয়ে আসছে। দু-হাত বাড়িয়ে সে আমাদের দুজনকে ছুঁতে চাইছে তবে কি রাজা সলোমনের শয়তান পূজারী অ্যারণ এর দাসে পরিণত হয়েছেন মিস্টার গুপ্তা ? এবার আমাদের হয়তো আর মুক্তি নেই!

হাতদুটো এগিয়ে আসছে আমাদের দুজনকে লক্ষ্য করে। ঠিক তখনই হিস হিসে একটা আওয়াজে চমকে উঠি আমি। বিশাল এক ভাইপার সুড়ঙ্গের দেয়াল বেয়ে এসে জড়িয়ে ধরেছে ঐতিহাসিক গুপ্তাকে। পুনরায় ধীরে ধীরে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে তার অবয়ব, সুড়ঙ্গের মেঝেতে যেন ঘুমিয়ে আছে মানুষটা।

"অর্পিতা, আমাদের এবার একটু নির্মম হবার সময় এসেছে"

আমি আমার রুকশ্যাক থেকে কিছু রসুন আর ধারালো ছুড়িটা বের করি। সারা আমাকে একবার বলেছিল কোন মনুষ্যরূপী ভ্যাম্পায়ারকে দেখতে পেলে আত্মরক্ষার এইটাই উপায়, এই ক্রশযুক্ত ছুড়িটা সমূলে তার হৃদপিন্ডে বিদ্ধ করে শয়তানের পাঁজরের ভিতরে এক মুঠো রসুন ভরে দেওয়া।

অবলীলায় সেটাই করতে যাই আমি। কেঁদে ফেলে অর্পিতা "আমার বাবাকে তুই মারিস না, প্লিজ, তোর পায়ে ধরছি।"

"অর্পিতা, তুই যাঁকে বাবা বলছিস, সে আর রক্ত মাংসের মানুষ

নেই রে। আর এক মুহূর্ত দেরি হলে ও আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে।" বলতে বলতে আমি ছুড়িটা সম্পূর্ণ বিদ্ধ করি তাঁর আর পাঁজরের বাম পাশে। তারপর সারার কথামত একমুঠো রসুন নিয়ে দু-হাতে ওর পাঁজরের ভিতরে ছড়িয়ে দিই। অচেতন দেহটা একবার ঈষৎ কেঁপে ওঠে, তারপর একটু একটু করে রেণু রেণু হয়ে মিশে যায় বাতাসের মাঝে।

এবার আমরা পাথরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াই। হিব্রু ভাষায় একটা মন্ত্র বলেছিল সারা, যেই মন্ত্রটা লেখা ছিল আনি বনির সেই বোতল মেলে। মন্ত্রটা বললেই নাকি সুলেমানি গুপ্তধনের দরজা খুলে যাবে আমাদের সামনে। চোখ বুজে সেই মন্ত্রটাই আমরা পাঠ করি। কিছুক্ষন পর পাথরের দেয়ালের ভিতর থেকে মৃদু একটা আওয়াজ ভেসে আসে, অবশেষে এক সময় আওয়াজটা পরিষ্কার হয় একটু একটু করে। ফাঁকা হচ্ছে পাথরের দেয়ালটা, তার ভিতরে তাকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যায় আমাদের। বহু শতাব্দীর এক অনাবিস্কৃত ধনভাণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা ! নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, এও সম্ভব !

আজ সাফল্যের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অর্পিতার বুকে মুখ রেখে কেঁদে ফেলি আমি, এলেক্সের এভাবে চলে যাওয়াটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না, অথচ এই সাফল্যের পিছনে এলেক্স ছিল স্তম্ভস্বরূপ, ও এভাবে নিখুঁত অঙ্ক কষে এই স্থানটা চিহ্নিত করতে না পারলে কিভাবে আসত এই সাফল্য ? অর্পিতা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তখন।

"চল ইন্দ্র, আমার মন বলছে এখানে বেশিক্ষন থাকলে যে কোন মুহূর্তে আমাদের বিপদ হতে পারে।" আমি রত্নভাণ্ডার থেকে এক তাল সোনা নিয়ে রুকশ্যাক এ ভরে ফেলি, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার নজরে আসে পাথরের দরজা আবার ধীরেধীরে বন্ধ হয়ে আসছে।

"অর্পিতা ! এক্ষুনি বাইরে চল, আর একটু দেরি করলেই হয়তো আমরা এই রত্নভাণ্ডারে বন্দী হয়ে যাব।" আমি অর্পিতার হাত ধরে এক ছুটে পাথরের দরজার বাইরে বেড়িয়ে আসি। একটু একটু করে আমাদের চোখের সামনে বন্ধ হয়ে যায় দরজাটা। দরজার বাইরে পাথর খোদাই করে হিব্রু ভাষায় কিছু একটা লেখা।

'נכס עושר זה יכול לשמש רק למען השלום ולמטרה של המונותיאיזם'

“কি লেখা আছে এখানে ?” আমি জানতে চাই অর্পিতার কাছে। জর্ডনের মিউজিয়ামে কাজের সুবাদে অর্পিতা হিব্রু ভাষাটা খানিকটা রপ্ত করেছে সেটা আমি জানতাম।

অর্পিতা ভালো করে কিছুক্ষন লক্ষ করে লেখাটা "এখানে লেখা আছে, এই ধন সম্পত্তি কেবলমাত্র শান্তি ও অধ্যাত্ববাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে।"

“তাই হয়তো আমরা ওই সোনাটুকু নেবার সাথে সাথে পাথরের দেয়ালটা বন্ধ হয়ে এল।" আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি।

"কিন্তু কেন ?"

"এ দেশ চেয়েছিল এই বিপুল ধনসম্পত্তির বিনিময়ে তারা সামরিক দিক থেকে বিশ্বের মধ্যে এক নম্বর হয়ে উঠতে, কিন্তু রাজা সলোমন সেটা চান নি।"

এবার থরথর করে কাঁপতে শুরু করে অলিন্দ থেকে সুড়ঙ্গ পথ। আমাদের এই মুহূর্তে এখান থেকে বেড়িয়ে যেতে হবে, অর্পিতাকে নিয়ে আমি দ্রুতপদে সুড়ঙ্গের পথে পা বাড়াই। সুড়ঙ্গ পথ একটু একটু করে সংকীর্ণ হয়ে আসছে দুদিক দিয়ে। অবশেষে আমরা যখন বাইরে বেড়িয়ে আসি, মরুভূমির বুকে কুয়াশার চাদর অল্প অল্প করে ফিকে হতে শুরু হয়েছে। কনকনে শীতে কাঁপছি আমরা দুজন, দুপাটির দাঁত ঠকঠক করে ঠোকা লাগছে বারবার।

"এখন আমাদের পথ চিনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কালিয়া গেস্ট হাউসে পৌঁছাতে হবে, নাহলে আমরা দুজনেই জমে যাব" প্রচন্ড ঠান্ডায় অর্পিতার মুখ থেকে একরাশ বাষ্প বেরিয়ে আসে, আমি ইশারায় ওকে বলি বেশি কথা না বলতে। কারণ শরীরের এই উত্তাপটুকু সম্বল করেই আমাদের এতখানি পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

মরুভূমির বুকে সূর্য উঠতে এখনো বহু দেরি। আমরা মরুপ্রান্তরে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে থাকি, প্রথম অভিযানের মতোই প্রকৃতির তান্ডবে আমাদের পোশাক ছিন্নভিন্ন। রুক্ষ পাথরে র ঘষায় অর্পিতার জিন্সটা কোমরের নীচ থেকে অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে, বাধ্য হয়ে এই ঠাণ্ডার মধ্যেও ওর লজ্জা নিবারনের জন্য আমি আমার জ্যাকেটটা খুলে তার হাতদুটো ওর কোমরের সাথে বেঁধে দিই। ক্ষুধা তৃষ্ণা আর তীব্র শীতে ও চলার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। আমার কাছে এখন সঞ্চয় বলতে একটা মাত্র সিগারেট। অর্পিতা ধূমপায়ী না হলেও এই শীতে

আমি ওকে বাধ্য করি ধূমপান করে শরীরটাকে একটু গরম করতে। আমি তখনো জানি না নিয়তি আমাদের জন্য কি লিখে রেখেছে, কিন্তু এই তীব্র ঠাণ্ডায় মরুভূমির মাঝে ক্ষনিকের জন্য থামতে হলে তার অর্থ একটাই, সেটা মৃত্যু। এখন আমার ক্ষমতা নেই অর্পিতার ভারী শরীরটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলার। একেকটা মুহূর্ত যেন একেকটা কাল হয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে আমাদের সামনে। পাথরের মধ্যে বারবার পা মচকে পড়ে যাচ্ছে অর্পিতা, ওর চোখ দুটো বুজে আসছে l হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে এক্ষুনি, অবশেষে !

"দেখ অর্পিতা, আমাদের আর কোন ভয় নেই, এই তো সেই খেজুর গাছের জঙ্গলটা, আমরা মেন রোডে চলে এসেছি, এখান থেকে ডান দিকে আর খানিকটা গেলেই!

অর্পিতা আমাকে জড়িয়ে ধরেই তাকাবার চেষ্টা করে, ওর চোখের মনিটা উল্টে আছে। অসম্ভব কাপুনি দিচ্ছে ওর সারা শরীরে, দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে অবশেষে কাঁধে তুলে নিই। মাথা ভীষণ রকম টলছে আমার, বারেবারে রাস্তার পাশের শুকনো কাঁটা গুল্মের গোড়ায় হোঁচট খাচ্ছি। এই ঠান্ডার মধ্যে এখনো প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা আমাকে যেতে হবে, যেতেই হবে, কারণ আমি বাঁচতে চাই, অর্পিতাকে বাঁচাতে চাই, আমার যে অনেক স্বপ্ন জমা হয়ে আছে ওকে ঘিরে, সেগুলোকে সত্যি করতে চাই আমি। কিন্তু পারব তো ? অর্পিতাকে কাঁধে করে মাতালের মতো টলতে টলতে আমি এগোই। ও নিজেকে সম্পুর্ণ ছেড়ে দিয়েছে আমার শরীরের উপর। আমার মাথা এবার ভীষণ রকম ঘুরছে, পিছন থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসে। কিন্তু নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে রাস্তার এক ধারে যাবার ক্ষমতাটুকুও আমার নেই, আর ঠিক তখন ই... ক্যা-চ! আমার পিছনে প্রাণপণে ব্রেক কষে দাঁড়ায় গাড়িটা। আমি পিছন ফিরে তাকাতে যাই, কিন্তু পেরে উঠি না, কোনক্রমে অর্পিতার শরীরটাকে আঘাত থেকে বাঁচিয়ে আমি লুটিয়ে পড়ি রাস্তার উপর।

আমি ও কি এবার চেতনা হারিয়ে ফেলব ? এই নিষ্ঠুর শীতের মধ্যে আমি বুঝতে পারি কে যেন পরম মমতায় ফ্লাক্স থেকে গরম জল আমাদের হাতে, মুখে গলায় ছিটিয়ে দিচ্ছে। তারপর ফ্ল্যাক্সের ঢাকনায় করে গরম দুধ আমাদের মুখের সামনে ধরে সে। দু চোখে অসম্ভব পিচুটি কেটেছে, সব ঝাপসা লাগছে, তার মধ্যে এটুকু বুঝতে পারি সারা

এসেছে আমাদের রক্ষা করতে দেবদূতের মতো। আমাদের দুজনকে ও বহু কষ্টে গাড়িতে নিয়ে তোলে, তারপর আমি আর কিছুই মনে রাখার অবস্থায় ছিলাম না। কালিয়া গেস্ট হাউসে নাকি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দল ছিলেন আমাদের জন্য। সন্ধ্যের আগে যখন আমার জ্ঞান ফেরে, তখন আমার বেডের পাশে স্ট্যান্ডে স্যালাইনের বোতল ঝুলছে। উল্টো দিকের বিছানায় অকাতরে ঘুমোচ্ছে অর্পিতা, ওর জ্ঞান ফেরে সন্ধ্যার কিছু পরে।

আমার ধারণা ছিল এই অভিযানের সাথে অন্যান্য যারা ছিলেন, তারা হয়তো কোন প্রতিকূলতার কারণে আমাদের পৌঁছবার আগেই অভিযান থেকে ফিরে এসেছিল। এখন আমি জানতে পারি, তাদের কেউ ফিরে আসে নি, আজ সারাদিন ধরে মরুভূমির বুকে তল্লাশি চালিয়েও তাদের কোন হদিস পাওয়া যায় নি, এমনকি এলেক্সের মৃতদেহটির সন্ধান ও মেলে নি। চমকে উঠি আমি! মোসাদের মতো দুনিয়া কাঁপানো ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের নজর এড়িয়ে তারা কোথায় যেতে পায়ে! এলেক্স বলেছিল জেসিবি-র কেবিনে ও রক্তের ছাপ দেখেছে আর বুলডোজারে তো রক্তের দাগ আমি নিজের চোখেও দেখেছিলাম। বেশ কয়েকটা হিসাব কিছুতেই আমি মেলাতে পারি না। তবে কি বাকি যারা এই অভিযানের সাথে যুক্ত ছিল, তারা সুলেমানি গুপ্তধনের লোভে আমাদের আগেই অভিযান শুরু করেছিল? কিন্তু সেটাই যদি হয়, তাহলে এলেক্স কি দোষ করেছিল! কেনই বা সারা ওর আঙ্গুলের রূপোর আংটিটা অভিযানে বেরোবার আগে খুলে রাখতে বলেছিল? তবে কি শয়তান অ্যারণ-এর ক্রীতদাস ভাম্পায়ারদের হাতেই ওকে প্রাণ দিতে হলো? সারার দেওয়া রসুনগুলো ও গাড়িতে আসার পথে মাঝ রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। কোন রকম কুসংস্কার মানতো না এলেক্স, কিন্তু এগুলো কি শুধুই কুসংস্কার ছিল? সারা কেন এই অভিযানে আমাদের সাথে যায় নি ! কেনই বা দু - দুটো নেকড়ে মরুভূমির বুকে আমাদের রক্ষা করতে ছুটে এসেছিল! এ সব প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে ?

এই ভয়ংকর অভিযানের মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে অর্পিতা ও আমার প্রায় এক সপ্তাহ লেগে যায়। এই সময় শহরের এক নামী সরকারি হাসপাতালের কেবিনে আমাদের রাখা হয়, প্রতিদিন শহরের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ আমাদের দেখতে আসতেন। প্রায় দশদিন পর আমি খানিকটা সুস্থ হবার পর মিস্টার হ্যালভে আমাকে ডেকে পাঠান।

আমার ধারণা ছিল উনি এই অভিযানের ব্যর্থতা নিয়ে আমাকে দায়ী করবেন, কিন্তু তা তিনি কোনোভাবেই করেন নি, বরং আমার কাছ থেকে প্রতিটি ঘটনা মন দিয়ে শোনার পর উনি সহানুভূতির সাথে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

"মোসাদ সবসময় তোমার পাশে আছে, সবার আগে বল এখন তুমি কি করতে চাও ?"

"আমি দেশে ফিরতে চাই স্যার।" আমার কথায় কিছুক্ষন গম্ভীর হয়ে যান হ্যালভে স্যার, হয়তো খানিকটা বিস্ময়েই।

"এটা ঠিক যে অপারেশন স্পাইডার এক্স আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু এই অভিযানের থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, আর তার চেয়েও বড় কথা এই অপারেশনে তোমার অধিনায়কত্ব আমাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেকারণে আমরা আরও বড় গুরুদায়িত্ব তোমাকে দিতে চাই।"

"এই মুহূর্তে আমি কিছু ভাবতে পারছি না, হোম সিকনেস কাটাতে সবার আগে আমি কিছুদিনের জন্য ইন্ডিয়ায় ফিরতে চাই।"

"ওকে, হোয়াটেভার ইউ লাইক, তবে তোমার মতো একজন বর্ন ক্যাপ্টেনকে মোসাদ ভীষণভাবে মিস করবে।"

অবশেষে স্যার আমার দেশে ফেরার সবরকম ব্যবস্থা করে দেন। এবার শুধু অপেক্ষা দেশের মাটিতে পা রাখার। কিছুদিন দেশে কাটিয়ে লিজার্ট পয়েন্টে God Angitia-র মন্দির নির্মাণ করতে যেতে হবে, তা না হলে এই জীবনে আমার মুক্তি নেই।

।। অবশেষে দেশে ফেরা।।

৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১, আর ঠিক এক সপ্তাহ বাদে আমি দেশে ফিরব, এলেক্সের মৃত্যুর আঘাতটা আমি এখনো মেনে নিতে পারছি না, আমার মনের মধ্যে এখনো একটা বিষয় তোলপাড় করে চলেছে, সারার কথা মত এলেক্সকে আমি যদি রুপোর আংটিটা খুলে রাখতে বাধ্য করতাম, তাহলে হয়তো ওকে এভাবে চলে যেতে হতো না। হয়তো গুপ্তধন কক্ষে পৌঁছানো অবধি ওয়ার উলফরা আমাদের রক্ষা করে গেছে। এলেক্সকে ওরা রক্ষা করতে পারে নি, কারণ চন্দ্রের দেবী Selene র অভিশাপে রুপোর কাছে চরম অসহায় ওই ওয়ার উলফ প্রজাতি, সেই সুযোগেই কি শয়তান অ্যারণ এর দাস ভ্যাম্পায়ারের দল ওকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে ?

শীতের সকালে একাকী বারো তলার ছাদে বসে এসব কথাই ভাবছিলাম, কংক্রিটের জঙ্গলে নিচে জেরুজালেম শহরটার এখনও ভালো করে ঘুম ভাঙে নি। খানিক দূরে কুয়াশা মাখা The Church of the Holy Sepulchre এর নীল চূড়াটা ধোঁয়াটে লাগছে ভোরের মৃদু আলোতে। তার একপাশে একেবারে নিচে সর্পিল ফ্লাই ওভারের বুক চিরে দু - একটা গাড়ি চলে যায় নিজের খেয়ালে। নিঃশব্দে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সারা, "দাদা, রাতে ঘুম হয় নি তোমার ?"

"আ, হ্যাঁ, ঘুমিয়েছি তো।”

“আমার কাছে লুকোচ্ছ দাদা? কি করবে বলো, নিয়তি কাউকে কেড়ে নিয়ে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনার সাধ্য কার !”

সারার কাছে আমার কতকিছু জানতে মন চাইছে কিন্তু পারলাম কই, ওর এই আন্তরিক ব্যবহারের কাছে হয়তো নিজেকে আর সামলে রাখতে পারতাম না, বুকের ভিতরের চাপা কষ্টগুলো বাষ্প হয়ে হয়তো দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তো তাই শুধু মৃদু হাসি আমি।

“এবার আমাকে তুই বল দেবী Angitia-র মন্দির আমি কবে কিভাবে নির্মাণ করতে যেতে পারব ?"

"সেই দিন এখনো অনেক বাকি দাদা।"

"তার মানে ?"

"চন্দ্রগ্রহণের একপক্ষ কালের মধ্যে যখন রবি কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবে, সেই পনের দিনের মধ্যে দেবীর মন্দির নির্মাণ করতে হবে" সারার কথা ঠিকমত বুঝতে না পারায় আমি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে

থাকি ওর দিকে। "হ্যাঁ দাদা, এই দিনটার জন্য তোমাকে আরও প্রায় ১৭ টা বছর অপেক্ষা করতে হবে ২০১৮ সালের ৭ আগস্ট চন্দ্রগ্রহণ, তার ঠিক পনেরো দিনের পর ২২ অগস্ট সন্ধে ছটা কুড়ি মিনিটে রবি কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবে, তোমাকে God Angitia-র মন্দির নির্মাণ করতে হবে ঠিক এই সময়টাতেই। আমি চমকে উঠি সারার কথায়, তার মানে এতগুলো বছর আমাকে এই চাপ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে !

"সতেরো বছর...!" নিজের অজান্তেই যেন আঁতকে উঠি আমি।

"তাহলে তাদের কথা একবার ভাব, যাঁরা জন্মজন্মান্তরকাল God Angitia-র অভিশাপ বয়ে নিয়ে চলেছে, সেখানে সতেরোটা বছর তোমার কাছে এত দীর্ঘ মনে হচ্ছে দাদা ?"

"তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না" আমি বিস্ময়ের সাথে বলি।

"ও কিছু না, তুমি বরং বস, আমি অর্পিতাকে ডেকে দিই। এই শহরকে বিদায় জানাবার আগে ছাদে বসে অপরূপ সূর্যোদয়টা উপভোগ করতে হয়তো তোমাদের ভালোই লাগবে।"

অর্পিতা হয়তো এখনো ঘুমাচ্ছে। কিন্তু আমার খুব প্রয়োজন ওর সাথে, আমরা দুজনেই ঠিক করেছিলাম এখান থেকে দেশে ফিরে আমরা বিয়ে করব, কিন্তু...! মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক দেবী Angitia-র মন্দির নির্মাণের আগে কোনরকম শারীরিক সম্পর্কের অর্থ একটাই, অভিশপ্ত ওয়ার উলফের দুর্বিষহ জীবন বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে আমাকে কিংবা আমাদের দুজনকেই হয়তোবা জন্মজন্মান্তরের জন্য। অর্পিতাও এই কদিনে অনেকখানি ভেঙে পড়েছে, বাবাকে ফিরে পাবার একটা ক্ষীণ স্বপ্ন ও এতদিন ধরে দেখে এসেছিল, খিরবেত কুমরানের প্রান্তরে এসে ওর সেই আশাও নিভে গেল।

ছাদের পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে হয়তো এসব কথাই ভাবছিলাম। তার মধ্যে অর্পিতা আমার পিছনে এসে দাঁড়ায়, এলোমেলো চুল, রাতপোশাকেই ও সোজা ছাদে উঠে এসেছে। "অর্পিতা, তোর সাথে কিছু কথা ছিল আমার।"

"হ্যাঁ, সারা আমাকে সব বলেছে" নিচু গলায় বলে অর্পিতা।

"এই পরিস্থিতিতে সতেরোটা বছর অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কি করার আছে বলতো ? প্লিজ, আমাকে তুই এজন্য ভুল বুঝিস না।"

"না, ভুল বোঝার কি আছে ! জীবনে একাই যখন চলতে হবে, তখন এইসব ফালতু সেন্টিমেন্ট বয়ে বেরিয়ে কি লাভ ? আর তাছাড়া..."

"তাছাড়া ?"

"জীবনে সব সম্পর্ক কি পূর্ণতা পায় বল তো ?"

“অর্পিতা, আমি কিন্তু সেটা বলতে চাই নি রে, তোকে আমি আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই।"

“দয়া করছিস আমাকে ?"

"দয়া কেন বলছিস ?"

"তাহলে কি বলব তুই বলে দে"

"অর্পিতা !"

"তুই আমাকে তোর বাড়িতে নিয়ে যেতে চাস, হয়তো বা খেলার ছলে সিঁদুর ও তুলে দিবি আমার সিঁথিতে, ব্যাস! শুধু ওইটুকুই, তোর কাছে আমি একটু শারীরিক সম্পর্ক চাইতে পারব না, একটা সন্তান চাইতে পারব না, তোর একটু আদর খেতে গেলেও নিজের মনকে বোঝাতে হবে যে এগুলো ঠিক হচ্ছে না, আচ্ছা বল তো এভাবে কি এক ছাদের তলায় থাকা যায় ? আমি মেয়ে বলে কি আমার সামান্যতম ইচ্ছে, অনিচ্ছে চাহিদা বলে কিছু থাকতে নেই ?” আমি মাথা নিচু করে ফেলি ওর কথায়। “আমি জানি আমার কথাগুলো হয়তো তোর খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর, দিনের পর দিন নিজের কাছে আমি হেরে যাচ্ছি, জন্মের সময় বিধাতা পুরুষ এত্ত সুন্দর একটা কপাল আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন না রে !”

“তাহলে এখন তোর কি ইচ্ছে ?"

"আমি আবার জর্ডনেই ফিরে যাই রে ইন্দ্র। তোকে আমি কোন অভিযোগ করছি না, কিন্তু সত্যি বলছি এভাবে আমি চলতে পারবো না।"

"তুই কি আমার জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছিস ?"

"তা তো আমি বলি নি, এই কয়েকটা দিনে তুই আমাকে যে ভালবাসাটুকু দিলি, এটাও আমি জীবনে কারোর কাছে পাই নি রে। সতেরো বছর বাদে যদি তুই আমার কাছে ফিরে আসতে চাস, দেখতে পাবি আমি একই ভাবে তোর জন্যই অপেক্ষা করে আছি... অবশ্য সতেরোটা বছর আমি যদি বেঁচে থাকি, আমার ভাগ্যটা তো খুব ভালো! তাই কোন কিছুতেই আর নতুন করে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে না।"

"সত্যি তুই আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবি তো অর্পিতা ? দেখে নিস, এই সতেরোটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

"থাকব রে, তবে আমাকে ও তোর একটা কথা দিতে হবে, এর

মধ্যে তুই আর আমার সাথে দেখা করতে ছুটে আসবি না, তাহলে যে আমি আবার দুর্বল হয়ে যাব।"

অর্পিতা কাঁদছে আমার বুকে মাথা রেখে, যেই কান্নাটা খিরবেত কুমরান থেকে ফিরে আসার পর ওকে আমি কাঁদাতে পারি নি, আজ সেই গুমোট আকাশের বুকে বৃষ্টি নামল, মরুভূমির পাথরের বুকে বইল জলধারা। অবশ্য এই কান্নার কি শেষ আছে! নির্জন ছাদে আমার বুকে মাথা রেখে অর্পিতা যেই কান্নাটা শুরু করেছিল, সেই কান্নাটা ঠিক একই ভাবে কেঁদেছিলাম আমরা দুজনেই তেল আভিভের বেন গুরিয়ান এয়ারপোর্টে পাশাপাশি বসে, সেই কথাই এখন তোমাদের বলব।

১৩ ফেব্রুয়ারি, বেলা এগারোটায় আমরা বিমানবন্দরে পৌঁছাই, আমরা বলতে আমি আর অর্পিতা। সারাও এসেছিলো আমাদের সাথে আমাদের দুজনকে বিদায় জানাতে। অর্পিতার জর্ডনগামী বিমান এখান থেকে বেলা একটা চল্লিশে। আমার বিমান ছাড়বে বিকেল তিনটায়। সতেরো বছরের মতো আমরা দুজন বিদায় নিতে চলেছি দুজনের কাছ থেকে। এয়ারপোর্টের ওয়েটিং হলে অর্পিতা আমার পাশের সিটে বসে আমার হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছে, ওর ঠোঁটদুটো তিরতির করে কাঁপছে, হয়তো অনেক না বলা কথা ও আমাকে বলতে চায়, হয়তো বা আমার সাথে যেতে চায় ও, আমার ও মন চাইছিল ওকে একবার আমার অধিকারে শাসন করে বলি, "তোকে আমি আর কিছুতেই জর্ডনে ফিরে যেতে দেব না, তুই আমার সাথে দেশে ফিরবি এখন" চিরকালই বড় অভিমানিনী সে, হয়তো বুক ফেটে গেলেও অভিমানের জাল ছিঁড়ে ও কিছুতেই আমার সাথে যেতে চাইতো না।

"শরীরের দিকে একটু নজর রাখিস ইন্দ্র, আজ সকাল থেকে তো তুই কিছুই খেলি না, মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে দেখেছিস একবার ?"

"কি জানি, এরপর এই কথাগুলো শোনার জন্য আমাকে কত বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে !" অশ্রু ভেজা চোখে মৃদু হাসি, হয়তো অর্পিতার নজর এড়িয়ে চোখের জলটা মুছে ফেলার চেষ্টা করি,... কিন্তু অর্পিতাও তখন কাঁদছে। আমার হাতটা ছেড়ে ওকে এগোতে হবে এখন, ওর বিমানের সময় হয়ে এসেছে যে।

অর্পিতা চলে যাবার পর সারা আমার পাশে বসে নানাভাবে আমাকে শান্তনা দেয়, কিন্তু সত্যি বলতে আমার মন তখন পড়ে আছে অর্পিতার কাছেই। তার কিছুক্ষণ পর আমার মুম্বাইগামী উড়ানের সময় হয়ে

গেলে আমি সারার কাছ থেকে বিদায় নিই। এদেশে আসার পর থেকে ওর সহচার্য আমার ভোলার নয়, জানি না ওর সাথে আমার আবার কবে দেখা হবে! "বিদায় বোন, তুই ভাল থাকিস, আমি আশীর্বাদ করি, একটা সুন্দর সুখী জীবন যেন তোর সঙ্গী হয়।"

"সবটাই তো তোমার হাতে দাদাভাই," হেয়ালি করে বলে সারা।

বড় অদ্ভুত লাগে মাঝেমাঝে সারাকে ! মাঝেমধ্যে এমন একেকটা কথা বলে যার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারি না, ঠিক যেন মাইকের মতো আমার ফ্রেন্ড, ফিলোজফার, গাইড, আর সর্বপরি আমার ছোটবোন, আদরের ছোট্টবোনটা। এই কদিনের মধ্যে কিভাবে যে ও মায়ায় ফেলে দিয়েছে আমাকে তা বলে বোঝাবার নয়, জীবনের এই অধ্যায়টার পরিসমাপ্তিতে আমি মিস করছিলাম মাইককেও, আজ ভেবেছিলাম হয়তো আমাকে চমকে দিয়ে হাজির হবে ও, মাইক কিন্তু আসে নি আজকে, এয়ারপোর্টে আসার মধ্যে আমি দুবার ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওর নাম্বারটা কিছুতেই লাগাতে পারলাম না, মিস করছি হ্যালভে স্যারকেও, তাঁর মত স্নেহ এদেশে আসার পর আমি খুব কম জনের কাছ থেকেই পেয়েছি। গ্রাহাম সাহেবের আতিথিয়তাও আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। হিংস্র মাউন্টেন উলফটাকে কিভাবে তিনি এতখানি পোষ মানালেন, সেটা আমার কাছে রহস্যই রয়ে গেলো। যেমন রহস্য রয়ে গেল নেপলস থেকে মুম্বাই ফেরার পথে সেই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত ভাইপার সাপ টা! বিমানের একজিকিউটিভ ক্লাসের জানলার পাশে বসে হয়তো এরকম নানান কথাই ভাবছিলাম, হঠাৎ বিমানটা মৃদু ঝাঁকুনি দেয়, জানালার নিচে রানওয়েটা দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে পিছন পানে ছুটে চলেছে। অবশেষে ইজরায়েলের মাটির সাথে ছিন্ন হয় আমার সকল যোগাযোগ। ভবিষ্যতে স্পাইডার এক্সের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে ইসরায়েলের আদালতে একটি মামলা হয়েছিল, সেখানে সাক্ষী দিতে তিনবার এসেছিলাম এখানে, কিন্তু প্রথমবারের সেই হাড়হিম করে উত্তেজনার পরশ তখন আর ছিল না।

মুম্বাই বিমানবন্দরের কাস্টমস অফিসার আমার লাগেজ চেক করতে করতে স্ক্যানারের দিকে চেয়ে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, আপনি কি লাগেজে পাথর নিয়ে ঘুরে বেড়ান ?"

"বিদেশ থেকে তো আর দামি কিছু আনার আমার পয়সা নেই, তাই পাথরটাই ওদেশের স্মৃতি হিসেবে নিয়ে এলাম।"

আমি মৃদু হেসে বলি, কাস্টমস অফিসার আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেন, আমি কিন্তু স্বর্ণখন্ডটা নিয়ে সম্পূর্ন দুশ্চিন্তামুক্ত ছিলাম প্রথম থেকেই। দেবী Angitia-র মহিমা আমি যতখানি বুঝেছি, তারপর ভয় পাবার আমার আর কোন কারণ ছিল না। অবশেষে মুম্বাই বিমাবন্দর থেকে ভোরের ফ্লাইট ধরে সকাল আটটায় দমদম বিমান বন্দরে আমার পা রাখা। বিদেশ থেকে ফিরে সত্যি এক অপার্থিব আনন্দের মধ্যেও অর্পিতাকে বড় বেশি করে মিস করছিলাম। এবার ক্লান্ত শরীরটাকে ট্যাক্সিতে এলিয়ে দিয়ে সোজা বাড়ির পথে।

অবশেষে সকাল নটার আশপাশে সময় ট্যাক্সি আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের ৪ নভেম্বর আমি বাড়ি ছেড়েছিলাম, সাতাশ মাস পর আবার আমি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। সদর দরজার সামনেটা জংলি লতাপাতায় ভরে গেছে। পাশের বাড়ি থেকে চাবি এনে প্রাচীরের দরজাটা খুলতে যাই, কিন্তু জং ধরে ওই তালা আর খোলার অবস্থায় নেই, কাজেই পাড়ার একটা ছোকরা মিস্ত্রিকে ডেকে তালাটা ভাঙতে হলো। প্রাচীরের ভিতরেই চারপাশে শুধুই আগাছার জঙ্গল। ঘরের কার্নিশ, তুলসীমঞ্চ, কলের প্লাটফর্ম সব জায়গায় কালচে পুরু শ্যাওলার আচ্ছাদন পড়ে গেছে দিনের পর দিন অব্যবহৃত হয়ে থেকে। অনেক কসরত করে মিস্ত্রি ছেলেটা তালায় নারকেল তেল দিয়ে ভাঙার পর ময়লা পড়া সদর দরজাটা বেশ জোরে ঠেলেই ভিতরে ঢুকলাম। ইলেক্ট্রিক নেই, সম্ভবত এতদিন বাড়িতে না থাকায় ইলেকট্রিক সাপ্লাই এর কর্মীরা বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এখন সবার আগে ঘরদোর সাফ করার জন্য একটা লোকের দরকার। মিস্ত্রি ছেলেটার কাছেই শুনলাম আমাদের বাড়ির সাংঘাতিক একটা বদনাম হয়ে গেছে এই কয়েক বছরে। সবাই আড়ালে এ বাড়িকে এখন সাপের বাড়ি বলে ডাকে। সন্ধের পর বাড়ির চারপাশে নানা অজানা সাপের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যায় যদিও তারা কখনো কারোর কোন ক্ষতি করেনি বা বাইরে এসেও কাউকে দংশন করে নি কিন্তু একবার দু-দুটো ছিচকে চোর প্রাচীর টপকে চুরি করতে গিয়ে সাপের ছোবল খেয়ে মরেছে বেশ বুঝলাম দেবী Angitia-র নজর চারিদিকে।

পাড়ার দোকান থেকে একটা ছোট স্টোভ, কেরোসিন তেল ও কিছু মুদি বাজার সেরে বাড়ি এলাম। ছেলেটাকে বারবার চা খেয়ে যাবার

জন্য অনুরোধ করলেও ও রাজি হলো না। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এক কাপ চা ! এতো বোকা কেউ আছে নাকি? কাজেই ওর প্রাপ্য টাকা ওকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি ঘর পরিস্কারে লেগে পড়ি। এতো বদনামের পর কি আর ঘর পরিস্কারের লোক মিলবে ?

সারাটা দিন বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই কাটিয়ে দিলাম। ঘর পরিষ্কার, রান্নাবান্না, ইলেক্ট্রিক অফিস, গ্যাসের অফিস, টেলিফোন অফিস সব জায়গায় ফোনাফুনি, ভ্যাপসা গন্ধ ধরে যাওয়া বিছানাপত্র রোদে দেওয়া, আলনা ও আলমারির বহু জামাকাপড় ধরে পত্রপাঠ ধোপার জিম্মায় পাঠানো, দেবী Angitia-র পূজা এসব করতে করতে একটা দিন কোথা দিয়ে শেষ হয়ে যায়। তবে এখানে আসার পরেও একটা চমক আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল সেকথা তোমাদের এবার বলবো।

ইংলন্ড থেকে ইসরায়েল রওনা হবার আগেই আমার ব্যবহৃত মোবাইল, সিম ইত্যাদি জমা রেখে আমাকে সম্পুর্ন নতুন নাম্বারের সিম সহ মোবাইল ফোন দিয়েছিল মোসাদ, তা তোমাদের আগেই বলেছি, সেকারণে এদেশে আমার পরিচিত কারোর সাথেই যোগাযোগ করার সুযোগ আমার বড় একটা ছিল না, অবশেষে এ দেশে আসার আগে আমি আমার ব্যবহৃত পুরোনো নাম্বারের সিমটা মোসাদের কাছ থেকে ফেরত পাই। ঘরের আনুষঙ্গিক কাজ সারার পর আমার প্রথম দায়িত্ব ছিল স্বপ্নাকে একটা কল করা। স্বপ্না আদালতে আমার জুনিয়র। একজন আইনজীবী রূপে ঈষৎ মাথামোটা হলেও জুনিয়ার লয়ার হিসেবে সে ছিল অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বস্ত। সেকারণে আমি আমার সমস্ত মামলার ব্রিফ ও আইনের দুস্প্রাপ্য বইপত্র ওর হেফাজতে রেখে গিয়েছিলাম পরম নিশ্চিন্তে। ওকে বলেই রেখেছিলাম কোন মামলায় মুভ করতে সমস্যা হলে আদালতের বর্ষীয়মান আইনজীবী সরকারবাবুকে সিনিয়র হিসেবে রাখতে, তবু আমি একটা বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম বহু মামলায় ওর ভুলভাল সিদ্ধান্ত হয়তো আমার প্রতি আমার মক্কেলদের বিশ্বাস ও আস্থাকে একধাক্কায় মেয়েটা অনেকখানি তলানিতে নিয়ে গিয়ে ফেলবে এতদিনে।

“হ্যালো"

"হ্যালো দাদা, কবে ফিরলেন আপনি ?” বহুদিন পর আমার ফোন পেয়ে উচ্ছাসিত লাগে ওর কন্ঠস্বর। আমি ও উচ্ছাসিত আমার হাতে গড়া পরম স্নেহের পাত্রী জুনিয়ারের কন্ঠস্বর বহুদিন পরে শুনে, তাও

ওর পিছনে লাগার বদাভ্যাসটা ছাড়তে পারলাম না।

"কি রে ছাগলী, এই সোয়া দু বছরে সব মামলাগুলো ঘেটে ঘোল করে রেখেছিস তো ?"

আমার কথায় ফোনের অপর প্রান্তে খানিকটা গম্ভীর হয়ে যায় ও,

"ইন্দ্রদা, আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন, আপনার সাথে আমার বিশেষ দরকার।"

"যাচ্ছি, তুই বাড়িতে আছিস তো এখন ?"

“বাড়িতে না দাদা," স্বপ্না আমাকে গড়িয়াহাট অঞ্চলের একটা ঠিকানা দেয়। সেটা লিখে নিয়ে বাইকটা বের করে স্টার্ট দিতে যাই আমি, কিন্তু দীর্ঘ্যদিন ব্যাবহার না হওয়ায় সেটাও আর আমার ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত ছিল না, অগত্যা মোড়ের মাথায় এসে একটা ট্যাক্সি ধরে নিই। স্বপ্না আমাকে যেখানে আসতে বলেছিল বাস্তবিক সেটা ঝাঁ চকচকে এক লয়ার্স চেম্বার। আপাতদৃষ্টিতে কমবেশি ১৫০ স্কয়ারফুট বা তার চাইতে সামান্য বড় একটা ঘরকে নিখুঁত ইন্টেরিয়ার ডিজাইনিংয়ের গুনে চেম্বার, মক্কেলদের বসবার জায়গা বই এর শোকেস সব বানানো হয়েছে। চেম্বারে মানুষজনের ব্যস্ততা নজরে পড়ে আমার। রিসেপশন কাউন্টারের একপাশে দাঁড়িয়ে আমি ফোন করি স্বপ্নাকে, চেম্বারের ভিতর থেকে শশব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে ও। "ভিতরে আসুন দাদা" চেম্বার কক্ষে থাকা মক্কেলকে কিছুক্ষনের জন্য বাইরে বসতে বলে সে।

“এটা কার চেম্বার স্বপ্না ?" অবাক হয়ে আমি জানতে চাই।

“Can’t you see when you enter the house from outside, Adv Indranil Dasgupta ?” স্বপ্না চিরাচরিত ভাবে আমার সাথে মজা করতে চাইছে বেশ বুঝতে পারি।

তাই কৌতূহলবশত আমি চেম্বারের দরজার বাইরে কপার প্লেটে লেখা নামটা দেখতে যাই, এই রুমে ঢোকার মুখের আলোটা খানিক আগে নেভানো ছিল বলে দরজার উপরে লাগানো প্লেটটা আমার নজরে আসে নি, এখন সম্ভবত আলোটা ভিতর থেকে কেউ জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর সেই আলোতে দেখতে পাই নেম প্লেটে স্বপ্নার নামের উপরে লেখা আমার নাম, কিন্তু এ কি করে সম্ভব ! মুচকি হাসছে তখন স্বপ্না। ওর কাছেই জানতে পারি, আমি চলে যাবার পর সব গুরুত্বপূর্ণ মামলা গুলো সে একাই সামলেছে, শুধু তাই নয়, এমন জটিল কিছু

মামলা এই সময় ওকে মুভ করতে হয়েছে যেই ধরনের মামলা মুভ করার অতীতে ওর কোনোরকম অভিজ্ঞতা ছিল না। কিভাবে এটা সম্ভব হল সেটা স্বপ্নার কাছেই একটা বিস্ময় সূচক প্রশ্ন! শুধু তাই নয়, ডায়েরী খুলে ও দেখায় এই তিনবছরে আমাদের মক্কেলের সংখ্যা বেশ কয়েকগুন বেড়ে গেছে। যেই কারণে গড়িয়াহাটের মতো ব্যস্ত জায়গায় এই চেম্বার নেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং সেটা বুক করা হয়েছে আমারই নামে, বায়নার পঁচিশ শতাংশ অর্থের সাথে মোটা টাকার ব্যাংক ঋণের কিস্তি ও এই তিনবছরের আমাদের ফার্মের প্র্যাক্টিসের থেকে উপার্জিত অর্থের থেকেই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। কেবল আমার ফেরার অপেক্ষায় এই রুমের রেজিস্ট্রিটা কে বিলম্বিত করা হয়েছে এতদিন। চেম্বারের ভিতরে একটা বিলাসবহুল চেয়ার সাদা কাপড়ে ঢাকা দেওয়া, এটা নাকি সে সম্পূর্ণ ওর রোজগারের অর্থে আমাকে গুরুদক্ষিণা দেবার জন্যই কিনেছে।

সব শুনে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করি আমার কনিষ্ঠ সাহাদরাতুল্য মেয়েটিকে। "অনেক অনেক বড় হ তুই, একজন আইনজীবী হিসেবে তোর সুনাম যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে" আনন্দ ও অনাবিল এক পরিতৃপ্তিতে আমার চোখে জল চলে আসে, হয়তো ওর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ও, সেই সাথে দেবী Angitia-র প্রতি অপরিসীম এক ভক্তিতে, এতো বড় একটা সৌভাগ্য দেশে ফেরার পর আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল !

ধীরেধীরে এবার অভ্যস্থ হয়ে যাই এখানকার পরিচিত সেই ব্যস্ত জীবনে। তবে অর্পিতার সাথে প্রায় প্রতিরাতেই ফোনে আমার কথা হত ব্যয়বহুল I.S.D. কলে, সারাদিনে অন্তত দুমিনিটের জন্য হলেও। মোসাদ তাদের প্রতিশ্রুতি মত প্রতিমাসে মোটা অঙ্কের টাকা আমার একাউন্টে পাঠাতো, আর টাকাটা আসতো এদেশের কোন নাগরিকের ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে মামলার কনসালটেশন ফিস বা এই ধরণের হোয়াইট ফর্মেই। মাইক, সারা ওদের সাথেও যোগাযোগটা ছিন্ন হয়ে যায় নি, মোটের উপর নিস্তরঙ্গ দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল বেশ দ্রুতগতিতেই।

এই বৈচিত্রহীন জীবনে একদিন আচমকাই আবার বিদ্যুতের ঝলকানি খেলে যায়। ঠিক যে দিনটার অপেক্ষাই করছিলাম আমি। সেদিন চেম্বারে বসে আমি পরেরদিনের কয়েকটা মামলার পিটিশন রেডি করছিলাম, স্বপ্না দরজা ঠেলে ভিতরে এসে ঢোকে, "দাদা, একজন বয়স্ক বিদেশী ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে, আমি কি ওনাকে পাঠিয়ে দেব ?"

"হ্যাঁ, পাঠিয়ে দে," স্বপ্না সেই মানুষটাকে ডাকতে যাবার পর আমি ভাবতে থাকি... বয়স্ক বিদেশী - তারমানে কে হতে পারে !

।। সেই মহামিলনের রাতটা।।

গভীর রাতে ছাদে বসে ল্যাপটপে একমনে টাইপ করে চলেছে ইন্দ্রনীল। নিজের জীবনের সব অজানা কথাগুলো। বাংলা টাইপে ইন্দ্রনীলের হাতের স্পিড বরাবরই ভালো, তাই জীবনকাহিনি প্রায় শেষ করেই এনেছিলও। কালিম্পং এর নিরিবিলি এই হোটেলটা ইন্দ্রের খুব প্রিয়। অতীতে বহুবার সে এখানে এসেছে, তাই আব্রাহাম তার চেম্বারে এসে যখন এরকম সুন্দর একটা রাত তাকে এই হোটেলে কাটাতে বলেছিল, তখন সে এক কথাতেই রাজি হয়ে যায়। আজ সন্ধের থেকেই আকাশটা মেঘলা, রাতের তাপমাত্রা সেকারণে বড় একটা নামে নি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৮৬১ ফুট উপরে এই শৈল শহরটা এখন একেবারেই নিশুতি নিঝুম। তলার রাস্তা দিয়ে মাঝেমাঝে শুধু এক-আধটা গাড়ির দেখা মেলে এতো রাতে। আরও অনেক কিছুই হয়তো লেখার ছিল ইন্দ্রনীলের, কিন্তু হঠাৎ চমকে যায় সে। নীচ থেকে কারা যেন তার নাম ধরে ডাকছে। এই ডাক টা যে তার ভীষণ চেনা। কিন্তু এত রাতে কে হতে পারে ! "ইন্দ্র, ইন্দ্র, তুমি নীচে নেমে এস" সারা শরীর জুড়ে একটা শিহরন খেলে যায় ইন্দ্রনীলের। কি করবে ও! কি করা উচিত! নীচ থেকে সেই রহস্যময় ডাকটা আবার শোনা যায়। ডাক টা যেন ধীরেধীরে সম্মোহিত করে ফেলেছে ওকে, এমন তো হবার কথা নয় ! তবে দ্বিতীয়বার ডেকে আওয়াজটা থেমে যায়, আবার শুনশান চারদিকটা। রাতে তিনবার কেউ না ডাকলে সাড়া দিতে নেই, কারণ নিশি এসে চেনা মানুষের গলায় ডাক দেয়, ছোটবেলায় শুনেছিল ইন্দ্র। কিন্তু নিশির ডাক তো শোনা যায় শুধু একবারই! তবে কে ডাকছে ওকে! কেনই বা ডাকছে! আবার কি কোন বিপদে পড়তে চলেছে ও! আব্রাহাম কেনই বা আজকের রাতটা তাকে এই হোটেলে কাটাতে বলেছিল? সেই দুর্নিবার ডাকের মায়া ত্যাগ করতে পারে না সে। অবশেষে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে ইন্দ্রনীল। সিঁড়ির দরজা হাট করে খোলা, তারমানে যে রাস্তায় এসে তাকে ডাকছে সে ও এই হোটেলের কোন রুমেই ছিল।

রাস্তায় নেমে মোবাইলের টর্চটা জ্বেলে চমকে ওঠে ইন্দ্রনীল, এ কাদের দেখছে ও! ওর সামনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে মাইক আর

সারা। এতগুলো বছরেও ওদের চেহারাটা প্রায় একই রকম রয়ে গেছে। ইন্দ্রানীলকে দেখে দুটো হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে মাইক। ইন্দ্রনীলের চোখে জল পুরনো বন্ধুকে কাছে পেয়ে, "কেমন আছো মাইক ? আমি ভাবতেই পারি নি এতরাতে এভাবে তোমাদের সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে।"

"কি ভেবেছিলে তুমি ? দেশে ফিরে এসেছ বলে আমার জিনিসটা কখনো ফেরত নিতে আসবো না ? দে ভাই, সাত সমুদ্র পেরিয়ে ছুটে এসেছি আমার পাওনা গন্ডা বুঝে নেবার জন্য।" ইন্দ্র ভালোমতোই চেনে মাইককে, মাইকের এরকম ওভার সিরিয়াস কথার মানে একটাই, দম ফাটানো ওর একটা হাসি রাতের নীরবতা ভেঙে খানখান করে দেবার জন্য অপেক্ষা করছে।

"ভীষণ অন্যায়, কিন্তু তোমার পাওনাটা ঠিক কি সেটাই তো বুঝতে পারলাম না" মৃদু হাসে ইন্দ্র।

"আমার দেশলাই বাক্সটা হিথরো এয়ারপোর্টে ঢোকার আগে ঝেড়ে দিয়ে দিব্যি ভুলে গেছ দেখছি।" এবার মাইকের সেই চিরাচরিত হাসি শুরু হয়। ভুমিকম্পে আন্দোলিত ঝাউগাছের মত হাসির ধমকে মাইকের সারা শরীরটা দুলছে। "ইন্দ্র, বহু বছর ধরে চলা একটা ইতিহাসের আজ যবনিকা পড়তে চলেছে।" হাসতে হাসতে হঠাৎই সিরিয়াস হয়ে কথাগুলো বলে মাইক।

"তার মানে ? কি সেই ইতিহাস ?" ইন্দ্র জানতে চায়।

"হ্যাঁ, ইন্দ্রদা, যেই পরিচয়ে তুমি এতদিন ধরে আমাদের দেখে এসেছ, তার বাইরে আমাদের একটা পরিচয় আছে। আজ তোমাকে সেই পরিচয়টা জানিয়ে দিয়ে আমরা বিদায় নেব।" ইন্দ্রর হাত দুটো চেপে ধরে সারা।

"সারা, তুই ও কি আমার সাথে মজা করে যাবি ?" মৃদু ধমকের সুরে বলে ইন্দ্র।

"আমরা মজা করছি না, যেই জলদস্যু আনির নাম এতদিন ধরে শুনে এসেছ, সেই তোমার বোন সারা, হ্যাঁ ইন্দ্র, আর আমি ওর স্বামী বনি। God Angitia-র অভিশাপে যেই দুর্বিষহ ওয়ার উলফের অভিশপ্ত জীবন এতকাল ধরে আমাদের বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়েছে শুধুমাত্র ছোট্ট

একটা ভুলের জন্য, আজ তুমি সেই অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করলে।

"ভুল ! কিসের ভুল !" ইন্দ্রের কণ্ঠে একরাশ বিস্ময়।

"তুমি হয়তো জানো না, একবার স্বপ্নাদেশ পেয়েছিল আনি, সুলেমানি গুপ্তধন দিয়ে God Angitia-র মন্দির নির্মাণ করতে হবে। সেদিনটা ছিল এরকম পূর্ণিমার আগের একটা রাত। আনি চরম নিষ্ঠুর এক রাজার বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক অভিযান সেরে ফিরেছে। সুলেমানি গুপ্তধনের নকশাও তখন আবিষ্কার করে ফেলেছে ও কিন্তু...!"

মাইকের চোখে জল! মাইক কাঁদছে! যেই মানুষটাকে কোনদিনও কাঁদতে দেখে নি ইন্দ্র।

"তারপরের ঘটনাটা আমি তোমাকে বলছি" সারা বলে।

"তুমি ভাবতেও পারবে না দাদা, আমি ওকে কতখানি ভালবাসতাম। আর এত জন্ম পেরিয়ে সেই ভালবাসা আজও আমার কাছে জগতের সব চাইতে বড় সত্য। আমরা যখন এতবড় একটা অভিযানে সফল হয়ে দেশে ফিরেছি, দূর থেকে দেখতে পাই সমুদ্রের তীরে আমার স্বামী দাঁড়িয়ে আমার প্রতীক্ষায়। জাহাজ থেকে নেমে আমি চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিই আমার স্বামীকে। কে কি ভাববে সেদিকে নজর দেবার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না, এমন স্বামী পাবার জন্য যে কোন মেয়েরাই জন্মজন্মান্তর তপস্যা করতে পারে। জলযুদ্ধের লুণ্ঠন করা সম্পত্তি আমার অধীনস্থ সর্দাররা আমাদের ঘাঁটিতে নিয়ে গেলেও আমি কিন্তু রয়ে গেলাম সমুদ্রের তীরে আমাদের ছোট্ট কটেজের সামনে।"

"তারপর ?" ইন্দ্রনীল জানতে চায়।

"তোমাকে যখন এ জন্মে দাদা ডেকেছি, তখন কোন কিছু আমি তোমার কাছে লুকাবো না, বনির কোলে মাথা রেখে আমি ওকে শোনাচ্ছিলাম আমার অভিযানের কথাগুলো। ও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছিল ক্যারোট, কোকোনাট আর ব্যানানা। এভাবে ভালোবাসার আবেশে কোথা দিয়ে যেন শেষ হয়ে যায় দিনটা। তখন আকাশে রূপোর থালার মতো চাঁদটা হাসছে। জোয়ারের জলে ভিজিয়ে দিয়েছে আমাদের, সেদিকে খেয়াল করব এত সময় কোথায়! আচমকাই জ্যোৎস্নায় ভিজে বালির মধ্যে পাগলের মত ও আমাকে

পেতে চায়। কি জানি, এতদিন পর ওকে এভাবে পেয়ে আমি ও হারিয়ে ফেলেছিলাম আমার প্রতিরোধ করার সবটুকু ক্ষমতা। দীর্ঘ ছমাস পর পোশাকের আড়াল মুক্ত হয়ে আমরা মিলেমিশে এক হয়ে যাই জ্যোৎস্না মাখা সমুদ্রসৈকতকে সাক্ষী রেখে। ওর পাগলামির কাছে ধরা দিই আমি, অবশেষে প্রকৃতির নিয়মে যখন আমরা আলাদা হই, তখন বুঝতে পারি আমাদের উপর God Angitia-র অভিশাপ ফলতে শুরু করেছে, আমাদের দেহে তখন বন্য নেকড়ের মতো লোম, সামান্যতম পোশাক অবশিষ্ট নেই আমাদের কারোর শরীরে। আমরা দুজনেই পরিণত হয়েছি ওয়ার উলফ এ। পুর্ণিমা শেষ হলে তবেই আমরা ফিরে পাব আমাদের মানব রূপ। ইন্দ্রনীল চমকে ওঠে সারার কথায়, এ ও সম্ভব !

অবশ্য চমকের হয়তো আরও বাকি ছিল। আকাশের বুকে চাঁদটা তখন ডুবে এসেছে, ইন্দ্রের ঘড়িতে সময় এখন প্রায় ভোর চারটে, আবছা আলোয় ও দেখতে পায় হালকা রঙের শাড়ি পরা এক মহিলা এগিয়ে আসছে তার দিকেই। খুব চেনা লাগছে ওনাকে, কে হতে পারে! উনি কাছে আসতেই চমকে ওঠে ইন্দ্র। যাঁর অভাবটা এতদিন ধরে সে তিলেতিলে অনুভব করে এসেছে, আজ তিনিই ফিরে এসেছেন। তিনি ইন্দ্রের মা।

"মা তুমি !" ইন্দ্রের মনে পরে ওর মা ছিলেন ঘোর বাম মনোভাবাপন্ন, তাই তিনি বলে গিয়েছিলেন তাঁর মৃতদেহটা যেন পরলৌকিক ক্রিয়াদি না করে কোন মেডিকেল কলেজে দান করে দেওয়া হয়। ইন্দ্র তাই করেছিল, মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পর একটা শোরগোল পড়ে গেছিল মেডিকেল কলেজে। মিডিয়া ও এই নিয়ে তুলকালাম করেছিল তখন। মেডিকেল কলেজের থেকে নাকি কোন এক মৃতদেহ নিখোঁজ, সেটাই কি ছিল ইন্দ্রের মায়ের দেহ! আব্রাহাম ওকে একবার বলেছিল, দেবী Angitia কোন কিছু কেড়ে নেন না, সবই ফিরিয়ে দেন একদিন। তবে সবটাই কি দেবীর লীলা ! এতদিন পর মা কে ফিরে পাবে একি স্বপ্নেও ভেবেছিল ইন্দ্র।

"বাবা, তুই ভাল আছিস তো ?"

মা দু হাত বাড়িয়ে ডাকছে তাকে, মায়ের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে কেঁদে ফেলে সে। এ যে পৃথিবীতে যে কোন সন্তানের সবচাইতে বড় আশ্রয়।

হোটেলের সিঁড়িতে কার যেন পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। ধীরে ধীরে তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। অর্পিতা নেমে আসছে, ও এই হোটেলেই ছিল! বিশ্বাসই হয় না ইন্দ্রর। আব্রাহাম যদি সেদিন তার চেম্বারে না আসতেন, তবে এই রাতটার সাক্ষী কি ভাবে হতে পারতো সে!

“ইন্দ্র, বিশ্বাস কর, আমি ভাবি নি কোনদিন তোকে ফিরে পাব, হঠাৎ করেই একদিন ভোরে স্বপ্ন দেখি, এই ইহুদী পুরোহিত দাঁড়িয়ে আমার শিয়রে। আজকের রাতটা আমাকে তিনি এখানে থাকার জন্য বলেন, আজ আমি বুঝতে পারছি দেবী Angitia কতখানি স্নেহময়ী। তোকে এতদিন না পেয়ে আমার আর কোন আফসোস নেই।"

অর্পিতার হাত দুটো চেপে ধরে ইন্দ্র। "মা, দেখো, এই মেয়েটাই তোমার হবু বৌমা, ওকে নিয়ে তুমি বাড়ি যাও, আমার যে এখনো অনেক কাজ বাকি। লিজার্ট পয়েন্টে গিয়ে পরম কল্যাণময়ী দেবী Angitia-র মন্দির নির্মাণ করে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব।

অর্পিতা প্রণাম করে ইন্দ্রের মা কে, অপত্য স্নেহ তিনি হাত রাখেন অর্পিতার মাথায়। ঠিক তখনই ইন্দ্রের মোবাইলে রিং বেজে ওঠে। ভিডিও কল করেছে কেউ! এতো ভোরে কে হতে পারে! কলটা একসেপ্ট করে ইন্দ্র। মোবাইলে ভেসে ওঠে গ্রাহাম সাহেবের মুখটা।

"ইন্দ্র, তুমি অবাক হয়েছিলে না আমার পাশে হিংস্র রকি মাউন্টেন উল্ফ কে দেখে। আজ তোমাকে বলতে চাই উনি আমার পিতা Gerald Lankester Harding। যিনি Angitia-র অভিশাপে মাউন্টেন উল্ফ হয়ে বেঁচে আছেন। আজ সকালে তিনি সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন, সেই সাথে আমিও। আজ সূর্যোদয় হলে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, আমার সব সম্পত্তি আমি তোমার নামে উইল করে রেখে গেলাম। God Angitia-র মন্দির নির্মাণের পর যেটুকু জায়গা অবশিষ্ট থাকে সেটুকু একমাত্র তোমার।

"শুনেছি বহুপুরুষ ধরে দেবী Angitia-র অভিশাপ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়, তাহলে আপনার পিতা যদি দেবীর অভিশাপে উল্ফ-ম্যান জীবন অতিবাহিত করেন তা হলে আপনি কি করে মানব রূপে এতদিন ধরে পৃথিবীতে বাস করছেন সেটা দয়া করে আমাকে একবার বলুন।" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে ইন্দ্র।



মোবাইলটা গ্রাহাম সাহেব একটু ঘুরিয়ে ধরেন সেই হিংস্র নেকড়েটা সামনের দু পা তুলে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

"হ্যাঁ এই প্রশ্নটা তোমার মনে জাগাটা খুবই স্বাভাবিক, God Angitia-র অভিশাপ বহুপুরুষ ধরে বহন করে চলতে হয় এটা একদম সত্যি, কিন্তু আমার পিতা যখন তাঁর অভিশাপ প্রাপ্ত হন তার অনেক আগেই আমার জন্ম হয়েছে, সেই অভিশাপ তখনই আমাকে স্পর্শ করত যদি আমি আমার পিতার অভিশাপ প্রাপ্তির পরে এই পৃথিবীর আলো দেখতাম কিন্তু ওই হতভাগ্য মানুষটিকে ছেড়ে আমি তো মরেও শান্তি পেতাম না, তাই দেবীর কাছে ইচ্ছেমৃত্যু প্রার্থনা করেছিলাম শুধুমাত্র ওনার জন্যই। ঈষৎ থামেন গ্রাহাম সাহেব, তার চোখেও জল। যা মোবাইলের স্ক্রিন থেকেও বেশ বোঝা যায়। ইন্দ্র, বাবা তোমাকে একবার কৃতজ্ঞতা জানাতে চান।"

মোবাইলটা গ্রাহাম সাহেব একটু ঘুরিয়ে ধরেন সেই হিংস্র নেকড়েটা সামনের দু পা তুলে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে তখন ইন্দ্রানীলকে, ঠিক তারপরেই কেটে যায় ভিডিও কলটা।

“ইন্দ্র, এবার আমাদের তুমি বিদায় দাও (মাইক অথবা বনি বলে)"

"তোমরা আবার কোথায় যাবে ? দেবী Angitia-র মন্দির আমি একা বানাব সে ক্ষমতা আমার কোথায়! ইন্দ্র চেপে ধরে মাইকের হাতদুটো।

"ভোর হয়ে আসছে। আজ সকালেই আমরা ওয়ার উলফ এর অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পাব, আর তোমার কোন চিন্তা নেই। সুলেমানি গুপ্তধন কক্ষ থেকে পাওয়া স্বর্ণখন্ড দিয়ে দেবীই তোমাকে তাঁর মন্দির নির্মাণ করিয়ে নেবেন। আজ ২০১৮ সালের ৬ আগস্ট, কাল চন্দ্রগ্রহন। কাল থেকে ২২ শে আগস্ট সন্ধ্যায় যখন রবি কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবে, তারমধ্যে তোমাকে এই নির্মাণকাজ শেষ করতে হবে। আজ রাতেই তুমি বাগডোগরা, দমদম হয়ে বেরিয়ে পড়বে লিজার্ট পয়েন্টের উদ্দেশ্যে। এই নাও তোমার ফ্লাইটের টিকিট।"

ইন্দ্র ফ্লাইটের টিকিটটা হাতে নেবার সাথেসাথেই পরিবর্তন হতে থাকে মাইক ও সারার অবয়ব। প্রথমে ওরা ফিরে যায় প্রাচীন ইউরোপীয় জলদস্যুর সাজে, তারপর বন্য নেকড়ের আকৃতিতে ওরা শেষবারের মত বিদায় জানায় ইন্দ্রানীলকে, তারপর রেণু রেণু হয়ে হাত ধরাধরি করে হারিয়ে যায় প্রকৃতির মাঝে। পাহাড়ের কোল থেকে তখন ভোরের রক্তিম সূর্যটা সবে উঁকি মারছে।

~~ সমাপ্ত ~~

